বিমলানন্দ শাসমল

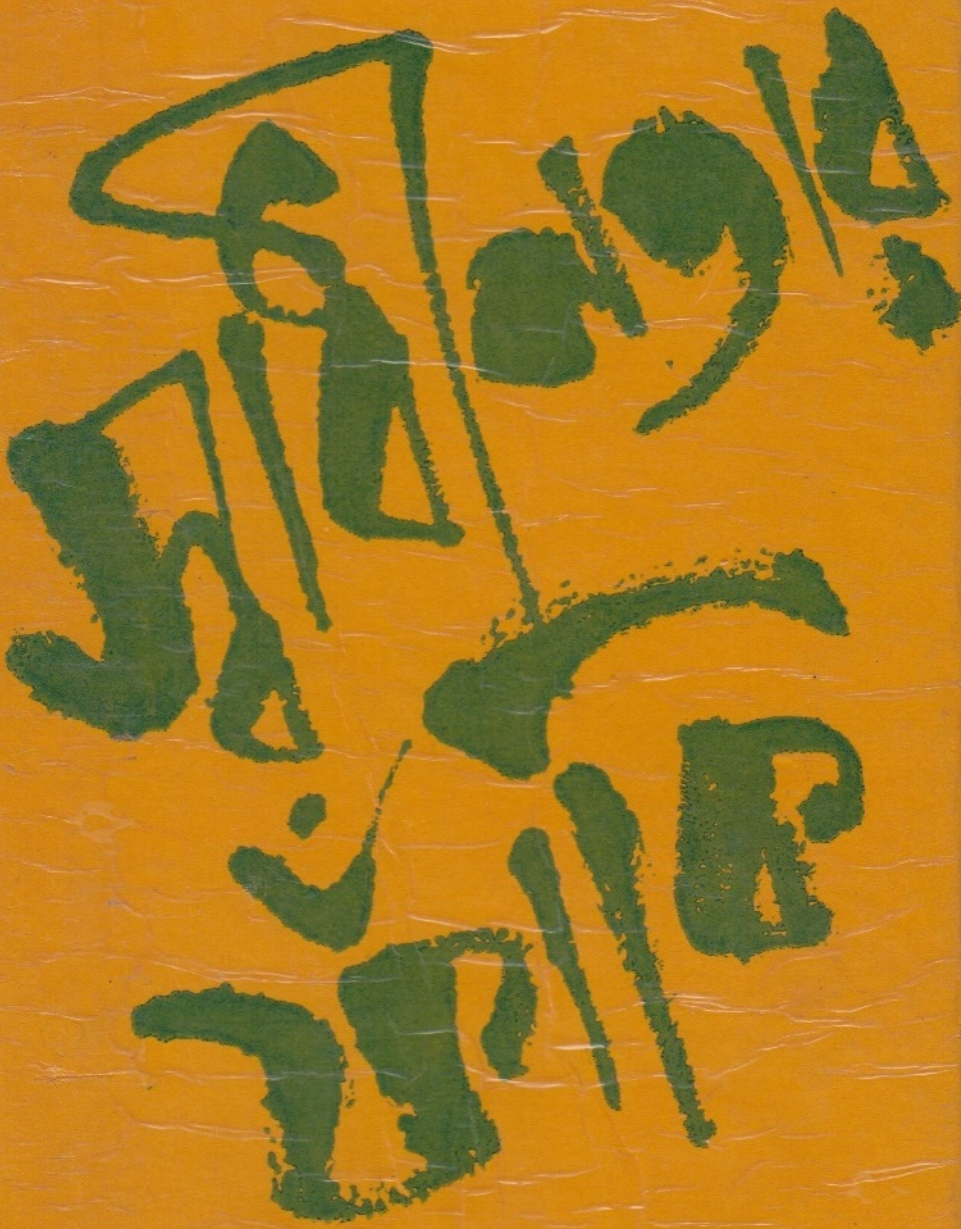

বিমলানন্দ শাসমল

স্বাধীনতার ফাঁকি

With Compliments from
28-11-91
MOHAMMAD NURUL ABEDIN

পরিবেশক
হিন্দুস্তান বুক সার্ভিস
কলকাতা

www.pathagar.com

SWADHINATAR PHANKI

BIMALANANDA SASHMAL

Price : Rs. 32.00

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৭৪

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫ই আগস্ট ১৯৯১

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য : বত্রিশ টাকা

Published by

AL-ITTEHAD Publications (Pvt.) Ltd.
183, Lenin Sarani, Calcutta-700 013

Marketed by

Hindustan Book Service
183, Lenin Sarani, Calcutta-700 013

আল-ইত্তেহাদ পাবলিকেশন্স (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক ১৮৩, লেনিন সরনি, কলিকাতা-৭০০ ০১৩ হইতে প্রকাশিত ও দুলাল দাশগুপ্ত, ভারতী প্রিন্টিং

www.pathagar.com

উৎসর্গ

১৯৩০-এর সত্যাগ্রহে পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেও যিনি মাথা নত করেননি, কাঁথির সেই পরম বীরাঙ্গনা পদ্মা গয়লানির স্মৃতির উদ্দেশে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার এই বিতর্কমূলক বইটি উৎসর্গ করেছি আমার গুরুদেব ডঃ আলবার্ট সোয়াইৎযেয়ারের নামে। পৃথিবীর শ্বেতবর্ণেরা পৃথিবীর কৃষ্ণবর্ণদের যে-লাঞ্ছনা ক'রে এসেছে যুগ যুগ ধ'রে তারই প্রতিবাদে তিনি ইয়োরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শ পরিত্যাগ ক'রে আফ্রিকার জঙ্গলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লাঞ্ছিত মানবের মুক্তিতীর্থ। মানুষের দ্বারা মানুষের অবমাননার এতবড় নীরব অথচ সক্রিয় প্রতিবাদ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

আমার এই বইতেও মানুষের দ্বারা মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনার কথা আছে। সেই কারণেই লাঞ্ছিত মানবতার দেবাদিদেব আলবার্ট সোয়াইৎযেয়ারের নামে এই বই উৎসর্গ করেছি। মৃত্যুর আগে তিনি আমায় এর অনুমতিও দিয়েছিলেন।

কিন্তু বিতর্কমূলক এই লেখাগুলির মধ্যে আমি বহু স্থানে অনেকের নিন্দা করেছি, রূঢ় ভাষায় সমালোচনা করেছি অনেকের এবং নির্মম ইঙ্গিতের কষাঘাতে জর্জরিত করবার চেষ্টা করেছি বহুজনকে। সে অক্ষমতা, সে ত্রুটি আমার—আমার গুরুদেবের শিক্ষার নয়। তাঁর নীরব প্রতিবাদের গভীর বিশ্বাস আমি কণামাত্র অর্জন করতে পারিনি। তাঁর আত্মিক অসহযোগের অসঙ্গ আভিজাত্য আমি তিল মাত্র লাভ করতে পারিনি। তবু আমার মত অক্ষম অপারগকে তিনি যে অপরিসীম স্নেহের দানে ধন্য করেছিলেন তাঁর সেই স্নেহস্পর্শে হয়ত একদিন এ-অক্ষম তাঁর মহৎ দানের যোগ্য হ'য়ে উঠবে।

এই বইতে আমার পিতা স্বর্গত দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত তথ্যের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ আমাকে বলেছেন, এ-সব কথা পুত্র হ'য়ে আমার না লিখে অন্য কাউকে দিয়ে লেখানো উচিত ছিল। আমাদের ভদ্রতার মুখোস-পরা সমাজে এই সব সত্য কথা বলবার বা লেখবার লোকের অভাব আছে। এমন-কি এদেশের বহু নাম-করা মুদ্রণ-সংস্থা এ-বই ছাপতেও অস্বীকার করেছিল। কাজেই আমাকেই এ-সব কথা লিখতে হয়েছে। আমার গুরুদেবের এতে সম্মতি ছিল।

৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০১

বিমলানন্দ শাসমল

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলার ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন—

"আপনার গ্রন্থখানি (স্বাধীনতার ফাঁকি) পড়িয়া অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিলাম। আপনার পিতৃদেব (বীরেন্দ্রনাথ শাসমল) প্রকৃত দেশ-প্রেমিক ছিলেন এবং তাঁহার বিপুল স্বার্থত্যাগের জন্য তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু তাঁহার জীবিতকালে শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে লাঞ্ছনা ও অপমানের যে-সব কাহিনী আপনি লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই আমার জানা ছিল না। পড়িয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। আমাদের রাজনীতিতে যে গলদ আজ দেখিতেছি তাহার কারণ কি, উৎস কোথায়—এ প্রশ্ন আমার মনে অনেকবার জাগিয়াছে, সদুত্তর পাই নাই। আপনার বই এ সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করিয়াছে। আপনি অনেক গণ্যমান্য নেতার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার বিপক্ষে কিছু বলিবার আছে আমি জানি না। আপনি প্রকাশ্যে এইসব অভিযোগ আনিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন—ঐতিহাসিক হিসাবে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।"

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী বলেন—

"আমার সহিত মতের মিল বা সম্পূর্ণ মিল হউক বা না হউক যাহাতেই মনের সজীবতা ও চিন্তার স্বকীয়ত্বের প্রকাশ দেখি তাহাতেই আমি আনন্দ পাই। আপনার বইটিতে উভয়ই বিদ্যমান। তাহা ছাড়া বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের বিবিধ রাজনৈতিক ঘটনা ও বিভিন্ন নেতাদের মানসিকতার আপনার কৃত বিশ্লেষণ আমার নিকট সঙ্গতই মনে হইয়াছে। কিন্তু আমার যেন মনে হইল গান্ধী-চরিত্রের মূল্যায়ণে সর্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই।

সামগ্রিকভাবে বইটির সত্যভাষণ ও সাহসিকতা আমাকে আনন্দ দিয়াছে এবং উহা হইতে অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানিতে পারিয়া উপকৃত হইয়াছি।"

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার বহুদিন পর এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে জনৈক বন্ধুর উৎসাহে। বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য যে লেখা পাঠিয়েছিলেন সেটা পাঠকেরা অন্যত্র পড়তে পারবেন। রমেশবাবু আমার লেখাতে যে প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেছিলেন সেটা হচ্ছে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা। আমাদের দেশে অনেক সময়ে মিথ্যা ইতিহাসকে সত্যতার আবরণে প্রচার করা হয়ে থাকে। দেশের সম্মুখে আজ সবচেয়ে বড় বিপদ এই মিথ্যা ইতিহাসের প্রাবল্য। মিথ্যা ইতিহাসের সাহায্যে সমগ্র জাতিকে—হিন্দু মুসলমানকে—কোন্ দুর্গতির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তার কোনো হদিস পাওয়া সম্ভব নয়।

আমার নিজের পরিষ্কার ধারণা এই যে দেশকে ও সমাজকে পুনরায় জাগিয়ে তুলতে হ'লে সত্য ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সকল প্রকার প্রয়াসের প্রয়োজন। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে যে মিথ্যা সভ্যতা ও সংস্কৃতি তৈরি হবে একদিন না একদিন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বাধ্য। তখন সমগ্র সমাজ এক বিরাট শূন্যতার গহ্বরে পড়ে হাবুডুবু খাবে। দেশকে সমাজকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য এখন সর্বত্র চাই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম পদক্ষেপ। একজন সাধারণ গবেষক হিসাবে সত্যপ্রতিষ্ঠার এই মহান পদক্ষেপে আমি যদি সামান্য কিছু সাহায্য করতে পেরে থাকি তাহ'লে আমার এই লেখা সার্থক হবে।

কলকাতা
১৫.৮.৯১

বিমলানন্দ শাসমল

www.pathagar.com

এই বইয়ের প্রবন্ধগুলি প্রথমে ধারাবাহিকভাবে 'কম্পাস' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। পরে বহুলাংশে পরিবর্ধিত আকারে এই বইতে প্রকাশিত হলো। 'কম্পাসের' সম্পাদক শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত এই লেখাগুলি প্রকাশ করে যে-সাহস দেখিয়েছিলেন সেজন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।—গ্রন্থকার

এই লেখকের অন্য দুটি বই

ভারত কী করে ভাগ হলো (তিরিশ টাকা)
সত্য ইতিহাস (যন্ত্রস্থ)

www.pathagar.com

১

কোন দেশ যখন বিদেশী শক্তির দ্বারা পদানত হয় ঐতিহাসিক বিচারে এই পরাধীনতা সাধারণত বিরাট সৈন্যদলের বৃহত্তর পশু-শক্তির দ্বারাই সংঘটিত হয়। কিন্তু শুধুমাত্র সেনাদলের পশুশক্তির সাহায্যে পরদেশে আধিপত্য রক্ষা করা অধিককালের জন্য সম্ভব হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। শুধুমাত্র পশুশক্তির সাহায্যে একটা সমগ্র দেশকে চিরকালের জন্য অধীন করে রাখা অসম্ভব। আধুনিক ইতিহাসে দেখা গেছে বিজয়ী জাতিগুলি বিজিত দেশেরই কোন কোন অংশের সমর্থন অর্জন করে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত করবার ব্যবস্থা করেছে। কারণ, এই রকম না করলে, শুধুমাত্র সৈন্যবলের পশুশক্তির সাহায্যে—হোক না তা যতই বিরাট—বিজিত দেশগুলিকে শাসনাধীন রাখা কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ কালের জন্যই সম্ভব। ইংরেজ রাজত্ব ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল, কারণ আমরা ভারতীয়রাই ইংরেজ বণিকদের ভারতে শাসন ব্যবস্থার ভার গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর বুনিয়াদ তখন এতরকম দুর্বলতা ও গলদে পরিপূর্ণ ছিল যে ভারতের অনেকেই তখন ভেবেছিলেন যে ইংরেজী শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার দ্বারাই ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক গলদ ও পচনশীলতা দূর করা সম্ভব। কিন্তু দুর্নীতি, মিথ্যাচার ও খলতায় ভারতে প্রথম ইংরেজ আগন্তুকেরা তাঁদের সমসাময়িক ভারতীয়দের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না। মিথ্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা ও জালিয়াতিতে ক্লাইভেরা এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসেরা মীরজাফর ও রায়দুর্লভদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ইংরেজ জাতির শ্রেয়তর শ্রেণী নিজেদের প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন এবং রাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সালের ঘোষণার পর ইংরেজ সরকার সত্য সত্যই ভারতীয়দের আন্তরিক সদিচ্ছা আহরণের প্রচেষ্টা আরম্ভ করলেন এবং চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে এদেশে মোটামুটি একটি দুর্নীতিমুক্ত শাসন ও বিচারব্যবস্থা—যা বহুদিন ভারতীয়রা কল্পনায়ও আনতে পারতেন না—প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধুমাত্র নিজেদের দেশবাসীদ্বারা শাসিত হবার ভাবাবেগে কতজন ভারতীয় সে সময়ে ইংরেজী শাসন ও বিচার ব্যবস্থার সুফলগুলি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন, সেটাও ভেবে দেখবার মত।

কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতে গান্ধীজী বললেন, ইংরেজী শাসন-

www.pathagar.com

ব্যবস্থা শয়তানের শাসন-ব্যবস্থা এবং ভারতবর্ষ নিজের আত্মার পুনরুদ্ধার সাধন করতে পারবে না যতদিন এই শয়তানী শাসন-ব্যবস্থা এদেশে কায়েম থাকবে। সেই হেতু গান্ধীজীর মতে ভারতীয়দের একমাত্র কর্তব্য ছিল ঐ শয়তানী শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে অসহযোগ করা। সর্বভাবে এবং সর্ববিষয়ে চেষ্টা করা যাতে ভারতবর্ষের পুরাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত নৈতিক বুনিয়াদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়।

কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, পৃথিবীর সর্বত্রই সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ঐতিহাসিক প্রয়োজনের দ্বারা বিবর্তিত হয়। এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয় অনেকটা এই ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রবাহের চাপেই এবং শুধুমাত্র ইংরেজ বণিকদের পররাজ্য গ্রাসের ক্ষুধার তাগিদে নয়।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব কায়েমী রাখবার জন্য যে সকল শোষণমূলক ও ন্যায়যুক্তিহীন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল সেগুলির সমর্থন করার উদ্দেশ্য বর্তমান লেখকের নেই, কিন্তু গান্ধীজী যখন বললেন যা কিছু ইংরেজী বা ইংরেজ সম্বন্ধীয়, যেমন বিলাত থেকে আমদানী করা কাপড়, সমস্তই অপবিত্র ও শয়তান-সদৃশ, তখন নিশ্চয়ই তিনি সাধারণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশে অপরিসীম ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির দায়িত্ব নিলেন যা নিশ্চয়ই তাঁর প্রচারিত অহিংসার আদর্শের পরিপন্থী! কারণ 'পাপকে ঘৃণা কোরো, পাপীকে নয়' এই নীতি অনুসরণ করে চলা সাধারণভাবে গান্ধীদের দ্বারাই সম্ভব—অন্যদের দ্বারা নয়। অতএব এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টির পরিবর্তে—যে পরিবেশে এ দেশের লোক তাঁদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিগত সম্পর্কগুলিকে নিজেদের আদর্শে গড়ে তুলতে পারবে—গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ মন্ত্র এদেশে ইংরেজ সম্বন্ধীয় সমস্ত জিনিসের বিরুদ্ধে এক সুতীব্র এবং সময়ে সময়ে হিংসামূলক আলোড়নের সৃষ্টি করলো। সেই কারণেই হাসিমুখে স্বেচ্ছায় ত্যাগ ও দুঃখের ব্রত গ্রহণ করে প্রতিপক্ষের হৃদয়কে প্রভাবিত করার গান্ধী-পথকে এদেশে একমাত্র গান্ধী ছাড়া বোধহয় আর কেউই গ্রহণ করেন নি। বাস্তবিকপক্ষে, গান্ধীবাদীদের বেশীর ভাগই নিজেদের আদর্শের অনুপ্রেরণায় যে ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকার করতেন তার মধ্যে একটা প্রদর্শনীবৃত্তি বা exhibitionism ছিল যাতে এই 'দুঃখজয়ীর' দল অত্যাচারীর হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্য যতটা উন্মুখ না হতেন তার চেয়ে বেশী হতেন জগতবাসীকে দেখাতে যে ইংরেজরা কত বড় শয়তান—এই সকল নিরীহ, অহিংস, ত্যাগী সাধকদের স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার তাদের দাবী মেনে নিচ্ছে না, উপরন্তু জেলে পাঠিয়ে ও তাদের ওপর নানারকমের অত্যাচার করে শয়তানীর চূড়ান্ত করছে।

গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের যে মূল আদর্শের লক্ষ্য ছিল ভারত-

www.pathagar.com

বর্ষে এমন এক সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ গড়ে তোলা যার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ইংরেজ শাসনকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে, তা যে পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল তার কারণ, এই আদর্শের ভিত্তি ছিল প্রধানত নৈতিবাদমূলক মনোবৃত্তির ওপর, যে মনোবৃত্তির প্রধান কাজ ছিল এই প্রমাণ করা যে ইংরেজ সরকার শয়তান-সদৃশ এবং তাদের প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা অপবিত্র।

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব ও সংস্কারমুক্ত এক নতুন সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো তৈরি করা, ভারতের ইংরেজ শাসকরা শয়তান ছাড়া আর কিছু নয়—এটা প্রমাণ করতে পারলেই সম্ভবপর হয়ে উঠতো না। অবশ্য, খুব খেলো জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য তাই হতে বাধ্য। বিজাতীয় শাসকের বিরুদ্ধে সকল প্রকার ঘৃণা সৃষ্টির মধ্যেই এই ধরণের জাতীয়তা-বাদের উন্মেষ এবং বিজাতীয় শাসক-সংশ্লিষ্ট সব কিছুই ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য—তাও এই ধরণের জাতীয়তাবাদের চরম লক্ষ্য।

কিন্তু গান্ধী চেয়েছিলেন গড়তে এক নতুন সমাজের ভিত্তি যেখানে পাপকে ঘৃণা করা হবে কিন্তু পাপীকে নয়। এবং যদিও মনে মনে গান্ধী সর্বদাই ইংরেজ ও খ্রীষ্টান শাসকদের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করতেন, তথাপি তাঁর লেখা ও ভাষণের দ্বারা ক্রমাগত ইংরেজ সম্বন্ধীয় সব কিছুই অপবিত্র প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে থাকায় তিনি দেশে এক অভূতপূর্ব ইংরেজ বিদ্বেষের সৃষ্টি করলেন যেমনটি বহুদিন থেকে চেষ্টা করেছিল বিপ্লব-বাদীরা ও অন্যান্য চরমপন্থীরা, যার ফলে তাঁর আন্দোলনের প্রথমদিকে গান্ধীজী যে সত্য ও অহিংসার ছোট্ট প্রদীপশিখাটি জ্বালাবার চেষ্টা করে-ছিলেন সেটি চিরকালের জন্যেই অকালে নিভে গেল।

ওদিকে কংগ্রেস দলের ওপর-তলার নেতারা প্রায় সকলেই ছিলেন বিলাতে শিক্ষিত বা বিলাতি শিক্ষায় প্রভাবিত এবং বিলাত প্রত্যাগত। এঁরা প্রায় সকলেই শিক্ষা-দীক্ষায় চিন্তা-ভাবনায় আচারে-ব্যবহারে ইংলণ্ডের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এঁদের চতুর্দিকে এমন একটি 'বৈলাতিক পরিমণ্ডল' সৃষ্ট হয়েছিল, যে পরিমণ্ডল থেকে মুক্ত হবার কোনো বাহ্যিক প্রয়াসও এঁদের ছিল না। গান্ধীজী 'নয়ী তালিমের' নির্ঘণ্ট রচনা করলেন দেশের সাধারণ মানুষের সন্তান-সন্ততির জন্য, কিন্তু কংগ্রেস দলের ওপর-তলার নেতাদের সন্তান-সন্ততিরা তালিম পাবার জন্য ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে যেতে লাগলেন, যেমন যেতেন তাঁদের পিতৃ-পুরুষেরা। কংগ্রেস দলের ওপর-তলার নেতারা বংশানুক্রমে ইংরেজী ভাবধারা ও জীবনাদর্শের ধারক ও বাহক থেকে গেলেন। কিন্তু আশা করা হলো গান্ধীজীর আদর্শে দেশের সাধারণ লোক ইংরেজী ভাবধারা ও জীবনাদর্শকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে এদেশে ভারতের অতীত ইতিহাসের ঐতিহ্যবাহী এক নতুন সমাজব্যবস্থার

www.pathagar.com

গোড়াপত্তন করবে। বাংলার জনৈক সাধারণ গঠনকর্মী তাঁর মেধাবী পুত্রকে জার্মানীতে উচ্চশিখা লাভের জন্য পাঠিয়ে দেবেন বলাতে বাংলার জনৈক বিখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা বলেছিলেনঃ "তোমার এ পাপকে আমি সমর্থন করতে পারবো না।" গান্ধীজীর একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই যখন ফরাসী ভাষায় সম্পূর্ণ শিক্ষালাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন গান্ধীজী তাঁকে তীব্র তিরস্কার করে বলেছিলেন যে ভারতের সেবায় এই ধরনের শিক্ষা অপ্রয়োজনীয়। (রোম্যাঁ রোলাঁর "Inde", পৃঃ ২৭৮)।

এইভাবে আমাদের দেশের রাজনৈতিক জীবনে এক দ্বৈত মানসের সৃষ্টি হলো। কংগ্রেস দলের ওপর-তলার নেতারা ইংরেজী শিক্ষার গুণে প্রধানতঃ ইংরেজী আদর্শের সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথাই ভাবতে লাগলেন কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষকে গান্ধীজী বলতে লাগলেন ইংরেজের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করো এবং ভারতের পুরাতন আদর্শে ভারতের সুপ্ত আত্মাকে জাগিয়ে তোলো।

অবশ্য, সাধারণ জাতীয়তাবাদীর কর্তব্যই হবে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে এমন এক ঘৃণা বিদ্বেষের ধূম্রজাল সৃষ্টি করা—যার ফলে বিদেশী শাসক এদেশ থেকে অপসরণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু গান্ধীজী বললেন, তাঁর আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সত্য-ই তাঁর কাছে চরম এবং পরম লক্ষ্য। দেশের স্বাধীনতার চেয়েও সত্যের আদর্শ তাঁর কাছে মহত্তর। দেশের স্বাধীনতা তিনি চেয়েছিলেন তার কারণ সেই পথেই তিনি তার সত্যের মহা আদর্শে উপনীত হতে পারবেন। তাঁর নিজের দেশ যখন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ তিনি তখন তাঁর সত্য লাভের অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন না। তাঁর মতে দেশের সত্যকার স্বাধীনতাও লাভ করা যাবে সত্য লাভের গৌরবময় পথেই। সত্যের মধ্যেই তাই তিনি নিজের দেশবাসীকে বর্ধিত হতে আহ্বান করলেন, যাতে করে তাঁরা একদিন সকল প্রকার বিদেশী প্রভাবের কুফল থেকে মুক্ত হয়ে জীবনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে তুলতে পারেন। কিন্তু, আগে যেমন বলেছি তাঁর নিজের রচনা ও ভাষণের দ্বারা তিনি দেশের সাধারণ লোকের মনে এক প্রচ্ছন্ন ইংরেজ বিদ্বেষের সৃষ্টি করতে লাগলেন যা একজন সাধারণ জাতীয়তাবাদী নেতার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু গান্ধীর পক্ষে ছিল তাঁর নিজের আদর্শের দিক দিয়ে মারাত্মক। গান্ধীজীর এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী খুব পরিস্ফুটভাবে দেখিয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ নিয়ে। গান্ধীজী এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য কমিটি তৈরি করে দেন মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতিকে নিয়ে। কিন্তু তিনি চাইলেন

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথকেও এই কমিটির সভ্য করে নিয়ে কমিটির গৌরব বাড়াতে। কিন্তু গান্ধীজীর নিকট থেকে প্রস্তাব শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেনঃ "জালিয়ান-ওয়ালাবাগে কিছু নিরুপায় লোক পালাবার পথ না পেয়ে মারা পড়েছিল তার মধ্যে বীরত্ব কিছুই ছিল না যার জন্য স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা প্রয়োজন হতে পারে। এর মধ্যে সৌন্দর্যময় এমন কী আছে যাতে আমার মত কবিকে এই প্রচেষ্টার প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে।" গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে লিখলেনঃ "ভারতবর্ষ যদি জালিয়ানওয়ালাবাগকে ভুলে যায় তাহলে সে নিজেকেই অস্বীকার করবে।" রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজকে লিখলেনঃ "এই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের দ্বারা ইংরেজের প্রতি ঘৃণাকে চিরস্থায়ী করে দেওয়া হবে।" ওদিকে বিলাত প্রত্যাগত কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে ইংরেজী জীবনাদর্শের প্রতি যে একটা সাধারণ মমত্ববোধ ছিল, দেশের লোকের মনে কিন্তু তার ছায়াটুকু ছিল না।

আবার, একজন সাধারণ জাতীয়তাবাদী নেতা ইংরেজ বিদ্বেষের অনুসরণে চাইবেন ইংরেজ সরকারের আধিপত্যকে সমূলে উৎপাটিত করতে। সেই কারণেই তিনি চাইবেন স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এবং যতদিন তা সম্ভব না হচ্ছে ততদিন তাঁরা স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। কিন্তু, গান্ধীজী যদিও ঘোষণা করলেন যে যা-কিছু ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যা-কিছু ইংরেজ সরকারের দেওয়া সবই অপবিত্র, তথাপি, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের সঙ্গে বা কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করতে তিনি কখনও চাননি। সত্য কথা বলতে কি 'স্বরাজ্য' বলতে গান্ধীজী যাই বোঝাতে চেয়ে থাকুন, তাঁর আন্দোলনের অন্ততঃ প্রথম দশ বছরের মধ্যে তাঁর স্বরাজ্যের আদর্শ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করে পূর্ণ স্বাধীনতালাভ কখনই ছিল না। অতএব গান্ধীজী যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি ভারতের স্বরাজ এনে দেবেন সে স্বরাজের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা কখনই ছিল না। কংগ্রেস দলের প্রথম অসহযোগ প্রস্তাবে কোথাও উল্লেখ ছিল না যে দলের লক্ষ্য হচ্ছে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রভাব মুক্ত এক সত্যকার স্বাধীন শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা। সেই প্রস্তাবে 'স্বরাজ্য' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল বটে কিন্তু, যেমন আগে বলেছি, কোথাও 'স্বরাজ্য' শব্দটির স্পষ্ট অর্থের উল্লেখ ছিল না। সেই প্রস্তাবটির কার্যকরী অংশটির বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপঃ 'কংগ্রেস আরও অভিমত প্রকাশ করছে যে মহাত্মা গান্ধী যার উদ্বোধন করেছেন—সেই ক্রমবর্ধমান অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শ সমর্থন এবং গ্রহণ করা ছাড়া বর্তমানে ভারতবাসীদের কাছে

www.pathagar.com

অন্য পথ খোলা নেই, যতদিন না খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের স্বৈরাচারের প্রতিকার করা হচ্ছে এবং এদেশে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।'

২

"স্বরাজ" অথবা "স্বরাজ্য" কথাটি আমাদের রাজনৈতিক বয়ানে সর্বপ্রথম চালু করেন বাল গঙ্গাধর তিলক। তিনি বলেছিলেন, "স্বরাজে আমার জন্মগত অধিকার এবং আমি তা লাভ করবই।" কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে তিলকই বলেছিলেনঃ

"অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীদের মত কোন কোন নীতি সম্বন্ধে এবং কতকটা এমনকি দেশের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বর্তমান গভর্নমেন্টের সঙ্গে আমার নিজের মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সেই কারণে যদি বলা হয় যে আমার কার্যাবলী বা আমার মনোভাব মহামান্য সম্রাটের গভর্নমেন্টের প্রতি কোন প্রকার শত্রুভাবাপন্ন তাহলে তা অযৌক্তিক হবে।...একথা ঠিকই বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র সভ্যতাসম্মত শাসনব্যবস্থার দ্বারাই নয় পরন্তু ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়গুলিকে পরস্পরের নিকটবর্তী করে ভবিষ্যতে এদেশে যাতে একটি একতাবদ্ধ রাষ্ট্র সৃষ্টি করা যায় সেই দিক থেকে ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষের অপরিমেয় মঙ্গল সাধন করছে। স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রিটিশ জাতি ছাড়া আমরা যদি অন্য কোন জাতিকে শাসক হিসাবে পেতাম তাহলে তারা যে এই ধরণের এক জাতীয়তাবোধের আদর্শকেও প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের সাহায্য করতো বা সে কথা চিন্তা করতো এ আমি বিশ্বাস করি না। যাঁদের হৃদয়ে ভারতের মঙ্গলচিন্তা রয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই এ বিষয়ে এবং ব্রিটিশ শাসনের সমতুল্য অন্যান্য উপকারিতা পূর্ণভাবে অবহিত এবং আমার মতে বর্তমান সংকট একটি আশীর্বাদ বিশেষ কারণ এর ফলে আমাদের ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতি আমাদের আনুগত্যের এক সম্মিলিত অনুভব ও চেতনা আমাদের মধ্যে সার্বজনীন ভাবে জাগ্রত হয়েছে।" (স্পীচেস এণ্ড রাইটিংস অফ বি, জি, তিলক, পৃঃ ৩০১)

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ১১.১২.১৯০৬ তারিখের সভায় তিলক বলেছিলেনঃ "নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের বিশ্বাস নেই একথা ঠিক নয়। আমরা ইংরাজ সরকারের উচ্ছেদও চাই না। কিন্তু রাজনৈতিক অধিকারের জন্য লড়াই করতে হবে। নরমপন্থীরা ভাবেন আবেদন নিবেদন করে এই অধিকার লাভ করবেন—আমরা ভাবি প্রবল চাপ সৃষ্টি করলেই তা পাওয়া যাবে।"

এই হোল 'স্বরাজের' স্বরূপ যার স্বপ্ন দেখেছিলেন বাল গঙ্গাধর

www.pathagar.com

তিলক। তবে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ রাজ সিংহাসনের প্রতি গান্ধীর আনুগত্য ছিল আরও গভীর।

যদিও তিনি ছিলেন অহিংসার স্বীকৃত উপাসক, তথাপি তিনি মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বরের রাজত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধের সৈন্য সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হয়ে কাজ করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গান্ধীর এই প্রত্যক্ষ সাহায্যের বিষয়ে রোম্যাঁ রোলাঁ ৭.৩.১৯২৮ তারিখে গান্ধীজীকে লেখেনঃ

"আমার ভগিনী ১৬ই ফেব্রুয়ারীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আপনার সহযোগিতা সম্বন্ধে আপনার নিবন্ধ আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন। ...কিন্তু আপনার মত একজন অদম্য সাহসী এবং গভীর বিশ্বাসপরায়ণ ব্যক্তি যিনি আপোষবিহীনভাবে পাইকারী নরহত্যার নিন্দা করেন—নিন্দা করেন জাতির সঙ্গে জাতির রণোন্মাদনার, তিনি যখন স্বেচ্ছায় এবং অন্যের বিনা প্ররোচনায় এইরূপ নরমেধে অংশগ্রহণ করেন, তখন পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমাকে দিয়ে আপনার এই কাজ সমর্থন করাতে পারে। এবং যে সকল যুক্তি আপনি দেখিয়েছেন, ক্ষমা করবেন, তার কোনোটাই সুযুক্তি নয়। এমন কি আমি একথাও বলব যে বরং বিনা যুক্তিতেই আমি আপনার ঐ কাজ বেশি বুঝতে সক্ষম হবো যুক্তি দিয়ে বোঝার চাইতে।

"...ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাগরিক যাঁরা, সাম্রাজ্যের নিরাপদ আশ্রয়ে উপকৃত যাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষা বন্ধনে থেকে সাম্রাজ্যের বেষ্টনীর মধ্যে স্বরাজ লাভের আশা পোষণ করেন যাঁরা, আপনি মনে করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপদের সময়ে সাম্রাজ্যের অত্যাচারের এবং দুঃখের—এমন কি সাম্রাজ্যের অপরাধেরও ভাগীদার হতে তাঁরা বাধ্য। আপনি আশা করেছিলেন এই অহিতকে যদি বীরের ন্যায় স্বীকার করে নেওয়া যায় তাহলে তার থেকে মঙ্গলেরই সূচনা হবে। অর্থাৎ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আপনাদের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবে এবং আপনারা তখন আপনাদের স্বকীয় কর্মের নিয়ন্তা হয়ে আত্মার শক্তি দিয়ে মনুষ্যত্ব ও ন্যায়বিচারের মহান আদর্শ, অহিংসা মন্ত্র, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে গ্রহণ করিয়ে নেবেন।

"ব্যবহারিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে ঘটনাপ্রবাহ আপনার এই যুক্তির উত্তর দিয়েছে। শুধু ফলের দিক দিয়ে বিচার করলে আপনার এই রাজানুরক্ত সুবিধাবাদ কোনো কাজেই আসেনি। কিন্তু যদিও তা সুফলদায়ী হোত—যদি এইভাবে আপনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বারা আপনাদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারতেন—হে বন্ধু, বিনা রূঢ়তায় শুধু এইটুকু বলতে অনুমতি দিন, লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তলিপ্ত ধ্বংস-যজ্ঞে স্বেচ্ছায় সহায়তা করার মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা আদায় করলে তা হোত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ। ভারতবর্ষকে সেই অপরাধের রক্তমাখা কালিমা কপালে

www.pathagar.com

নিয়ে বয়ে বেড়াতে হোত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। সেই রক্ত ঈশ্বরের কাছে তাকে অভিযুক্ত করতো!" Inde. ১৯১-৪ পৃঃ, মূল ফরাসী থেকে অনূদিত)।

গান্ধীজী যখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব আনলেন, কংগ্রেস দলের নেতারা তখন কিভাবে সাড়া দিয়েছিলেন সেটাও মনে রাখবার মত। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতার বিশেষ কংগ্রেসে গান্ধীজী যখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব আনলেন তখন বিপিনচন্দ্র পাল, মহম্মদ আলি জিন্না ও চিত্তরঞ্জন দাশ এর বিরুদ্ধতা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পক্ষে ১৮২৬ ও বিপক্ষে ৮৮৪ ভোটে এই প্রস্তাব পাশ হয়।

ডঃ আম্বেদকর, তাঁর লেখা 'পাকিস্তান অর পার্টিশান অব ইণ্ডিয়া'র ১৪১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখেছেনঃ "পরলোকগত Mr. Tairsee আমাকে একবার বলেছিলেন যে যাঁরা ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন কলকাতার ট্যাক্সি ড্রাইভার, যাঁদের এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবার জন্য ভাড়া করে আনা হয়েছিল।" গান্ধীজীর জীবিত-কালে ডঃ আম্বেদকর ঐ বইটি প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁর এই উক্তির কোনো প্রতিবাদ কোথাও করেছেন বলে আমার জানা নেই। কংগ্রেস দলের ভোটাভুটির যে ইতিহহাস আমরা এই পুস্তকের অন্যত্র দেখতে পাব তাতে এরূপ সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেওয়াও চলে না।

কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি গান্ধীজীর গভীর আনুগত্য আরও প্রকাশ পেল ১৯২১ সালের আমেদাবাদ কংগ্রেসে মৌলানা হসরৎ মোহানির প্রস্তাব নিয়ে। মৌলানা হসরৎ মোহানির প্রস্তাব ছিলঃ "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয়দের জন্য বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা।" এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সিংহবিক্রমে রুখে দাঁড়ালেন। তিনি বললেনঃ

"যে লঘুচিন্তার সঙ্গে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তা আমাকে দুঃখ দিয়েছে। প্রথমে হিন্দু ও মুসলমানরা অবিচ্ছেদ্য-ভাবে একতাবদ্ধ হোক। এখানে এমন কে আছেন যিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারেন—'হ্যাঁ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে?' আসুন আমরা সবার আগে নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করি; আসুন আমরা নিজেদের ক্ষমতা যাচাই করি। যে জলাশয়ের গভীরতা আমরা জানি না তার মধ্যে আমাদের যাওয়ার দরকার নেই এবং মিঃ হসরত মোহানির এই প্রস্তাব আমাদের সেই গভীরতায় টেনে নিয়ে যাবে যা দুরতিগম্য।" (আমেদাবাদে নিখিল ভরত কংগ্রেস কমিটির সভায় ভাষণ থেকে। ইণ্ডিয়ান এনুয়াল রেজিষ্টার ভলুমঃ ১, ১৯২২, পৃঃ ৩৯৭)

www.pathagar.com

এই একটা সামান্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর এইরূপ দৃঢ় মনোভাবের কারণ বোঝা শক্ত—একমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিরোধী আদর্শের প্রতি তাঁর গভীর আনুগত্যই তাঁর এই মনোবৃত্তির ব্যাখ্যা করতে পারে। হসরৎ মোহানির প্রস্তাবে কোন আন্দোলনের কথা ছিল না, কোন হুমকি ছিল না, কোন বিপজ্জনক ঝুঁকি নেওয়ার ইঙ্গিত ছিল না, শুধু ছিল ভবিষ্যতের আদর্শকে সাদা কথায় পরিষ্কার করে তুলে ধরার চেষ্টা। এমন কি উদ্দেশ্য লাভের পথ যে বৈধ ও শান্তিপূর্ণ হবে সেকথাও হসরৎ মোহানি বলেছিলেন। কাজেই গান্ধীজীর কঠিন বিরুদ্ধতাপূর্ণ ভাষণ শুনে কথাগুলি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর না উইনস্টন চার্চিলের তা উপলব্ধি করতে রীতিমত বেগ পাবার কথা।

অহিংস অসহযোগ মন্ত্রের মহান উদ্গাতা যখন একদিকে ইংরেজী বস্ত্র, ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজী বাণিজ্য, ইংরেজী সবকিছু বর্জন করতে দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন এবং অন্যদিকে ইংরেজী প্রভাবমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের প্রস্তাবে সিংহবিক্রমে বাধা দিলেন তখন এ-কথা না ভেবে পারা যায় না যে, হয় এই লোকটির মধ্যে একটা গভীর দ্বৈধতা ছিল অথবা তিনি নিজে তখনও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন কোন্ পথে ও কোন্ গন্তব্যে দেশবাসীকে নিয়ে যাবেন। এবং খুব সম্ভবত এই হাতড়ে বেড়ানো তিনি সারা জীবনেও শেষ করতে পারেন নি।

শুনতে হয়তো কটু লাগবে, কিন্তু ভারতের জাতীয় নেতাদের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দুরা একবাক্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতার মধ্যেই থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে নামকরা, তিলক, গান্ধী, মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, এঁরা বারবার বলেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতায় থেকে স্বাধীনতা লাভ করাই তাঁরা অধিক বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন। তাঁদের মতে পূর্ণ স্বাধীনতা কিছুই না খুবই নিকৃষ্ট আদর্শ, ডোমিনিয়ন স্টেটাসই সবচেয়ে মহত্তম আদর্শ।

১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে গান্ধীজী আবার বললেনঃ

"আমার মতে ব্রিটিশ সরকার যদি তাই করতে চায় যা তারা মুখে বলে এবং সততার সঙ্গে তাদের সমকক্ষ হতে আমাদের সাহায্য করে তাহলে সেটা ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করার চেয়েও হবে মহত্তর বিজয়। সেই কারণে সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকে স্বরাজলাভের জন্য আমি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো কিন্তু ব্রিটেনের দোষে তাই যদি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তাহলে তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে দ্বিধা করবো না। সম্পর্ক ছিন্ন করার দায়িত্বটি আমি সেই কারণে ব্রিটিশ জাতির উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। পৃথিবীর

www.pathagar.com

মহত্তর মানসিকতার ব্যক্তিরা নিরবচ্ছিন্নরূপে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক নন্ যাতে সর্ব সময়েই একের সঙ্গে অন্যের যুদ্ধ লেগেই থাকে; বরং তাঁরা চান বন্ধুভাবাপন্ন পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল দেশগুলির একটি যুক্তরাষ্ট্র। সেইরূপ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হতে এখনও হয়ত অনেক দেরী আছে। আমি আমার দেশের পক্ষে কোন বিরাট বিশেষত্ব দাবি করি না। কিন্তু স্বাধীনতার চেয়েও বিশ্বজনীন পারস্পরিক নির্ভরশীলতার আদর্শকে আমাদের গ্রহণ করবার প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করার মধ্যে আমি অসম্ভাব্যতার বা বিরাটত্বের কিছু দেখি না। আমি এই বলেই ক্ষান্ত থাকতে চাই যে ব্রিটেনই বলুক সে আমাদের সঙ্গে কোনো প্রকৃত সংস্রব রাখতে চায় না।" (বেলগাঁও কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ)

১৯২৫-এর মে মাসে ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে চিত্তরঞ্জন দাশ বললেনঃ

"আমার মতে স্বাধীনতার আদর্শ স্বরাজের আদর্শের চেয়ে সংকীর্ণতর। একথা সত্য যে, এর নিহিত অর্থ হচ্ছে পরাধীনতার ইতি কিন্তু তবুও এর মধ্যে থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ আমাদের প্রদান করে না। আমি এক মুহূর্তের জন্যও বলতে চাই না যে স্বরাজের সঙ্গে স্বাধীনতার কোনো সংগতি নেই। কিন্তু এখন শুধুমাত্র স্বাধীনতাই নয় যা প্রয়োজন তা হচ্ছে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষ কালকেই স্বাধীন হতে পারে এই অর্থে যে ব্রিটিশ জাতি আমাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারে কিন্তু তাহলেই আমি স্বরাজ বলতে যা বুঝি তার প্রতিষ্ঠা হবে না।.....আমার মতে স্বরাজের অর্থ এই হবে, প্রথমতঃ ভারতবাসীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সংযুক্তিকরণের স্বাধীনতা আমাদের থাকবে; দ্বিতীয়তঃ এই পথে আমাদের জাতীয় আদর্শকে ভিত্তি করে এগোতে হবে—দু হাজার বছর পিছিয়ে গিয়ে নয় বরং আমাদের জাতীয় স্বত্বা ও দৃষ্টিভঙ্গীর আলোক ও বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাবার পথ ধরে..."

"তারপরে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে এই আদর্শটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে অথবা বাইরে থেকে বাস্তবায়িত করা যাবে? কংগ্রেস থেকে সর্বদা এর উত্তরে বলা হয়েছে, 'আমাদের অধিকার স্বীকার করে নিলে সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকে আর না মেনে নিলে বাইরে থেকে।' আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মোন্নতি ও আত্মপরিপূর্তির সুযোগ থাকা চাই। প্রশ্ন হচ্ছেঃ আমরা নিজেদের জীবনাদর্শে বাঁচতে পারব কি না? যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকে আমাদের জাতীয় জীবনের পরিবর্ধন ও উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট সুযোগ লাভ করা যায় তাহলে সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকার নীতিই সঠিক গ্রহণীয় হবে। কিন্তু যদি জগন্নাথের রথের মত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রের পেষণে

www.pathagar.com

আমাদের জীবনকে নিষ্পেষিত করে তাহলে সাম্রাজ্যের বাইরে গিয়ে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করাই যুক্তিসঙ্গত হবে।..."

"বাস্তবিক পক্ষে, সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকার নীতি আমাদের বহু সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি দান করে। ডোমিনিয়ন স্টেটাস কোনো অর্থেই যথেষ্ট নয়। প্রকৃত সহযোগিতার ইচ্ছা নিয়ে জাগতিক সুখ সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যের অংশীদারদের স্বেচ্ছালব্ধ এটি এক অপরিহার্য মৈত্রী বন্ধ। গত মহাযুদ্ধের আগেই সাধারণভাবে মনে করা হয়েছিল যে কেবলমাত্র একটি সুবৃহৎ যুক্তরাষ্ট্র হিসাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং তার গঠনকারী অঙ্গগুলি বেঁচে থাকতে পারে। এটা বোঝা গেছে যে বর্তমান ব্যবস্থায় কোনো রাষ্ট্রই একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না এবং ডোমিনিয়ন স্টেটাস ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নামক যে কমনওয়েলথ্ রাষ্ট্রসংঘ তার প্রতিটি গঠনকারী অংশীদারের আত্মোপলব্ধির, আত্মোন্নতির ও আত্মপরিপূর্তির অধিকার সুরক্ষা করে এবং সেই কারণে আমি স্বরাজ বলে যার উল্লেখ করেছি এটি তার সকল লক্ষণগুলি প্রকাশ এবং ইঙ্গিত করে।"

"আমার কাছে এই প্রস্তাবনাটি এর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের জন্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। আমি বিশ্ব-শান্তিতে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি—সবার শেষে স্থাপিত হবে এক বিশ্বময় যুক্তরাষ্ট্র। আমি মনে করি বিভিন্ন জাতি নিয়ে যে কমনওয়েলথ্ যাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলা হয় তা হোলো ভিন্নতর জাতির প্রত্যেকের স্বতন্ত্র মানসিকতা নিয়ে গঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্র যাদের নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রনায়করা যদি ঠিক পথে পরিচালনা করেন তাহলে সমগ্র বিশ্বকে একসূত্রে গেঁথে নিয়ে মানুষের ধারণায় সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সমস্যায় নিশ্চিতভাবে একটি চিরস্থায়ী অবদান রেখে যাবে।.....আমি মনে করি সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের ভিতর থেকে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করুক যাতে সমগ্র মনুষ্যজাতির স্বার্থ রক্ষা হয়।"

'স্বাধীনতা' ও 'স্বরাজের' পার্থক্য সম্বন্ধে সমতুল্য ভাষার ভোজবাজী কেউ কল্পনায়ও আনতে পারেন কি?

৩

তাহলে দেখা যাচ্ছে চিত্তরঞ্জন দাশের মতে 'স্বরাজ' মানে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থেকে স্বাধীনতালাভ।

www.pathagar.com

একথা সত্য, ১৯২৭ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসে সর্বপ্রথম প্রস্তাব পাশ হয়েছিল যে কংগ্রেসের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা। ডঃ আম্বেদকর তাঁর 'পাকিস্তান অর পার্টিশান অব ইণ্ডিয়া' বইতে বলেছেন যে ওই প্রস্তাব হয়েছিল মতিলাল নেহরু ও দক্ষিণের কংগ্রেস নেতা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের মধ্যে বিরোধিতার জন্য। মতিলাল নেহরু চিরদিন 'পূর্ণ স্বাধীনতার' বিপক্ষে ছিলেন, তাই তাঁকে জব্দ করবার জন্য শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার জওহরলাল নেহরুকে দিয়েই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়েছিলেন।

সে যাই হোক, মাদ্রাজের এই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব কার্যত অগ্রাহ্য হয়ে যায় কংগ্রেসের দ্বারা প্রস্তাবিত সর্বদল সম্মেলনের মতিলাল নেহরু কমিটির দ্বারা—যে কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত করেছিলেন, ভারতের লক্ষ্য হচ্ছে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন। সুভাষচন্দ্র বসু এই কমিটির সভ্য ছিলেন এবং তিনিও ডোমিনিয়ন স্টেটাসের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন।

১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী নেহরু কমিটির প্রস্তাব অর্থাৎ ডোমিনিয়ন স্টেটাসই ভারতের লক্ষ্য—এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গান্ধীজীর প্রস্তাব ছিলঃ

"মাদ্রাজ কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সাপেক্ষে এই কংগ্রেস নেহরু কমিটি রচিত সংবিধানটি সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করবে যদি তা ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৯ এর মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়। কিন্তু যদি সেই তারিখের মধ্যে ঐ সংবিধান গৃহীত না হয় বা তার আগেই প্রত্যাখ্যান করা হয় তাহলে কংগ্রেস দেশব্যাপী এক অহিংস অসহযোগ গড়ে তুলবে যাতে নির্দিষ্ট অন্যান্য পন্থা ছাড়াও সকল প্রকার ট্যাক্স দিতে নিষেধ করা হবে।" (১৯২৯-এর কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজীর প্রস্তাব)

এখানে উল্লেখযোগ্য এই প্রস্তাবে এমন কথা বলতে মহাত্মা গান্ধী সাহস করেন নি যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট নেহরু কমিটির ডোমিনিয়ন স্টেটাসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবে। তিনি বলেছেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট নেহরু কমিটির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে কংগ্রেস ভারতবাসীকে 'কর বন্ধ' আন্দোলন আরম্ভ করতে বলবে। কিন্তু এই 'কর বন্ধ' আন্দোলনের লক্ষ্য যে পূর্ণ স্বাধীনতা এমন কথা মহাত্মা গান্ধী কোথাও বলেন নি।

১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি মতিলাল নেহরু চিত্তরঞ্জন দাশের মত এক ভাষার ভোজবাজী দেখালেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি বললেনঃ

www.pathagar.com

"স্বাধীনতার সঙ্গে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের সম্পর্ক বা সম্পর্কহীনতা নিয়ে একটি নিষ্ফল অনুসন্ধিৎসার দায়ভার আমি নেব না। পুঁথিগত বিচারে এ দুটি একই বা বিভিন্ন গোত্রের অথবা একটি অন্যটির বিরোধী, আমার কাছে এসবের কোনো মূল্য নেই। আমার কাছে এইটুকুই মূল্যবান যে ডোমিনিয়ন স্টেটাসে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য লাভ করা যায় যা পূর্ণ স্বাধীনতার কাছাকাছি এবং সব দিক থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সেইজন্য পরিপূর্ণ দাসত্বের পরিবর্তে যদি পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন ডোমিনিয়ন স্টেটাসে যতটুকু স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা আছে তাই দেওয়া হয় আমি এই পরিবর্তনের বিরোধী নই। কিন্তু ডোমিনিয়ন স্টেটাসকেই আমি মূল লক্ষ্য সাব্যস্ত করতে পারি না কারণ এটি পাওয়া যাবে এমন অন্য একটি গোষ্ঠী মাধ্যম থেকে যার উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব নেই। এবং সেই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাকে প্রকৃত নিষ্ঠার সঙ্গে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যেতে হবে। 'প্রকৃত নিষ্ঠার' কথা বললাম এই জন্যে যে, আমি জানি শুধু ধাপ্পা দিয়ে আমি কিছুই লাভ করতে পারবো না। এইভাবে যদি আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার কাছাকাছি পৌঁছাতে পারি তাহলেই ক্ষমতাসীন দল নিতান্তই অল্প কিছুর বিনিময়ে আমাদের সঙ্গে মীমাংসা করতে সচেষ্ট হবে।" (মতিলাল নেহরুর সভাপতির অভিভাষণঃ কলকাতা কংগ্রেস)

আমি একথা বলতে বাধ্য সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর একটা দ্বৈতমানসের ছায়া ভেসে বেড়াচ্ছে। এবং এর মধ্যে কপটতার অংশও কম নয়।

কলকাতা কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি চেয়েছিলেন নেহরু কমিটির 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের' খসড়া প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহিত হবার জন্য অপেক্ষা না ক'রেই কংগ্রেসের উচিত সরাসরি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য লড়াই শুরু করা।

তবে এটা ভুললে চলবে না, সুভাষচন্দ্র বসু নেহরু কমিটির সভ্য হিসাবে ডোমিনিয়ন স্টেটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। কলকাতা কংগ্রেসের বিষয়-নির্বাচনী সভায়ও তিনি ডোমিনিয়ন স্টেটাসের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন। এবং এমন কি কংগ্রেসের সভা বসবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি নাকি গান্ধীজীকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি গান্ধীজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন না (ডঃ যাদুগোপাল মুখার্জির লেখা 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' দেখুন)।

সেই কারণেই বোধহয় গান্ধীজী ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিয়েছিলেনঃ

"মুসলমানরা যেরকমভাবে আল্লাহর নাম কিংবা নিষ্ঠাবান হিন্দুরা

www.pathagar.com

যেরকমভাবে কৃষ্ণ বা রামের নাম জপ করে আপনারা সেইরকমভাবে মুখে মুখে স্বাধীনতার নাম আওড়াতে পারেন কিন্তু সেই আওড়ানো একেবারেই ফাঁকা আওয়াজ হয়ে দাঁড়াবে যদি তার পেছনে কোনো সম্মানের ভিত্তি না থাকে। আপনারা যদি আপনাদের নিজেদের প্রদত্ত কথা রক্ষা করতে না পারেন তাহলে স্বাধীনতার স্থান কোথায় হবে? যাই বলুন না কেন, স্বাধীনতা বস্তুটি অনেক কঠিনতম উপাদানে গঠিত। কথার ভোজবাজী দিয়ে একে তৈরী করা যায় না। আমার মনে হয় যে আপনারা স্বদেশের সম্মান রক্ষা করতে ইচ্ছুক এই কারণে যে বড়লাট আমাদের অপমান করেছে বা কোনো ইউরোপীয় বাণিজ্য গোষ্ঠীর সভাপতি আমাদের অপমান করেছে। আমরা বলি, আমরা আমাদের সম্মান রক্ষার জন্য স্বাধীনতা চাই। কিন্তু তাহলে আপনারা স্বাধীনতাকে একেবারে কাদাজলে টেনে নামাচ্ছেন। আমরা ব্রিটিশ গভর্ণ-মেণ্টকে এক বছরের মধ্যে আমাদের স্বমতে আনতে পারবো না এই হীন-মন্যতায় আপনারা কেন ভুগছেন, কেন ভাবছেন যে আমরা আমাদের সকল সামর্থ্যকে সংহত করতে পারবো না বা আমাদের যতখানি শক্তির প্রয়োজন তা আমরা করায়ত্ত করতে পারবো না?..."

"এক দীর্ঘস্থায়ী কষ্ট যন্ত্রণার জন্য ভীত হবেন না। আমি স্বীকার করছি, এটি প্রচণ্ডভাবে দীর্ঘস্থায়ী হবে কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় যখন আমরা আমাদের পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীকে বা রাজনৈতিক নেতাদের বিশ্বাস করতে পারি না, যখন আমাদের আত্মসম্মান জ্ঞান নেই, যখন আমরা আমাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করবার জন্য ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারি না তখন স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবেন না।" (ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টারলি রেজিস্টার, ১৯২৮, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭)

এমন কি, ১৯৩৭ সালেও গান্ধীজী লণ্ডনে তাঁর বন্ধু মিঃ পোলককে লিখেছিলেনঃ

"আপনি প্রশ্ন করেছেন ১৯৩১ এর গোলটেবিল বৈঠকে আমার দেওয়া অভিমত আমি এখনও পোষণ করি কি না। আমি তখন বলেছিলাম এবং এখন আবার বলছি যে, আমার দিক দিয়ে বলতে গেলে ষ্ট্যাটুট অফ ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের শর্ত অনুসারে অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছেদের পূর্ণ অধিকার সমেত ডোমিনিয়ন স্টেটাস ভারতের জন্য যদি প্রস্তাব করা হয় তাহলে আমি তা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবো।" (টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়া ১-২-৩৭)

১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে যিনি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন এবং যাঁর সভাপতিত্বে ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেই জওহরলাল নেহরুও শেষ পর্যন্ত ভাষার ভোজবাজী দেখিয়ে ছাড়লেন। সভাপতির ভাষণে তিনি বললেনঃ

www.pathagar.com

"যদি কলকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাব বলবৎ থাকে তাহলে আজকে আমাদের একটিমাত্র লক্ষ্য আছে—সেটি হচ্ছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বাক্যটি বর্তমান জগতে খুব সুখকর নয় কারণ এর দ্বারা আত্মকেন্দ্রিকতা এবং বিচ্ছিন্নতা বোঝায়। মানব সভ্যতা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ অনেক দিন ধরে গ্রহণ করেছে এবং এখন একটা বৃহত্তর সহযোগিতা এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরা যদি স্বাধীনতা বাক্যটি ব্যবহার ক'রে থাকি সেটি ঐ মহত্তর আদর্শের বিপরীত অর্থে করিনি। আমাদের নিকট স্বাধীনতার অর্থ ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। আমাদের এই মুক্তি অর্জন করবার পর ভারতবর্ষ যে বিশ্বজনীন সহযোগিতা ও যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সকল প্রয়াসকে স্বাগত জানাবে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই এবং এমন কি একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীমণ্ডলীর সমমর্যাদা সম্পন্ন সদস্য হবার জন্য সে তার নিজের স্বাধীনতার কিয়দংশ বিসর্জন দিতে রাজি হবে।" (লাহোর কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ থেকে)

গান্ধীজীর নিজের ভাষায় যারা নিজের পিতামাতা ভাইবোনকে বিশ্বাস করতে পারেনা; যারা ২৪ ঘণ্টা নিজের কথার ঠিক রাখতে পারে না, যাদের নিজেদের ঘরের ঠিক নেই, তারা সবাই ভাবছে কি করে বিশ্ব সমস্যা সমাধান করা যায়, কি করে world federation গঠন করা যায় এবং জগৎবাসীর মঙ্গল করা যায় কারণ সেই ছিল আমাদের নেতাদের স্বপ্নবিলাস।

মতিলাল নেহরু বা চিত্তরঞ্জন দাশের কথা বুঝাতে কষ্ট হয় না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও চতুর আইনজ্ঞ হিসাবে ভোজবাজী দেখাতে দুজনেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী—দুজনেই জীবনকে চরমভাবে (এমন কি চরমাতীতভাবেও) ভোগ করেছিলেন। প্রতিষ্ঠাবান আইনজ্ঞ হিসাবে দুজনেই স্বভাবত সাংবিধানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি যাকে বলে তা তাঁদের মধ্যে থাকা সম্ভবপর ছিল না। জীবনকে চরমভাবে ভোগ করে তাঁরা রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করেছিলেন —কারণ প্রচুর অর্থের দ্বারাও যে অভিলাষ তাঁদের পূর্ণ হয়নি রাজনীতি ক্ষেত্রেই তাঁরা তা পূর্ণ করতে পারতেন। তাছাড়া, সিদ্ধ ও সফল আইনজ্ঞ হিসাবে তাঁরা এমন একটা জীবনের জন্য তৈরী হয়েছিলেন যেখানে সত্য ও ন্যায়নীতির চেয়েও আইনের আক্ষরিক সত্যতার মূল্যই বেশি ছিল। অন্যান্য সকল প্রশ্নের কথা ভুলে গিয়ে মামলায় জয়লাভ করাই ছিল এই সকল আইনজ্ঞের পরম ও চরম লক্ষ্য। আমরা যেমন দেখতে পাব, এঁরা বহুক্ষেত্রে নিজেদের দলের লোকদেরই সামলে রাখতে পারেননি এবং যখন নিজেদের দলের অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে গিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশকে বহু প্রকার নীতিবিগর্হিত কর্মের আশ্রয় নিতে হয়েছিল (যার সম্বন্ধে লর্ড অলিভিয়ার হাউস অফ লর্ডসে প্রকাশ্য অভিযোগ করেছিলেন) তখন এঁদের পক্ষে বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বিষয়ে লম্বা লম্বা কথা বলে দেশবাসীর মনে

www.pathagar.com

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছাড়া আর কোনো কাজই হয়নি। ৯.৯.১৯২৪ তারিখে ভারতের ঋষিকল্প বিজ্ঞান-সাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে এক চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "স্বরাজ্য দল যেরূপ নৈতিক দুর্নীতি ও ব্যভিচার বলে দল পাকাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে কোনও আত্ম-সম্মান জ্ঞান বিশিষ্ট লোক ইহার মধ্যে থাকিতে পারে না।"

এই সব নেতারা একদিকে ভারতবাসীর অভিমতকে সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করতেন আবার অন্যদিকে ব্রিটিশ জনমতকেও রুষ্ট করতে চাইতেন না। সেইজন্যই বাধ্য হয়ে তাঁদের নানারক ভাষার ভোজবাজী সৃষ্টি করা ছাড়া উপায় ছিল না।

কিন্তু তিলক, গান্ধী বা জওহরলাল নেহরু কেন যে ভাষার ভোজবাজী দেখিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন আরও মহত্তর একথা প্রমাণ করতে চাইলেন তা বোঝা দুষ্কর।

৪

তিলকই সর্বপ্রথম বলেনঃ "স্বরাজে আমার জন্মগত অধিকার।" কিন্তু আমরা আগে দেখেছি, তিলকের কাছে, সে-স্বরাজ মানে ব্রিটিশ রাজ-সিংহাসনের প্রতি গভীর আনুগত্য। কাজেই একদিকে ব্রিটিশ রাজ-সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করা ও অন্য দিকে দেশের স্বাধীনতা দাবী করা—এতে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে এ কি ধরণের স্বাধীনতা তিলক চেয়েছিলেন? যদি বলা হয়, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতরক্ষা আইনের কবল থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তিলক এই মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছিলেন তাহলে তিলকের স্মৃতির প্রতি অপমান ছাড়া আর কিছুই করা হবে না। তিলক এর আগেও কারাদন্ড এবং ক্লোকের দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করেছেন। কাজেই আরও কারাবাসের কষ্ট এড়াবার জন্য তিলক এই মিথ্যা বিবৃতি দিতে পারেন, এমন লোক তিলক ছিলেন না। আসলে, তিলক ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভে বিশ্বাস করতেন না। গান্ধী, মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশও ডোমিনিয়ন স্টেটাসের মহত্তর আদর্শ সম্বন্ধে দেশবাসীকে বারবার অবহিত করে গেছেন।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভারতের প্রধান প্রধান জাতীয় নেতাদের মধ্যে যাঁরা হিন্দু ছিলেন তারা সকলেই একবাক্যে বলেছিলেন যে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ খুব সংকীর্ণ আদর্শ—মহত্তর ব্যক্তিদের কাছে এই সংকীর্ণ আদর্শ খুব উচ্চস্থান কখনই পেতে পারে না। তাঁদের মতে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস্-এর অংশীদার হয়ে থাকার মধ্যেই নিহিত ছিল

www.pathagar.com

চরম এবং পরম আদর্শ। পূর্ণ স্বাধীনতা মানুষকে অন্য দেশ হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, সতত বিবদমান হতে সহায়তা করে, কাজেই আদর্শ হিসাবে সেটা খুবই নিকৃষ্ট। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতায় থেকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অফ নেশনস্-এর বিভিন্ন রাজ্যের সংগে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বন্ধনসূত্রে বেঁচে থাকার চেয়ে গৌরবজনক আর কিছুই হতে পারে না। ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করেনি এবং তিনিও সেই কারণে কংগ্রেস ত্যাগ করে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য দেশকে প্রস্তুত করার প্রয়াস তখনকার মত আর করেন নি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৯২৮ এর কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে যখন মতিলাল নেহরু, গান্ধীজী প্রভৃতির সংগে সুভাষচন্দ্র বসু ডোমিনিয়ন স্টেটাস বনাম পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ নিয়ে বিতর্ক চালাচ্ছিলেন তখন জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস মণ্ডপ ছেড়ে বাইরে পালিয়ে থেকেছিলেন।

অবশ্য ১৯২৬ সালে বাংলার একজন জননায়ক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রকাশ্য সভায় লিখিত ভাষণে বলেছিলেন "অহিংসা অসহযোগে-এর দ্বারা ইউনিয়ন অটোনমী, ডিসট্রিক্ট অটোনমী, প্রভিনসিয়াল অটোনমী এমন কি হয়তো ডোমিনিয়ন স্টাটাস বা ইকুয়াল পার্টনারশিপ উইথইন দি ব্রিটিশ এম্পায়ার লাভ হইতে পারে কিন্তু বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ইহার দ্বারা কিছুতেই অর্জন করা যাইবে না।...বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সন্ত্রাসবাদ বা অ্যানারচিস্ট কনস্পিরেসি দ্বারা কস্মিনকালেও অর্জিত হইবার সম্ভাবনা নাই।...সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স এর লক্ষ্য প্রচলিত শাসন প্রণালীকে সংশোধন করা তাহার আমূল উচ্ছেদ সাধন করা নহে। সুতরাং বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে, Civil disobedience-এর দ্বারাও তাহা অর্জিত হইবে না।...বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করিবার একটি মাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা রহিয়াছে এবং তাহাকে লোকে চলতি ভাষায় রেভিলিউশন কিম্বা বিপ্লব বলে।...আমি বিশ্বাস করি যে আমার পরাধীন জন্মভূমিকে স্বাধীন করিবার আমার যদি জন্মগত অধিকার (Divine right) থাকে তবে রেভিলিউশন এর সাহায্যে তাহা কার্যে পরিণত করিবারও আমার জন্মগত অধিকার রহিয়াছে।"

প্রকাশ্য সভায় তিনিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছিলেন যে বিপ্লব না করে অন্য যে কোনো উপায়ে ভারতবর্ষ যে কোনো রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করুক না কেন তা পূর্ণ স্বাধীনতা কখনই হবে না। কিভাবে দেশকে বিপ্লবের পথে প্রস্তুত করতে হবে—কিভাবে দেশের গ্রামে গ্রামে বিপ্লবের

www.pathagar.com

বাণী প্রচার করতে হবে সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর লিখিত অভিভাষণে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর আগে ১৯২১ সালে ইনি ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে 'করবন্ধ আন্দোলন' পরিচালনা করে বাংলা সরকারের পাশ করা আইন প্রত্যাহার করে নিতে বাংলা সরকারকে বাধ্য করেছিলেন—যে কৃতিত্ব এমন-কি মহাত্মা গান্ধীও তখন দেখতে পারেন নি। কাজেই তাঁর ঘোষিত বিপ্লবের ডাক খুব যে ফাঁকা ছিল এমন নয়।

কিন্তু এই জননায়কের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে বাংলার কংগ্রেস নেতারা তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে বহু রকমের মিথ্যা অভিযোগ ও জঘন্য কুৎসা প্রচার করে তাঁর লাঞ্ছনার আর শেষ রাখেন নি—ফলে বাধ্য হয়ে তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। একমাত্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছাড়া আর কেউ তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মিথ্যার বিরুদ্ধে ধিক্কার তোলেন নি। (বঙ্গীয় কংগ্রেসের সেই কলঙ্কময় ইতিহাসের কথা এই বইয়ের শেষের দিকে পাওয়া যাবে)

কিন্তু, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অফ নেশনস্-এর মধ্যে অংশীদার হয়ে থাকার আদর্শকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের ওপরে স্থান দিয়ে আমাদের জাতীয় নেতারা জনসাধারণের মনে স্বাধীনতা বা স্বরাজের আদর্শ কি সে সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশতো দিলেনই না এমন-কি সত্যকার স্বাধীনতা অর্জনের স্পৃহাকেও দেশবাসীর মন থেকে বিদূরিত করলেন। শুধুমাত্র এই কারণেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনচিত্ততা বা অন্তরের স্বাধীনতা আমরা আজও অর্জন করতে পারিনি। কি করে পারবো? স্বাধীনতার আদর্শটাই বরাবর আমাদের কাছে নিকৃষ্ট বলে ধরা হয়েছে। কমনওয়েলথের অংশীদারত্বের তথাকথিত মহত্তর আদর্শকেও আমরা স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারিনি। তারই ফলস্বরূপ সমস্ত দেশে আজ স্বাধীনতার একটা বিকৃত অহমিকা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যেখানে আমরা দল বেঁধে নিরীহের উপর অত্যাচার করতে উন্মুখ হয়ে উঠি, কিন্তু সবলের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ ফুটে সত্য কথা বলবার সাহস রাখি না।

ভারতের জাতীয় নেতাদের মধ্যে মুসলমানেরা কিন্তু প্রথম থেকেই ঘোষণা করে এসেছেন যে পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য, যদিও ১৯২১ সালের আমেদাবাদ কংগ্রেসে হসরৎ মোহানির পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গান্ধীজীর বিরুদ্ধতায় পাশ করা যায় নি। ১৯২১ সালের সর্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মেলনে আজাদ শোভানি পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতীয়দের লক্ষ্য এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা পাশও হয়। প্রথমে অবশ্য সম্মেলন

www.pathagar.com

সভাপতি কংগ্রেস ভক্ত হাকিম আজমল খাঁ প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়েছিলেন কিন্তু বহুসংখ্যক সদস্যের বিরোধিতায় আজমল খাঁ ও তাঁর অনুচরেরা সভা-স্থল ত্যাগ করায় আজাদ শোভানির পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। (ইণ্ডিয়ান এনুয়াল রেজিষ্টার ভলুম-১ ১৯২২ পৃঃ ৪৫২)।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই সর্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মেলনে এই প্রস্তাব পাশ হয়ঃ

"This meeting proclaims that it is in every way religiously unlawful for a Musalman at the present moment to continue in the British Army or to induce others to join the Army and it is the duty of all the Musalmans in general and the Ulemas in particular to see that these religious commandments are brought home to every Musalman in the Army." (Indian Annual Register Vol. II 1921, P. 173).

"এই সভা ঘোষণা করছে যে বর্তমান মুহূর্তে কোনো মুসলমানের পক্ষে ব্রিটিশ সৈন্যদলের হয়ে কাজ ক'রে যাওয়া বা অন্যকে তাই করতে উদ্বুদ্ধ করা ধর্মের দিক থেকে একেবারেই নীতিবিরুদ্ধ এবং সাধারণভাবে সকল মুসলমানের এবং বিশেষ করে উলেমাদের কর্তব্য হবে এই ধর্মীয় অনুশাসনের কথা সৈন্যদলের সকল মুসলমানের গোচরে নিয়ে আসা।" (ইণ্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিষ্টার, দ্বিতীয় খণ্ডঃ ১৯২১, পৃঃ ১৭৩)

মৌলানা হসরৎ মোহানিই সমগ্র ভারতবর্ষে প্রথম কংগ্রেস সদস্য যিনি পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনই ভারতের লক্ষ্য এই মর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। ডঃ সৈফুদ্দিন কিচলু বলেছেনঃ

"The Congress was lifeless till the Khilafat Committee put life into it. When the Khilafat Committee joined it did in one year what the Hindu Congress had not done for 40 years." ("Through Indian Eyes" Times of India, 14.3.1925)

"যতদিন খিলাফৎ কমিটি এতে প্রাণসঞ্চার করেনি ততদিন কংগ্রেস প্রাণ-হীন হয়েছিল। যখন খিলাফৎ কমিটি এর সঙ্গে যোগ দিল তখন এক বছরেই তা করা সম্ভব হোলো যা হিন্দু কংগ্রেস গত ৪০ বছরে পারেনি।" (থ্রু ইণ্ডিয়ান আইজ, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ১৪-৩-২৫)

১৯২১ সালে মৌলানা মহম্মদ আলি সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করবার প্রস্তাব করে বলেছিলেনঃ

"যখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাদের ইসলাম বিরোধী ও ভারত বিরোধী নীতিতে বদ্ধপরিকর তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

www.pathagar.com

অভ্যন্তরে স্বায়ত্ত শাসনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বর্তমান ঘটনাবলীর সেই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান আদর্শ যুগোপযোগী নয়।.....মহাত্মা গান্ধী এবং যাঁরা তাঁর ধর্মমতে বিশ্বাস করেন তাঁরা এই মত পোষণ করেন যে এখন এবং ভবিষ্যতে শান্তিপূর্ণ পথেই আমরা গভর্ণমেণ্টের সংগে সংগ্রাম করবো কিন্তু ইসলাম ধর্ম আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলতে চায় যে অন্যায়ের অস্তিত্বকে যদি অহিংসার পথে অপসারিত করা না যায়, তাহলে হিংসার পথেই তার অপসারণ করতে হবে। পশুশক্তিকে পরাজিত করবার জন্য শক্তির ব্যবহার করা যেতে পারে। আজ অবশ্য ভারতীয় মুসলমানরা স্বীকার করে যে গভর্ণমেণ্টের পশুশক্তির বিরোধিতা করার সামর্থ্য তাদের নেই কিন্তু গভর্ণ-মেণ্টের ভারত বিরোধী নীতি যদি ক্রমাগত চালিয়ে যাওয়া হয় এবং শান্তিপূর্ণ পথ যদি কার্যকরী না হয় তাহলে প্রয়োজন হ'লে শক্তির প্রয়োগ হবে।" (ইণ্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯২১, পৃঃ ২৩১)

১৯২৮ সালে কলকাতার সর্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মেলনে মৌলানা মহম্মদ আলি বলেছিলেনঃ

"In the All Parties' Convention I had said that India should have Complete Independence and there was no communalism in it. Yet I was heckled at every moment and stopped during my speech at every step. To-day, they want to have the whole world admit every letter of the Nehru Committee Report. Today Mahatma Gandhi and Sir Ali Imam would be sitting under one flag and over them would fly the flag of the Union Jack."

"The Nehru Report had at its preamble admitted the bondage of servitude and Pandit Motilal's resolution was the worst of all. Dr Ansari the President of the All Parties' Convention was a mere puppet in the hands of Pandit Motilal Nehru and that Mr. J. M. Sengupta has put on the same garb. Only the other day they passed a resolution for Swaraj within the British Government if possible and without it if necessary and the time had come for them to say that Swaraj must be without the British Empire and yet he (Motilal Nehru) said it (Dominion Status) was freedom. The link is nothing but a missing link. . . . Freedom and Dominion Status are widely divergent things.

www.pathagar.com

"I will declare before you that the goal of the Indian Musalmans is Complete Independence of India." (Indian Annual Register 1928, Vol. II).

"আমি সর্বদল সম্মেলনে বলেছিলাম যে, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা চাই এবং তার মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। তবুও আমাকে প্রতিক্ষণে নিগ্রহ করা হয়েছিল এবং প্রতি পদে আমার বক্তৃতা বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আজ ওঁরা চান সমগ্র পৃথিবী নেহরু কমিটির রিপোর্টের প্রতিটি অক্ষর সমর্থন করুক। আজ মহাত্মা গান্ধী ও স্যার আলী ইমাম একই পতাকার নিচে বসবেন এবং তাঁদের উপরে উড়বে ব্রিটিশ রাজের পতাকা।

"নেহরু রিপোর্ট তার উপক্রমণিকাতেই দাসত্বের বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং পণ্ডিত মতিলালের প্রস্তাবটি ছিল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। সর্বদল সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ আনসারি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর হাতের পুতুলমাত্র ছিলেন এবং ঐ মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত সেই বেশই পরিধান করেছেন। এই তো সেদিন ওঁরা প্রস্তাব নিলেন যে, যদি সম্ভব হয় তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থেকে এবং প্রয়োজন হলে বাইরে থেকে স্বরাজ চাই। এখন ওঁদের বলবার সুযোগ এসেছে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরেই আমাদের স্বরাজ চাই অথচ তিনি (মতিলাল নেহরু) বলছেন যে ডোমিনিয়ন স্টেটাসই স্বাধীনতা। সংযোগ সূত্রটি একেবারেই অদৃশ্য সূত্র ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাধীনতা এবং ডোমিনিয়ন স্টেটাস সম্পূর্ণরূপে বিপরীত বস্তু।

"আমি আপনাদের সামনে ঘোষণা করছি যে, ভারতীয় মুসলমানদের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।" (ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার, ১৯২৮, ভলিউম—২)

১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বা ডেমিনিয়ন স্টেটাসের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। মৌলানা মহম্মদ আলিও সর্বদল সম্মেলনে থেকেই ডোমিনিয়ন স্টেটাসের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের এবং খুব সম্ভবত এশিয়া মহাদেশের দুর্ভাগ্য যে এই দুই নায়ক একযোগে কাজ করে কংগ্রেসের ভিতর ডোমিনিয়ন স্টেটাসের তদ্বিকারদের ধ্বংস করতে পারেন নি। যদি এঁরা দুজন একসংগে কাজ করতে পারতেন তাহলে ভারতবর্ষের এবং সমগ্র এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস আজ অন্য রকম দাঁড়াতো। কিন্তু কেন যে এঁরা এক সংগে মিলিত হতে পারেন নি সেইটাই খুব বড় প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জবাবের মধ্যেই ভারত বিভাগের ও পাকিস্তান সৃষ্টির জটিল সূত্রটিও খুঁজে পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

আসলে ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ কখনই ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারেনি। বস্তুতঃ মুসলমান সমাজও ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। যে মৌলানা মহম্মদ আলি ইংরেজের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং কারাবরণ করেছিলেন, যিনি বলেছিলেন, ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে "force must be met with force" ১৯৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে তিনিই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডকে লিখেছিলেনঃ

"Mahatma Gandhi and Motillal Nehru are following the footsteps of the Hindu Mahasava. I am ready to help your Government with all the forces at my command." (Speeches and Writings of Mohammad Ali).

"মহাত্মা গান্ধী ও মতিলাল নেহরু হিন্দু মহাসভার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করছেন। আমার সাধ্যে যতখানি শক্তি ও সামর্থ্য আছে আমি তার সবটা দিয়ে আপনার গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করতে চাই।" (স্পিচেস এ্যাণ্ড রাইটিংস অফ মোহাম্মদ আলী)

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা তা সে বাঙালী হোন বা মারাঠি হোন সাধারণভাবে মুসলমান-বিরোধী ছিলেন। মৌলানা আজাদের বই 'ইণ্ডিয়া উইন্‌স ফ্রিডম'-এ একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেনঃ

"The revolutionary groups were recruited from the Hindu Middle Class. In fact, all the revolutionary groups were actively anti-Muslim." (p.5)।

"বিপ্লববাদী দলগুলি মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ থেকে সংগৃহীত হোতো। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি বিপ্লববাদী দল ছিল কার্যকরীভাবে মুসলিম বিরোধী।" (ইণ্ডিয়া উইন্‌স ফ্রিডম, পৃঃ ৫)

বামপন্থী লেখক শ্রীগোপাল হালদার লিখেছিলেনঃ

"Revolutionary terroisim failed in one vital matter—it could not enlist active Muslim support." (Studies in Bengal Renaissance. (p. 257)।

"বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। আর তা হ'ল এই যে, তারা সক্রিয় মুসলিম সমর্থন লাভ করতে পারেনি।" (স্টাডিজ ইন বেঙ্গল রেনেসাঁ, পৃঃ ২৫৭)

কিন্তু যে আন্দোলনের প্রধান ভিত্তিই ছিল মুসলমানবিরোধী, সে

www.pathagar.com

আন্দোলন কি করে মুসলমানদের আকৃষ্ট করতে পারবে তা আমাদের মত সাধারণ বুদ্ধির লোকের অগোচর।

অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা ছিলেন সে-কথার সমর্থনে সাহিত্যিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেনঃ "কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, ব্রাহ্ম কৃষ্ণকুমার মিত্র এই শিবাজী উৎসবে যোগ দিলেন না। কেন না মূর্তি গড়িয়া ভবানী পূজা হইয়াছে। ইহা নিছক পৌত্তলিকতা —ব্রাহ্ম হইয়া তাঁহারা এই পৌত্তলিকতাপূর্ণ উৎসবে কি করিয়া আসেন? বটেইতো! দেশ আগে না নিরাকার আগে? ব্রাহ্মদের পক্ষে যদি ভবানীমূর্তিতে এতটা গোল বাধে তবে মুসলমানদের পক্ষেত কথাই নাই। বিপিনচন্দ্র পাল ব্রাহ্ম হইলেও এ ক্ষেত্রে ভবানীমূর্তি তাঁহাকে আটকায় নাই। অরবিন্দ বরোদা থাকিতে নিজে বগলা মূর্তির পূজা করিয়াছেন। এক পায়ে দাঁড়াইয়া বগলা-মন্ত্র জপ করিয়াছেন। ভবানী মন্দির বই ছাপাইয়া বিপ্লবের প্রচার কার্য করিয়াছেন। সুতরাং ভবানীমূর্তি তাঁহাকেত আটকাইতে পারে না। কিন্তু মুসলমান বর্জিত মুসলমান-ধর্মবিরোধী এই প্রকার উৎসবকে তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি চরমপন্থী নেতারা সেদিন প্রাণপণে যেরূপ জাতীয়তার বেদীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাত নিরপেক্ষ জাতীয়তা নয়, কংগ্রেসী জাতীয়তা নয়...ইহা নির্জলা পৌত্তলিক হিন্দুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু জাতীয়তা। ইহা বঙ্কিম-প্রদর্শিত ও বঙ্কিম অনু-প্রাণিত জাতীয়তা।

"আমরা দেখিয়াছি দেখিতেছি অরবিন্দ এই বঙ্কিম-প্রদর্শিত জাতীয়-তাকেই স্বজ্ঞানে ১৮৯৪ খৃঃ হইতেই অনুসরণ করিতেছেন। ব্রাহ্ম সমাজ অথবা মুসলমানের তিনি ধার ধারেন না, তিনি এক পায়ে দাঁড়াইয়া বগলা মন্ত্র জপ ও বগলা মূর্তি পূজা শেষ করিয়া আসিয়াছেন। অতি প্রত্যুষে স্নান করিয়া চণ্ডীপাঠ সমাপন করিয়া তিনি এখন গীতা পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। এক হাতে গীতা আর এক হাতে তলোয়ার দিয়া তিনি অন্ধকারের গুপ্ত সমিতিতে হেমচন্দ্র কানুনগোকে ইতিপূর্বে বরোদা হইতে বাংলা দেশে আসিয়া দীক্ষা পর্যন্ত দিয়াছেন। এই সকল ব্যাপার ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহাকে বুঝিবার অনেকটা সুযোগ আমরা পাইতেছি। অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতিতে মা-কালীও আছেন এবং শ্রী-গীতাও আছেন। এতে মুসলমান ভ্রাতাগণ যদি বলেন যে, এ ব্যবস্থায় দেশ উদ্ধারের জন্য আমরা যাই-ই বা কী করিয়া আর থাকিই বা কোন মুখে? আমাদের ত একটা পৃথক ধর্ম ও তার অনুশাসন আছে...এ কথার জবাব ত চরমপন্থীদের ও গুপ্ত সমিতির দেওয়াই কর্তব্য।

"চরমপন্থী রাজনীতি ও বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি উভয়েই হিন্দু জাতীয়-তার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দুই সম্প্রদায়ই ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ প্রচার

www.pathagar.com

করেন নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও অনুষ্ঠানকে ইঁহারা যেন প্রাণপণে টানিয়া আনিয়াছেন। ভাবিয়াছিলেন যে ইহার দ্বারাই তাড়াতাড়ি কার্য উদ্ধার হইয়া যাইবে। আমার বলিবার কথা, ১৯০৬ খৃঃ অরবিন্দ গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য এই দুই প্রকার রাজনীতিতে প্রবেশ করিবার মুখেই কংগ্রেসী জাতীয়তাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। হিন্দুয়ানী ও হিন্দু সাধনা বর্জিত কংগ্রেসী বস্তুতন্ত্রহীন জাতীয়তা অরবিন্দ রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ মুখেই বর্জন করিয়াছেন। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাই অরবিন্দের জাতীয়তা, কংগ্রেসী জাতীয়তা তাঁহার জাতীয়তা নহে বরং জাতীয়তার বিপরীত বস্তু।" (শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ, পৃঃ ৪৫২-৩)

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশে বিপ্লববাদ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এক সর্বাঙ্গীণ বিপ্লব বা বিদ্রোহ, যেমন ঘটেছিল আলজেরিয়ায় বা ফরাসী ইন্দো-চীনে তেমন বিপ্লব ঘটাবার জন্য কোনো প্রচেষ্টা আমাদের দেশে কখনও কেউ করেন নাি কাজেই বিপ্লববাদ মানে আমাদের দেশে যে বিপ্লববাদের প্রচলন ছিল—তার আদর্শ কোনদিনই এমনটি ছিল না যা সমগ্র দেশে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সূচনা করে। আমাদের দেশে বিপ্লববাদ বা Terrorism-এর আদর্শ এক মুষ্টিমেয় দুর্ধর্ষ কর্মী-গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদের দুর্ধর্ষ কর্মের দ্বারা, বিভিন্ন আক্রমণাত্মক ঘটনার মাধ্যমে তাঁরা ইংরেজ সরকারকে ভয় দেখিয়ে এদেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই বীর এবং আত্মদানে সতত উদগ্রীব ছিলেন।

কিন্তু বিপ্লববাদ বা Terrorism-এর আদর্শকে আমাদের দেশের বরেণ্য নেতারা কেউ প্রকাশ্যে কেউ অপ্রকাশ্যে মুক্ত কণ্ঠে নিন্দা করে গেছেন।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেনঃ

"With anarchists no one can have any sympathy. Murder is murder; no matter by what name the deed is sought to be palliated or by what motives excused. (A Nation in Making, P-234).

"এনার্কিষ্টদের (সন্ত্রাসবাদীদের) প্রতি কারও কোনো সহানুভূতি থাকতে পারে না। নরহত্যা নরহত্যাই; কার্যটিকে যে নাম দিয়েই হোক গ্রহণীয় করবার অথবা যে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মার্জনা করবার চেষ্টা করা হোক না কেন।" (এ নেশান ইন মেকিং, পৃঃ ২৩৪)

"...Let there be no misconception about my attitude. I do not stand here in justification of anarchical events which have unfortunately taken place in Bengal. I express the sense of the

www.pathagar.com

better mind of Bengal and I may add of all India when I say we all deplore these anarchical incidents. My Indian colleagues and myself have condemned them in our columns with the utmost emphasis that we can command. They are in entire conflict with those deep-seated religious convictions which colour conciously or unconsciously the every day lives of our people. Anarchism, if I may say so without offence is not of the East but of the West. It is a noxious growth which has been transplanted from the West." (P-260).

"এ ব্যাপারে আমার মনোভাব সম্বন্ধে কারও কোনো ভ্রান্ত ধারণা করা উচিৎ নয়। বাংলায় যে সকল সন্ত্রাসবাদের ঘটনা দুর্ভাগ্যবশতঃ ঘটে গেছে তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করবার জন্য আমি এখানে এসে দাঁড়াইনি। আমি যখন বলি যে আমরা সকলে এই সন্ত্রাসবাদের ঘটনাগুলিকে নিন্দা করি তখন আমি বাংলা তথা ভারতের মহত্তর মানুষদের ভাবটাই প্রকাশ করি। আমার ভারতীয় সহযোগীরা এবং আমি আমাদের সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়ে এই সকল ঘটনাবলীর নিন্দা করেছি। যে সকল গভীরভাবে প্রোথিত ধর্মবিশ্বাস জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমাদের দেশবাসীর প্রতিটি দিনকে রঞ্জিত করে এগুলি তার আমূলভাবে বিরোধী। আমি কাউকে আঘাত না দিয়ে এইটুকু বলতে পারি যে সন্ত্রাসবাদ প্রাচ্যদেশের নয়, বরং প্রতীচ্যের। এই বিষাক্ত বীজ প্রতীচ্যদেশ থেকে আমাদের দেশে রোপিত করা হয়েছে।" (এ নেশন ইন মেকিং, পৃঃ ২৬০)

লোকমান্য তিলক বলেছেনঃ

"আমি শেষ কথা হিসাবে এইটুকু বলতে পারি যে আমরা ভারতবর্ষে সেইটাই করবার চেষ্টা করছি আয়ারল্যাণ্ডে আইরিশ হোমরুল পন্থীরা শাসনব্যবস্থার সংশোধনের জন্য যতটুকু করেছেন। আমরা এটা করছি গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধনের জন্য নয় এবং আমার বলতে দ্বিধা নেই যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল হিংসাত্মক কার্যাবলী সংঘটিত হয়েছে সেগুলি শুধু আমার কাছে বিতৃষ্ণাসূচকই নয় পরন্তু আমার মতে বাস্তবক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের রাজনৈতিক অগ্রগতির প্রসারকে যথেষ্টরূপে অব্যাহত করেছে। আগে যেমন বহুবার বলেছি ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীতে হোক বা সর্বসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীতে এ সবই সমানভাবে নিন্দনীয়।" (লাইফ অফ বি, জি, তিলক, ডি, পি, কর্মকার, পৃঃ ২৪৪)

জওহরলাল নেহরু লিখেছেনঃ

"বহুরকমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করা হয়েছে। এমনকি

www.pathagar.com

আধুনিক বিপ্লবাদী কর্মপদ্ধতিতেও এর নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু এর একটি সম্ভাব্য কুফল আমাকে সর্বদাই বিশেষভাবে শংকিত করে তুলতো এবং সেটা হচ্ছে ভারতে বিক্ষিপ্ত এবং সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক ঘটনা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। যেখানে লোকে ধর্মের নামে বা স্বর্গে স্থানলাভ করবার জন্য নরহত্যা করে, সেখানে সন্ত্রাসবাদী হিংসার আদর্শকে তাদের কাছে গ্রহণীয় করে তোলা এক বিপজ্জনক ব্যাপার। রাজনৈতিক হত্যাকান্ড এমনিতেই গর্হিত কাজ কিন্তু ধর্মের নামে নরহত্যা আরও গর্হিত কারণ অন্যজগতের ব্যাপার নিয়ে এটা জড়িত এবং সেসব ব্যাপারে কারও সংগে কোনো যুক্তির কথা তোলা যেতে পারে না। কখনও কখনও এই উভয়ের মধ্যেকার সীমারেখা এত সূক্ষ্ম হয়ে দাঁড়ায় যে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায় এবং রাজনৈতিক হত্যাকান্ড যেন এক অপার্থিব পদ্ধতিতে আধি-ধার্মিক হয়ে দাঁড়ায়।

"এটা খুব আশ্চর্যের কথা যে, সন্ত্রাসবাদীরা নিজেরাই বা তাদের মধ্যে অনেকেই স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা পোষণ করে যদিও তার অন্য উদ্দেশ্য থাকে। তাদের জাতীয়তাবাদী স্বৈরতান্ত্রিকতা ইউরোপীয়, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও উচ্চবিত্ত ভারতীয়দের সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ায়।" (আত্মজীবনী, জওহরলাল নেহরু, পৃঃ ১৫)

বিপ্লববাদ সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মত জানা যায় সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে। তিনি লিখেছেনঃ

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এই রেভোলিউসনারীদের সম্বন্ধে আপনার যথার্থ মতামত কি?

"সম্মুখের আকাশ ফর্সা হইয়া আসিতেছিল, তিনি (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন) রেলিং ধরিয়া কিছুক্ষণ উপরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, এদের অনেককে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে একেবারে ভয়ানক মারাত্মক। এই অ্যাক্টিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্তত পঁচিশ বছর পেছিয়ে যাবে। তা ছাড়া এর মস্ত দোষ এই যে, স্বরাজ পাবার পরেও এ জিনিষ যাবে না তখন আরও স্পর্ধিত হয়ে উঠবে, সামান্য মতভেদে একেবারে 'সিভিল ওয়ার' বেধে যাবে। খুনো-খুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সংগে ঘৃণা করি, শরৎ বাবু।

"দেশের মধ্যে রেভোলিউসনারী ও গুপ্ত সমিতির অস্তিত্বের জন্য কিছুকাল হইতে তিনি নানা দিক দিয়া নিজেকে বিপন্নজ্ঞান করিতেছিলেন। তাঁহার মুস্কিল হইয়াছিল এই যে, স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা বলি স্বরূপে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের একান্তভাবে না ভালোবাসাও তাঁহার পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল তাঁহাদের প্রশ্রয় দেওয়াও তাঁহার পক্ষে তেমনি অসম্ভব

www.pathagar.com

ছিল। তাঁহাদের চেষ্টাকে দেশের পক্ষে নিরতিশয় অকল্যাণের হেতু জ্ঞান করিয়া তিনি অত্যন্ত ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সমিতিকে উদ্দেশ করিয়া আমাকে একদিন বাঙ্গলায় একটা appeal লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। আমি লিখিয়া আনিলাম "যদি তোমরা কোথাও কেহ থাকো যদি তোমাদের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করিতেও না পার ত অন্তত ৫/৭ বৎসরের জন্যও তোমাদের কর্মপদ্ধতি স্থগিত রাখিয়া আমাদের প্রকাশ্যে সুস্থ-চিত্তে কাজ করিতে দাও। ইত্যাদি।" কিন্তু আমার 'যদি' কথাটায় তিনি ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন 'যদিতে' কাজ নেই। সাতাশ বৎসর ধরে assuming but not admitting করে এসেছি কিন্তু আর ফাঁকি নয়। আমি জানি তারা আছে, 'যদি' বাদ দিন।"

আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম, "আপনার স্বীকারোক্তির ফল দেশের উপরে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।"

দেশবন্ধু জোর করিয়া বলিলেন, "না। সত্য কথা বলার ফল কখনও মন্দ হয় না।" বলা বাহুল্য, আমি রাজি হইতে পারি নাই এবং আবেদনও প্রকাশিত হইতে পারে নাই।" (স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ৫৭-৫৯)।

১৯২৪ সালে আমেদাবাদ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গোপীনাথ সাহার (ইনি কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মনে করে আর্নস্ট ডে নামে একজন নিরপরাধ ইংরেজকে হত্যা করেন) মহৎ উদ্দেশ্যের প্রশংসাসূচক প্রস্তাব উত্থাপিত হলে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেনঃ

"What preyed upon my mind was the fact of unconscious irresponsibility and disregard of the Congress creed or policy of non-violence. That there were seventy Congress representatives to support the resolution was a staggering revelation."

"আমার মনকে যা পীড়া দিয়েছিল সেটা হচ্ছে এক অবচেতন দায়িত্ব-হীনতার ঘটনা ও কংগ্রেসের অহিংসার আদর্শ বা নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা। এই প্রস্তাবের সমর্থনের পক্ষে যে সত্তরজন কংগ্রেস প্রতিনিধি ছিলেন সেটাই ছিল সবচেয়ে বিধ্বংসী উন্মিলন।"

এই বলে সভামঞ্চে মহাত্মা গান্ধী কেঁদে ফেলেছিলেন।

এমনকি স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৫ সালে ফরাসী মনিষী রোম্যাঁ রোলাঁর কাছে স্বীকার করেছিলেন যে 'সন্ত্রাসবাদ কখনই সুস্থ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়' "Terrorism is not a healthy political method. (Inde, P. 381)

সন্ত্রাসবাদকে দেশের বরেণ্য নেতারা কেউ প্রকাশ্যে কেউ অপ্রকাশ্যে নিন্দা করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণ একে এক অত্যুজ্জ্বল গৌরবের

www.pathagar.com

মহিমায় আস্তীর্ণ করে রেখেছেন। তাতে মনে হয় আমাদের দেশের নেতারা এক কথা বলেন কিন্তু জনসাধারণ অন্য কথা ভাবেন।

যাই হোক আমাদের দেশের বিপ্লববাদ হিন্দু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তা-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই দিক দিয়ে তা যে মুসলমান-বিরোধী ছিল তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের 'ঋষি' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল। বর্তমান ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ঈশ্বরতুল্য ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বাংলা দেশে বাল্যবিধবাদের দুঃখ মোচনের জন্য বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত করার আন্দোলন করছিলেন তখন বাংলা দেশের কয়েকজন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি তখনকার ইংরেজ রাজপ্রতিনিধির কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছিলেন যে বিধবা-বিবাহ আইন অনুমোদিত হলে হিন্দু সমাজ রসাতলে যাবে কারণ বিধবা-বিবাহ হিন্দু-শাস্ত্র বিরোধী। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম। ভাবতে খুব মজা লাগে, যে বন্দেমাতরম গান গেয়ে এদেশে বহু লোক লাঠি খেয়েছে, বন্দুকের গুলি খেয়েছে, এমন কি ফাঁসি গেছে, সেই বন্দেমাতরম গানের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রকে ইংরেজ সরকার রায় বাহাদুর ও. সি. আই. উপাধি দিয়েছিলেন, তখনকার ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁকে সাধুবাদ জানিয়ে এসেছিলেন। তাঁর লেখা ও রচনা দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র যে এক হিন্দু জাতীয়তাবাদের গোড়া পত্তন করে গিয়েছিলেন এ অস্বীকার করবার উপায় নেই। অন্তত তাঁর রচনার ভেতরে ধর্ম নিরেপেক্ষ জাতীয়তাবাদের কোনো স্থান যে ছিলনা একথা স্বীকার করতেই হবে। রাজনীতির সংগে ধর্মতত্ব জুড়ে দিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম এ-দেশের মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ নিষিক্ত করলেন।

ভিন্নধর্মাবলম্বীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্বেষের উল্লেখ করে বঙ্কিমের "কৃষ্ণচরিত্রের" সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ"কৃষ্ণচরিত্র পাঠ করিতে সর্ব-দাই মনে এই খেদ উপস্থিত হয় যে সাহিত্যে যে প্রণালীতে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় বঙ্কিম সে-প্রণালী অবলম্বন করেন নাই।...

"বঙ্কিম গ্রন্থের আরম্ভ হইতেই তরবারি হস্তে সংগ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন ; কোথাও শান্তভাবে তাঁহার কৃষ্ণের সমগ্র মূর্তি আমাদের সম্মুখে একত্র ধরিবার অবকাশ পান নাই।...বঙ্কিম এই গ্রন্থে অনাবশ্যক যে সকল কলহের অবতারণা করিয়াছেন আমাদের নিকট তাহা অত্যন্ত পীড়াজনক বোধ হইয়াছে। কারণ, যে আদর্শ হৃদয়ে স্থির রাখিয়া বঙ্কিম এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন সেই আদর্শের দ্বারাই সমস্ত ভাষা এবং ভাব অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলে তবেই সে আদর্শের মর্যাদা রক্ষা হয়। বঙ্কিম যদি তুচ্ছ বিরোধ এবং অনুদার সমালোচনার অবতারণাপূর্বক চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন তবে সেই

www.pathagar.com

চাঞ্চল্য তাঁহার আদর্শের নিত্য নির্বিকারত্ব দূর করিয়া ফেলে।...

"পাশ্চাত্য মূর্খ" অর্থাৎ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি লেখক অজস্র অবজ্ঞা বর্ষণ করিয়াছেন। প্রথমত সে-কাজটাই গর্হিত, দ্বিতীয়ত এমন গ্রন্থে সেটা অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে। মান্যজনের সমক্ষে অন্য কাহারও প্রতি অযথা দুর্ব্যবহার কেবল দুর্ব্যবহার মাত্র নহে, তাহা মান্য ব্যক্তির প্রতিও অশিষ্টতা। বঙ্কিম যাঁহাকে মানব শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন...তাঁহারই চরিত্র-প্রতিষ্ঠা স্থলে তাঁহারই আদর্শের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া মতভেদ উপলক্ষে চপলতা প্রকাশ করা আদর্শের অবমাননা। কেবল য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি নহে সাধারণতঃ য়ুরোপীয় জাতির প্রতিই লেখক স্থানে স্থানে তীব্র বৈরিতা প্রকাশ করিয়াছেন।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭-৮)

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক সংকীর্ণ দৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রীগোপাল হালদার লিখেছেনঃ "সাহিত্য কীর্তি দিয়ে বিদ্যাসাগরের পরিমাপ হবে না। তাঁর সাহিত্য কীর্তির যথার্থ পরিমাপ বঙ্কিমচন্দ্র করতে পারেননি—তা বঙ্কিম-চন্দ্রের সামাজিক সংকীর্ণদৃষ্টির ফল। বঙ্কিমের ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য—তিনি উদার ছিলেন না।" (বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা, ২য় খণ্ড পৃঃ ২১৮)।

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেনঃ "বঙ্কিমবাবু চরিত্রাংশে কেশবচন্দ্র সেন, মহেন্দ্রলাল সরকার বা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সমকক্ষ লোক ছিলেন না, কিন্তু প্রতিভার জ্যোতিতে দেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২৫৪)

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের জয় পতাকা তুলতে গিয়ে এই মহান ধর্ম ও দর্শনের কিছুটা অপকার করে গেছেন। 'আনন্দমঠে' তিনি হিন্দু সন্নাসীদের রাষ্ট্রনৈতিক বিদ্রোহের দিশারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। হিন্দু সন্নাসীদের এইভাবে চিহ্নিত করা হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের পরিপন্থী। আমাদের উপনিষদ, গীতা, বেদ-বেদান্তের কোনো স্থানে এমন নির্দেশ নেই যে সন্ন্যাসীকে রাষ্ট্রনৈতিক বিদ্রোহের নেতৃত্ব করতে হবে। বরং সন্ন্যাসীকে সামাজিক আন্দোলন ও রাষ্ট্রনৈতিক বিদ্রোহ থেকে দূরে থাকবার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে। গীতায় যাঁদের যুদ্ধ করতে আহ্বান জানিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁরা কেউই সন্নাসী ছিলেন না—সাধারণ গৃহী ছিলেন।

এইভাবে সন্ন্যাসীকে তাঁর স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করে রাষ্ট্রনৈতিক বিদ্রোহের হোতা রূপে তৈরি করা ভালো কি খারাপ সে তর্ক করবার স্থান এটা নয়। কিন্তু বলতে চাই, ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের মহান আদর্শের এটা সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এক বিধ্বংসী প্রচেষ্টা। ভারতীয় আদর্শে সন্ন্যাসীর কাছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতা উভয়ই মূল্যহীন। কারণ এদেশে রাজ-তন্ত্রের তরবারি সমর্থনে ধর্মের আদর্শ কখনও আত্মরক্ষা করেনি। ভারতের

www.pathagar.com

আদি হিন্দু ধর্মের সে আদর্শ নয়। অতএব হিন্দু সন্ন্যাসীকে দিয়ে রাজ-ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য যুদ্ধ করিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ধর্মের আদর্শকে বিকৃত করেছেন।

এর সম্বন্ধে উল্লেখ করেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ

"প্রতিটি জাতির তার নিজস্ব বিশিষ্ট কর্মধারা আছে। কেউ কেউ রাজনীতির মাধ্যমে কর্ম সম্পন্ন করে, কেউ কেউ করে সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে আবার কেউ কেউ অন্য পথে। আমাদের বেলায় ধর্মই একমাত্র ভূমি যার উপর দিয়ে আমরা অগ্রসর হতে পারি। ইংরেজরা রাজনীতির মাধমেই ধর্মজ্ঞান লাভ করে, আমেরিকার অধিবাসী সম্ভবত সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে ধর্মজ্ঞান লাভ করে। কিন্তু হিন্দুরা এমনকি রাজনীতিও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যদি তা ধর্মের মাধ্যমে আসে। সেইটাই হোলো মূল বস্তু অন্য সকলই জাতীয় জীবন-সংগীতের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। এবং সেইটিই বিপদের মধ্যে পড়েছিল। এমন সম্ভাবনা দেখা দিল যে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের মূল বস্তুটির পরিবর্তন করতে চলেছি, যেন আমরা আমাদের অস্তিত্বের বুনিয়াদকেই পরিবর্তন করতে চলেছিলাম; যেন আমরা আধ্যাত্মিক বুনিয়াদের পরিবর্তে রাজনৈতিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিলাম। এবং আমরা যদি সেই চেষ্টায় সফল হতাম তাহলে ফল দাঁড়াতো ধ্বংস। কিন্তু তাতো হবার নয়। সেইজন্যই এই শক্তি (শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস) আত্ম-প্রকাশ করলেন।" (কলিকাতাবাসীদের অভিনন্দনের উত্তর)

..."যারা মনে করে হিন্দু ধর্মের এই পুনরুভ্যুত্থান দেশপ্রেমের প্রেরণারই প্রকাশ তারা একেবারেই বিভ্রান্ত।" (মাদ্রাজবাসীদের অভিনন্দনের উত্তর)

একমাত্র এই কারণেই ভগিনী নিবেদিতা যখন বাংলায় বিপ্লববাদীদের নেতৃত্ব করছিলেন তখন রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষ তাঁকে মিশন পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করেন এবং তিনিও সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে মিশনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

৫

তিলক মহারাজও কিছু কম প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। বাল্য বিবাহের পাপ এদেশ থেকে নির্মূল করবার জন্য তদানীন্তন ইংরেজ সরকার যখন বালিকাদের বিবাহিত জীবনে সম্মতি জ্ঞাপনের বয়েস (Age of Consent) বাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব করেন তখন তার বিরুদ্ধে যে প্রবল আন্দোলন হয় তিনি সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁর মতে বাল্য বিবাহের

www.pathagar.com

বিরোধিতা করা মানেই হিন্দু শাস্ত্রের বিরোধিতা করা। প্লেগ মহামারী প্রতিরোধের দরুণ এক সময়ে ইংরেজ সরকার সৈন্যদল নিযুক্ত করে এই দুরন্ত রোগের বীজাণু নির্মূলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু প্লেগ মহামারী প্রতিরোধ করবার জন্য সৈন্যদলের সাহায্য নেওয়া হলে তিলক তার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেন এবং ইংরেজ সৈন্যের উপস্থিতিতে হিন্দুদের গৃহাভ্যন্তর বা দেবমন্দির কলুষিত হবে এই কারণ দেখিয়ে তিনি এই ব্যবস্থায় প্রচন্ড আপত্তি জানান।

'The Arctic Home in the Vedas' এই নামে তিলক একটি পুস্তক রচনা করেন। তাতে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে ভারতীয় আর্যরা বহু সহস্র বৎসর পূর্বে উত্তর মেরু অঞ্চলে বসবাসকারী এক দেবতুল্য জাতি ছিলেন। সেখান থেকে ইয়োরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাঁরাই পৃথিবীকে গৌরবজনক সব কিছু শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সেই দিক থেকে তিলকের মতে, ভারতের হিন্দুরাই সেই আর্যজাতির বংশধর হিসাবে এখনও পৃথিবীকে সর্ববিষয়ে পথ দেখাতে পারে। তাঁর প্রবর্তিত শিবাজী উৎসব, গণেশ মেলা প্রভৃতির দ্বারা তিনি হিন্দুদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের পথ দেখিয়েছিলেন।

তিলক সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ নিজে লিখেছেন—

"সমাজ সংস্কারের নেতা আগারকরের সঙ্গে তিলকের বিচ্ছেদ—তাঁর গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথে রক্ষণশীল এবং ধর্মময় ভারতের বিশ্বস্ত এবং সর্বজনস্বীকৃত নেতা হিসাবে তিনি যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তার রাস্তা খুলে দিয়েছিল। তাঁর এই অবস্থা তিলককে নতুন রাজনৈতিক ভাবধারার সঙ্গে ঐতিহাসিক অতীতের ঐতিহ্য ও মানসিকতার এবং এগুলির সঙ্গে জনগণের অচ্ছেদ্য ধর্মীয় চেতনার মিলন সাধনে সক্ষম হয়েছিল যার বাহ্যিক অবয়ব হচ্ছে এই উৎসবাদি (শিবাজি ও গণপতি উৎসব)। তিলক মহারাষ্ট্রের জন্য যা করেছিলেন স্বদেশী আন্দোলন তারই অনুসরণ করেছিল সারা ভারতে। সর্বসাধারণকে আহ্বান করে নিয়ে আসা, ভবিষ্যতের গৌরবকে অতীতের গৌরবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা, ভারতের রাজনীতিকে ভারতের ধার্মিক উন্মাদনা ও আধ্যাত্মিকতা দিয়ে সঞ্জীবিত করা এইগুলি হচ্ছে ভারতে বিরাট ও সুতীব্র রাজনৈতিক অপরিহার্য্য প্রস্তুতি।" (এ্যাপ্রিসিয়েশন শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, স্পিচেস্ এ্যান্ড রাইটিংস্ অফ বি, জি, তিলক, পৃঃ ৬-৭)

শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য লিখেছিলেন—

"পৃথিবীর মনুষ্য জাতিগুলির মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষের জন্যেই ... এক সমুজ্জ্বল দৈব নির্দেশ যা সমগ্র মনুষ্যজাতির ভবিষ্যতের পক্ষে ... অনিবার্য। সমগ্র বিশ্বের ভবিষ্যৎ ধর্ম বিশ্বাসকে ভারতকেই জন্মদান ক

www.pathagar.com

হবে—যে চিরন্তন ধর্ম বিশ্বাস বর্তমানের সকল ধর্ম বিশ্বাসকে একসূত্রে গেঁথে সমগ্র মানবজাতিকে এককজীবনে পরিণত করবে।"

কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, তিলক বা অরবিন্দ যখন ভারতের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ-এর সঙ্গে ভারতের ধর্মীয় উদ্দীপনা ও আধ্যাত্মিকতাকে যুক্ত করে দেবার প্রচেষ্টা আরম্ভ করলেন এবং তাঁদের বহুতর ভক্ত-শিষ্যেরা এই পন্থাকেই ভারতের মুক্তিলাভের গৌরবজনক পথ বলে স্বীকার ও প্রচার করলেন, তখন ভারতীয় ধর্মীয় উদ্দীপনা ও আধ্যাত্মিকতার মানে তাঁদের ও তাঁদের ভক্তদের কাছে হিন্দু ধর্মের উদ্দীপনা ও আধ্যাত্মিকতা ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। তিলক, অরবিন্দ বা তাঁদের ভক্তদের কাছে এই union of the new political spirit with the tradition and sentiment of the historic past and of both with ineradicable religious temperament of the people ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের আদর্শকে রাজনৈতিক কাঠামোয় রূপান্তরের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের আদর্শকে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টাকে অহিন্দুরা স্বভাবতই বিপজ্জনক না ভেবে থাকতে পারেনি। সেই হেতু হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের আদর্শের এই রাজনৈতিক রূপান্তরকরণের প্রয়াসে ভারতের জাতীয় আন্দোলন প্রথম থেকেই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট হয়ে যায়।

বিপিনচন্দ্র পাল এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের কথা আরও পরিষ্কার করে বললেনঃ

"আমাদের কালে জাতীয় চেতনার ও আশা আকাঙ্ক্ষার নব জাগরণ প্রাচীন কালের শাক্ত ধর্মের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, ভবানী এবং প্রাচীন শক্তি উপাসকের কল্পিত মূর্তি ও অবয়বগুলি এক নূতন রূপে দেখা দিল। এই সকল প্রাচীন ও সনাতন দেবদেবীগণ—যাঁরা আধুনিক মানুষের মনের উপর সকল রকম প্রভাব হারিয়ে ফেলেছিলেন—তাঁরা দেশবাসীর চিন্তায় ও আত্মায় এক নূতন ঐতিহাসিক ও জাতীয়তাবোধক ব্যাখ্যা নিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক আজ দেশকে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী বলে পূজা করছেন। এইগুলি আর শুধু পৌরাণিক অলীক সৃষ্টিমাত্র নয় বা কাল্পনিক জীবমাত্র নয় এমনকি রাজনৈতিক আদর্শের চিত্রও নয়। এঁরা সেই মাতৃরূপের বিভিন্ন বিকাশ। ভারতের আত্মাই হচ্ছেন এই মাতৃদেবী। আমাদের এই যে ভৌগলিক বাসস্থল সেটি এই মাতৃদেবীরই বহিরঙ্গ। যে মাটির উপর পা দিয়ে আমরা চলি সেটি একটি ভৌগলিক সৃষ্টিমাত্র নয়। এটি হচ্ছে মাতৃদেবীর বাইরের স্থূলরূপ। এই স্থূল ও ভৌগলিক বস্তুর পিছনে রয়েছে একটি

www.pathagar.com

সত্তা, একটি ব্যক্তিসত্তা—মাতৃদেবীর ব্যক্তিসত্তা। আমাদের ইতিহাস হচ্ছে স্বয়ং এই মাতৃদেবীর জীবনীগ্রন্থ। আমাদের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ মাতৃদেবীর মানসিক ভাবের বিভিন্ন প্রকাশ। আমাদের শিল্প, কলা, আমাদের কাব্য, আমাদের চিত্রশিল্প, আমাদের সংগীত, আমাদের নাট্যকলা, আমাদের ভাস্কর্য, আমাদের স্থাপত্য এ-সবই ঐ মাতৃদেবীর অনুভূতির বিভিন্ন অবস্থা ও অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।

"আমাদের এই মাতৃসাধনা কোনমতেই রাজনৈতিক সাধনা নয়। যে রাজনৈতিক প্রচারের সঙ্গে বন্দে মাতরম বা মাতৃস্তুতির মন্ত্রকে সংযুক্ত করা হয়েছে সেটি প্রকৃত মাতৃসাধনা বা মাতৃভূমি সাধনার বস্তুগত অংগ কোনোমতেই নয়। এই সংযুক্তি সম্পূর্ণভাবে আকস্মিক। এবং এই রাজনৈতিক প্রচার যার জন্য অনেকাংশে দায়ী যদিও তা খুবই সীমিত এবং আংশিক। সেইসকল অপবিত্র অত্যুগ্রতার সংগে এই মাতৃসাধনা কোনো প্রকারে সংশ্লিষ্ট নয়। যে প্রকারের দেশপ্রেম এই সকল অত্যুগ্রতার পিছনে কাজ করছে তা কোনোমতেই হিন্দু বা ভারতীয় নয় বরং এটা বিশেষভাবে বিদেশী ভাবধারা ও আদর্শের অনুকৃতি যার উদ্ভব হয়েছে বিদেশের ইতিহাসের তুলনামূলক, বিচারহীন ও সমালোচনাহীন পাঠক্রমের মাধ্যমে। যথার্থ মাতৃসাধনা আমাদের সাধারণ আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির অংগবিশেষ। সেটি হচ্ছে আমাদের সমাজের যৌথ জীবন ও কার্যাবলীর আদর্শবাদে ও আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণ। এটা আমাদের জাতি চরিত্রের এবং জাতীয় সংগঠনের সর্বোচ্চ বিকাশ। মানবজাতি সম্বন্ধে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধারণার সংগে এটি অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধযুক্ত।" (সোল অফ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১৫৫-২৬১)

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর এই লেখায় বিপ্লববাদীদের সন্ত্রাসমূলক কার্যাবলীর সংগে তাঁর প্রচারিত হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তিতে রচিত জাতীয়তাবাদের সম্পর্কহীনতার উল্লেখ করেছেন বটে কিন্তু তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল যে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আদর্শপ্রচার করেছিলেন বিপ্লববাদীরা সেই আদর্শকেই কার্যে পরিণত করবার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র।

ধর্মের সংগে জাতীয়তাবাদের সংমিশ্রণ হিন্দুদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে বহু যুগ থেকে। জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্য বহু যুগ থেকে হিন্দুমানসের একটি প্রধান অংগ বলে বিবেচিত হয়েছে। তথাকথিত আর্যরা যখন প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ভারতের শান্তিপ্রিয় কৃষিভিত্তিক অধিবাসীদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করেন তখন তাঁরা একটি যাযাবর জাতি ছিলেন। তাঁদের এই যাযাবরত্ব যাতে ঘুচতে পারে তাই ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তাঁরা যখন ভারতে স্থায়ী বসবাসের অভিলাষ করেন তখন তাঁদের প্রচলিত ধর্ম ও দর্শনের আদর্শের সংগে বাসভূমির প্রতি আনুগত্যের আদর্শকে মিশিয়ে

www.pathagar.com

না দিলে তাঁদের যাযাবরত্ব ঘোচানো সম্ভব ছিল না। তাই প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই হিন্দু সমাজ-দর্শন জন্মভূমির প্রতি আনুগত্যকে ধর্মের একটা অংগ বলে ধরে নিয়েছে।

লেওনার্ড শিফ বলেছেনঃ

"খুব সম্ভবত শিণ্টো ধর্মমতকে বাদ দিলে হিন্দু ধর্মের মত আর কোনো ধর্মবিশ্বাস তার উৎসদেশের সংগে এত ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বদ্ধ নয়। অন্য ধর্মমতে উৎসভূমিকে তীর্থক্ষেত্র মনে করা হয় কিন্তু হিন্দুর কাছে দেশের মাটির এক বিশেষ শক্তি আছে। সেইজন্য মনুর নির্দেশে দ্বিজত্বের জাতি-গুলির পক্ষে স্বদেশ পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হিন্দু সংস্কৃতিতে দেশজ ভূমিকে পবিত্র ক'রে নিয়ে তাকে বাসের যোগ্য করা হয়। আর্য সংস্কৃতির ভৌগলিক বিস্তৃতির সংগে সংগে এই ধারণাও ব্যাপকতা লাভ করে এবং পরে সমগ্র মহাদেশে তা গৃহীত হয়।" (দ্য প্রেজেণ্ট কন্‌ডিশন অফ ইণ্ডিয়া, ১৯৩৯-এ প্রকাশিত, লিওনার্ড এম শিফ, পৃঃ ১৬২-৩)

আবার হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের আদর্শকে এক মহত্তর রূপে ইংরেজী শিক্ষা ও আদর্শে নবদীক্ষিত ভারতীয়দের মনে প্রকট করে তোলার কাজে ভারতে প্রথম আগত ইংরেজরাও কম দায়ী ছিলেন না। মুসলমান রাজত্বের অবসান কল্পে হিন্দুরাই ভারতে ইংরেজদের শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। সেই কারণে ভারতে প্রথম আগত ইংরেজরাও কায়মনোবাক্যে হিন্দুদের ধর্ম, দর্শন ও সমাজতত্বকে নানা প্রকারে সাহায্য করে এগুলির প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সক্রিয় সাহায্যে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ইংরেজীতে অনুদিত হয়। বহু ইংরেজী পণ্ডিত ভারতে এসে হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে গবেষণায় সক্রিয় সাহায্য দেন, যাঁদের আনুকূল্যে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। বলা বাহুল্য, কিছু জার্মান ও ফরাসী পণ্ডিতও গবেষণার তাগিদে হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের হিন্দু-প্রীতি নিজেদের রাজ্য-রক্ষার তাগিদেই বেশী প্রকট হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক স্বার্থেই এই সকল ইংরেজ ধুরন্ধর হিন্দু ধর্ম ও দর্শন নিয়ে নানারকম গবেষণায় সাহায্য করতেন ও হিন্দুধর্মকে এক মহনীয় অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন।

রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ধর্ম নিয়ে ইংরেজদের এই ব্যবসাদারীর উল্লেখ করে কার্ল মার্কস লিখেছেনঃ

"সেই বিরাট দস্যু লর্ড ক্লাইভের কথা অনুসরণ করে বলতে গেলে, যখন মামুলি দুর্নীতি তাদের লোভের সংগে তাল রেখে চলতে পারলো না তখন তারা (ইংরেজরা) কি অত্যাচারমূলক অর্থসংগ্রহের পথ গ্রহণ করেনি? এক-

www.pathagar.com

দিকে তারা ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে তাদের ওজর পেশ করছিল—"আমাদের পবিত্র ধর্ম রক্ষার," অন্যদিকে তারাই ভারতে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। উড়িষ্যা ও বাংলার মন্দিরে মন্দিরে ক্রমাগত তীর্থযাত্রীদের নিকট থেকে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে তারাই কি জগন্নাথ মন্দিরে নরহত্যা ও বেশ্যাবৃত্তির ব্যবসা পরিচালনার ভার নিজেরাই গ্রহণ করে নি?" (ফার্স্ট ইণ্ডিয়ান ওয়ার অফ ইনডিপেন্‌ডেন্স ১৮৫৭-৫৯, পৃঃ ৩৭-৮)

একমাত্র শুধু এই কারণেই ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের সময়ে দেশের জনসাধারণ এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি এবং এমন কিছুই করেনি যাতে দেশে ইংরেজ রাজত্বের কোন অপহ্নব ঘটে। এই যুদ্ধ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেশের হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ব্যাপকভাবে দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। ইংরেজরা ভারতে শাসন-যন্ত্রের অধিকারী হবার সংগে সংগে এদেশে যে শোষণ, অত্যাচার ও খলতার রাজত্ব আরম্ভ করেছিলেন তাঁদের সেই হীন ষড়যন্ত্রের অংশীদার হিসাবে যে ভারতীয় সৈন্যরা একদিন ইংরেজের হয়ে নিজের দেশের নিরীহ প্রজাসাধারণের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল সিপাহী যুদ্ধে তারাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করে। এই বিষয়ে কার্ল মার্কস লিখেছেনঃ

"The Indian revolt does not commence with the ryots tortured, dishonoured and stripped naked by the British, but with the Sepoys, clad, fed, patted and fatted and pampered by them." (First Indian War of Independence. P. 91-2.)

"বৃটিশ জাতির দ্বারা অত্যাচারিত, অপমানিত ও উলঙ্গীকৃত রায়তদের পক্ষ থেকে ভারতের বিদ্রোহের সূচনা হয়নি, হয়েছিল সেইসব সিপাইদের দ্বারা যারা ব্রিটিশের হাতে সুসজ্জিত, পোষ্য এবং আদরের সংগে লালিত পালিত হোতো।" (ফার্স্ট ইণ্ডিয়ান ওয়ার অফ ইনডিপেন্‌ডেন্স, পৃঃ ৯১-২)

তিলক, অরবিন্দ প্রভৃতি নেতাদের মধ্যে ভারতীয় রাজনীতিকে ভারতীয় ধর্মীয় চেতনা ও আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পৃক্ত করার এই যে আদর্শ এবং এর পেছনে কাজ করছিল যে ধারণা তার সম্বন্ধে পরিষ্কার করে লিখেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথঃ

"আমাদের ভারতের বর্তমানকালের জাতীয়তাবাদীদের সাধারণ অভিমত হচ্ছে এই যে, আমরা আমাদের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শগুলিতে নিরংকুশভাবে পূর্ণতা লাভ করেছি। আমাদের জন্মের বহু সহস্র বছর আগে সমাজের সকল গঠনমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছিল এবং এখন আমরা আমাদের সকল কর্মশক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সক্ষম। আমাদের বর্তমান অসহায়তার জন্য আমরা কখনও আমাদের সামাজিক অসম্পূর্ণতাকে

www.pathagar.com

দায়ী করার কথা স্বপ্নেও ভাবি না কারণ জাতীয়তাবাদকে আমরা মহামন্ত্র রূপে গ্রহণ করেছি। আমাদের পূর্বসূরীরা তাঁদের শাশ্বত কালের অতি-মানবিক দ্রষ্টাশক্তি দিয়ে ও ভবিষ্যকালের অন্তহীন প্রয়োজনের সকল সুব্যবস্থা করে দেবার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে এই সমাজ ব্যবস্থাকে চিরকালের জন্য ত্রুটিহীন করে দিয়ে গেছেন। আমরা মনে করছি যে সামাজিক দাসত্বের চোরাবালির উপরেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার অলৌকিকতা প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কর্তব্য।" (ন্যাশন্যালিজম, পৃঃ ১২২-৩)

তিলক, অরবিন্দ প্রভৃতি নেতারা যে নতুন রাজনৈতিক ভাবধারার সাথে ঐতিহাসিক অতীতের ঐতিহ্য ও ভাবধারার সংমিশ্রণ-এর আদর্শ প্রচার করেছিলেন স্বভাবতই সেই আদর্শ অতীত ভারতের হিন্দুধর্ম ও দর্শনের ঐতিহ্যমণ্ডিত ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে, এই আদর্শ তিলকও অরবিন্দ প্রভৃতি নেতারা প্রচার করেছিলেন একমাত্র এই কারণেই যে সে আদর্শ ছিল চিরকালের জন্য ত্রুটিহীন। প্রথমত, এই আদর্শে হিন্দু ধর্মের ও দর্শনের পটভূমিকাকে টেনে আনা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, প্রচার করা হয়েছিল যে এই আদর্শই ভারতের মুক্তি সাধনার পথে মহত্তম আদর্শ।

হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের এই যে আদর্শ যা চিরকালের জন্য ত্রুটিহীন সে সম্বন্ধে একটু বিচার করা দরকার।

মহাভারত হিন্দুদের ধর্মীয়, দার্শনিক ও সামাজিক জীবনে এক অভূত-পূর্ব প্রভাব নিয়ে আজ পর্যন্ত বিরাজমান। এই মহাকাব্যে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের উপাখ্যানের ভেতর দিয়ে ধর্মের জয় ও অধর্মের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের প্রাক্কালেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ বাণী দান করেছিলেন যা শ্রীমদ্ভাগবতগীতা নাম নিয়ে আজ পর্যন্ত হিন্দুদের ধর্ম-দর্শনের উৎকর্ষতার প্রমাণ হয়ে আছে। তিলক, অরবিন্দ এবং তাঁদের ভক্ত বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবীরা এই গীতাপাঠ ও আলোচনাকে তাঁদের আন্দোলনের বিশেষ অংগে পরিণত করেছিলেন।

কিন্তু এই মহাভারতে এমন কিছু কিছু উপদেশ-বাণী দেওয়া আছে যা পড়লে নিতান্ত নির্লজ্জ বিবেকহীন ব্যক্তিও লজ্জিত হবেন। মহাভারতের উপদেশাবলীর এই আপাত-বিরোধিতা নিয়ে অবশ্য তিলক অরবিন্দ প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতেরা কখনও মাথা ঘামান নি। তবু মহামহোপাধ্যায় ডঃ পাণ্ডুরঙ বামন কাণে তাঁর বিখ্যাত 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস' বইতে বলেছেনঃ

"যদিও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পুঁথিগতভাবে ধর্মপথ গ্রহণের কথাই বলেছে তথাপি আমরা এই ঘটনার প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন রাখতে পারি না যে মহাভারত এবং কৌটিল্য শাস্ত্র উভয়েই বহু স্থানে এমন সব নীতি

www.pathagar.com

অবলম্বনকে সমর্থন করেছে যেগুলি ন্যায় ও নৈতিক বিচারের সকল নিয়ম থেকে বিচ্যুত।"

"আদি পর্বের ১৪০ সূত্রে আমরা ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী বলে খ্যাত কনিকার দ্বারা কিছু স্বীকৃতি পেয়েছি যিনি ছিলেন রাজ শাস্ত্রে (রাষ্ট্র বিজ্ঞানে) একজন একনিষ্ঠ সুধী। সেগুলি শান্তি পর্বের ১৪০ সূত্রের বক্তব্যের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়, যেখানে শাসক যখন দুঃসময়ে পতিত হবেন তখন তিনি কোন নীতির পথ অবলম্বন করবেন সে সম্বন্ধে ভীষ্ম নির্দেশ দিচ্ছেন যে, সেই দুঃসময়ে তিনি সকল প্রকার দয়া প্রদর্শন একেবারে চিন্তার মধ্যে আনবেন না। সমগ্র অধ্যায়টি ম্যাকিয়াভেলীসুলভ নীতি নির্দেশে পূর্ণ।" (হিষ্টরি অফ দি ধর্ম শাস্ত্র, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৫)

মহামহোপাধ্যায় ডঃ কাণে মহাভারতের যে-সকল নীতি-বিগর্হিত উপদেশাবলীর কথা তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন সেগুলি নিম্নরূপ—

"যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে ও মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সেই স্থানে সত্য কথা না কহিয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য।...বিবাহ ও প্রাণসংশয়-কালে মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ করা দোষাবহ হয় না। অন্যের অর্থের রক্ষা, ধর্মবৃদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা অকর্তব্য নহে।" (শান্তি পর্ব, ১০৯)

"সমর্থ ব্যক্তির ধর্ম যে-প্রকার বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম সে প্রকার নহে। ধনাগম ব্যতিরেকে তপস্যাদি দ্বারাও ধর্মলাভ হয় বটে কিন্তু অর্থাগম না থাকিলে প্রাণহানির সম্ভাবনা। অতএব অর্থাগম-বিরোধী ধর্ম অবলম্বন করা কর্তব্য নহে।...আপদকালে অধর্মও ধর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে।" (শান্তি পর্ব, ১৩০)।

"অর্থের অসদ্ভাব হইলেই প্রজাপীড়ন করিতে হয়, আপৎকালে প্রজা-পীড়ন না করিলে কোনোক্রমেই অর্থলাভের সম্ভাবনা নাই।...কোষ ও বল রাজার মূল, তন্মধ্যে কোষ আবার বলের মূল, বল সকল ধর্মের মূল এবং ধর্ম প্রজাগণের মূল। কিন্তু অন্যকে পীড়ন না করিলে কোষ ও বল লাভের সম্ভাবনা নাই সুতরাং আপদ্‌কালে কোষ ও বল লাভার্থ অন্যকে পীড়ন করিলে ভূপালগণকে কদাচ দূষিত হইতে হয় না। লোকে যাগযজ্ঞ সম্পাদনার্থ অকার্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুতরাং রাজা যখন শুভ কার্যের অনুষ্ঠান করিবেন বলিয়া অন্যকে পীড়ন করেন, তখন তাঁহাকে কি নিমিত্ত দূষিত হইতে হইবে?" (শান্তি পর্ব, ১৩০)।

"বল ও ধর্ম এ উভয়ের মধ্যে বলই শ্রেষ্ঠ। বল হইতে ধর্ম সম্ভূত হয়। ধূম যেমন সমীরণ আশ্রয় করিয়া উড্ডীন এবং লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে তদ্রূপ ধর্ম বলবান ব্যক্তিকে অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করে।

www.pathagar.com

বলবান পুরুষদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। তাহাদিগের সকল কার্যই সৎকার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।" (শান্তি পর্ব, ১৩৪)।

"স্বদেশ ব্যাধি বা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইলে তথা হইতে পলায়নপূর্বক অন্যদেশে গমন এবং জনসমাজে সম্মানেত হইয়া তথায় অবস্থান করা সকলেরই কর্তব্য।...যেদেশে সুখে জীবিকানির্বাহ হয় তাহাকেই দেশ এবং যে রাজা প্রজাগণের প্রতি বল প্রকাশ বা তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন না করেন ও দরিদ্র-দিগকে প্রতিপালন করেন, তাঁহাকেই রাজা বলিয়া কীর্তন করা যাইতে পারে।" (শান্তি পর্ব, ১৩৯)

"হৃদয়কে ক্ষুরের ন্যায় করিয়া বাক্যে বিনয় প্রদর্শন এবং কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া মৃদুভাবে লোকের সহিত সম্ভাষণ করিবে।...তপস্বীর ন্যায় কাষায় বস্ত্র পরিধান, জটাজিন ধারণ ও মৌনাবলম্বনপূর্বক শত্রুর বিশ্বাসোৎপাদন করিয়া বৃকের ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করিবে। পুত্র, ভ্রাতা, পিতা বা সুহৃৎ যে কেহ হউক না কেন অর্থের বিঘ্নানুষ্ঠান করিলেই অবিচারিতচিত্তে তাহার শাসন করা কর্তব্য।...কাহাকে প্রহার করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে। লোককে প্রহার করিয়াও তাহাকে প্রিয়বাক্যে সান্ত্বনা করা উচিত। লোকের শিরচ্ছেদন করিয়াও তাহার নিমিত্ত রোদন ও শোকপ্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কার্য।" (শান্তি পর্ব, ১৪০)

"আপদকালে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও সাধুব্যক্তির গৌরবের কিছু-মাত্র ত্রুটি হয় না। আর শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে আপদ্‌কালে ব্রাহ্মণ প্রাণরক্ষার্থ চৌর্যবৃত্তিও অবলম্বন করিবেন।" (শান্তি পর্ব, ১৪১)

মহামহোপাধ্যায় ডঃ কাণে বলেছেনঃ

"কৌটিল্য ১-১৭ সূত্রে ভরদ্বাজকে উদ্ধৃত করে বলেছেন যে কর্কটরা যেমন পিতৃ মাতৃ ভক্ষণে অভ্যস্ত, রাজতনয়রাও সেই চরিত্রের; পিতার প্রতি যখন তাদের কোনো ভালবাসা অবশিষ্ট থাকে না তখন তাদের গোপনে সংহার করাই শ্রেয়। বিশালাক্ষ্য অনুমোদন দিয়েছেন যে তাদের কোনো একটি বিশেষ স্থানে বন্দী ক'রে রাখা উচিৎ। বাতব্যাধী বলেছেন যে, রাজপুত্রদের ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি অধিকতর আসক্ত ক'রে দেওয়া উচিৎ (যাতে তারা কোনো সৎকার্য করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে)।

কৌটিল্যের ৫-৬ সূত্রে (ভি-৬) ভরদ্বাজকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, নৃপতি যখন মৃত্যুশয্যায় তখন মন্ত্রীর কাজ হবে রাজার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে প্রধান প্রধান রাজপুত্রদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া যাতে যে কেউ প্রথম আক্রমণকারী হবে তার বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে তাকে হত্যার ব্যবস্থা করা কিংবা গোপনে ঐ সকল আত্মীয় স্বজন ও প্রধান

www.pathagar.com

রাজপুত্রদের শাস্তিদান পূর্বক বশীভূত করে মন্ত্রী নিজেই রাজ্যটি করায়ত্ত করবে।"

"১.১৮ সূত্রে কৌটিল্য এই উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত নয় যে শাসক নৃপতি কোনো পরিত্যক্ত নৃপতিপুত্রকে গোপন দূতের মাধ্যমে অস্ত্রাদি দ্বারা অথবা বিষ প্রয়োগে হত্যা করিবেন।" (হিস্টরি অব দি ধর্ম শাস্ত্র, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১০-১৩)

আর্যজাতি হিসাবে কোনো জাতি পৃথিবীর কোথাও কখনও ছিল না বা অবস্থান করে নি। তথাকথিত আর্যজাতি হিসাবে আমরা যাদের নাম দিয়েছি তাঁরা হিটলারের তথাকথিত মহত্তম আর্যজাতির মত এক কাল্পনিক জাতি। যাই হোক, এই তথাকথিত আর্যজাতি যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তাঁরা আক্রমণকারী হিসাবে এদেশে এসেছিলেন। ভারতের শান্তিপ্রিয় আদিম অধিবাসীদের তাঁরা আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেন। তথাকথিত আর্যরা ভারত আক্রমণ করে যখন ভারতের নিরীহ শান্তিপ্রিয় জীবনে ধ্বংসের আগুন জ্বালিয়ে দেন তখন ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা আর্য সামাজিক-ব্যবস্থা মেনে নেন তাঁদের নাম হয় দাসজাতি ও যাঁরা আর্য সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করেন তাঁদের বলা হয় দস্যুজাতি। ভারতের এই আদিম অধিবাসীদের অর্থাৎ দাস ও দস্যুদের বিরুদ্ধে আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া আছে ঋগ্বেদ ও অথর্ব বেদের পাতায় পাতায়। দাসজাতিকে শৃঙ্খলিত করে তাঁদের স্বাধীনতা অপহরণ করেছেন বলে আর্য দেবতা ইন্দ্রের স্তুতিগান করা হয়েছে ঋগ্বেদের ২য় ১২.৪; ৫ম ৩৪.৬ এবং ২য় ১৩.৮ প্রভৃতি শ্লোকে। ইন্দ্রর কাছে বার বার প্রার্থনা করা হয়েছে যাতে তিনি দাসজাতির ধ্বংসসাধন করতে পারেন। নির্মম নিষ্ঠুরতা দিয়ে ইন্দ্র যাতে দস্যুজাতির ধ্বংসসাধন করে আর্যজাতির শ্রীবৃদ্ধি করেন তার প্রার্থনা আছে ঋগ্বেদের ৩য়. ৩৪. ৯ এবং অথর্ব বেদের ২০শ ২. ৯ শ্লোকে। এই সকল নিরীহ শান্তিপ্রিয় আদিম অধিবাসীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা ঋগ্বেদের অন্ততঃ বারোটি শ্লোকে খুব গৌরবের কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর্য সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বরং তার বিরোধীতা করার জন্য দস্যুজাতিকে ঘৃণ্যরূপে চিত্রিত করা হয়েছে এবং আর্যদের যজ্ঞাদিতে দস্যুজাতির লোককে যজ্ঞবলি হিসাবে দান করবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই ভাবে নরমেধ যজ্ঞ আর্যদের ধর্মীয় ব্রত উদ্‌যাপনের একটি স্বীকৃত হয়ে দাঁড়ায়। নরমেধ যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ বা তাঁর সন্তোষ বিধান। পৃথিবীতে মানব জাতির ইতিহাসে একমাত্র আর্যরাই নরমেধ যজ্ঞে নরহত্যা করে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মরক্ষার নামে নরহত্যা বহু হয়েছে কিন্তু ধর্মসাধনের জন্য নরহত্যা একমাত্র আর্যরাই প্রচলিত করেছিলেন।

www.pathagar.com

তথাকথিত আর্যদের এই নরমেধ যজ্ঞ এমন কি মহামতি বুদ্ধের সময়েও প্রচলিত ছিল। বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবস্তুতেই কোশলের হিন্দু রাজা বিরুধক ৯৯৯,০০,০০০ নিরীহ শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীকে হত্যা করেন। (On Yuang Chwang's travels in India, Thomas Watters, Vol. II পৃঃ ৯ দেখুন)। কোশলরাজ বিরুধক কপিলাবস্তু হত্যাযজ্ঞ সমাপন করে কপিলাবাস্তু থেকে ৫০০ বৌদ্ধ যুবতী রমণীকে নিজের আলয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে এর বিরুদ্ধতা করায় কোশলরাজ নৃশংসভাবে এই ৫০০ রমণীকে হত্যা করেন। (On Yuang Chwang's travels in India, Thomas Watters, Vol. I পৃঃ ৩৯৬)।

এই আর্য সভ্যতার সবচেয়ে 'মহৎ' দান হোল ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের বেলায় এক ন্যায়নীতি এবং শূদ্র ও তথাকথিত নীচবর্ণীয়দের বেলায় অন্য ন্যায়-নীতির প্রবর্তন। বিষ্ণু ধর্মশাস্ত্র বলছেন (৫ম. ২)ঃ "ব্রাহ্মণ অপরাধীদের বেলায় দৈহিক শাস্তি দেওয়া চলবে না। তাঁদের নির্বাসন দণ্ড দিলেই চলবে।" কারণ, ১৯শ ২০-২২-এ বলছেনঃ "ঈশ্বর অদৃশ্য দেবতা কিন্তু ব্রাহ্মণই হলেন দৃশ্য দেবতা।" মনুও ৮ম ৩৭৮এ বলছেনঃ "কোন ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণ রমণীকে ধর্ষণ করে তবে তার জরিমানা হবে ১০০০ মুদ্রা কিন্তু যদি সে শূদ্র রমণীকে ধর্ষণ করে তাহলে তার জরিমানা হবে ৫০০ মুদ্রা।" ২য় ১০. ২৭. ১৬-১৭তে আপস্তম্ব বলছেনঃ "শূদ্র যদি নরহত্যা, চুরি, ভূমিগ্রাস এবং এই ধরনের ঘৃণ্য অপরাধ করে তাহলে তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ যদি এই সকল অপরাধ করে তাহলে তার চোখে কাপড় দিয়ে বেঁধে তাকে অন্ধ (কৃত্রিমভাবে) করে রাখা হবে।"

"As a general rule, in the Hindu Law, when a person of the higher caste inflicts injury upon another of a lower, the punishment is less severe than when a person of the lower caste causes injury to that of a superior...Naturally the Brahmans were most advantageously situated while the lot of the Sudras was very hard.... The least attempt on the part of the Sudras to improve their position and claim equality with the white-skinned Aryans was sought to be suppressed with a strong hand. If they injured an Aryan they must be severly punished. But if an Aryan injured them the punishment need not be severe: for, after all, what was the value of a Sudra's

www.pathagar.com

life and property?" (Crime and Punishment in Ancient India, R. P. Dasgupta, pp. 36-37).

"হিন্দু আইনে এইটাই সাধারণ নিয়ম ছিল যে যখন কোন উচ্চজাতির হিন্দু যদি কোন নিম্নজাতির ব্যক্তিকে আঘাত ক'রে আহত করে তখন তার শাস্তি নিম্নজাতির লোক উচ্চজাতির লোককে আহত করার শাস্তির চেয়ে অনেকাংশে কম গুরুতর হবে।...স্বাভাবিক ভাবেই ব্রাহ্মণের অবস্থিতি ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক কিন্তু শূদ্রের ভাগ্য ছিল অতীব কঠোর। শূদ্রদের পক্ষ থেকে তাদের সামাজিক অবস্থানের উন্নতির ও গৌরবর্ণ আর্যজাতির সঙ্গে সমান হবার সামান্যতম প্রচেষ্টাও কঠোর হস্তে দমন করা হতো। তারা যদি কোনো আর্যকে আহত করতো তাহ'লে তাদের কঠোর শাস্তি অবধারিত ছিল। কিন্তু কোনো আর্য যদি তাদের আহত করতো তাহলে কঠোর শাস্তির প্রয়োজনই হতো না কারণ যাই হোক অতীতের ভারতে একটা শূদ্রের জীবনের বা সম্পত্তির কি-ইবা মূল্য ছিল?" (ক্রাইম এন্ড পানিশমেণ্ট ইন্ এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া, আর. পি. দাশগুপ্ত, পৃঃ ৩৬-৩৭)

তথাকথিত শূদ্র জাতির নিকট থেকে এই যে মানবতার সামান্যতম দাবীটুকু কেড়ে নেওয়া তথাকথিত আর্য সভ্যতার এইটাই সবচেয়ে 'গৌরবময়' অবদান। ন্যায়বিচারের সাধারণ মানবিক অধিকারটুকু যে ভারতের বিপুল শূদ্রজাতির নিকট থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র সেই কারণেই বৌদ্ধ রাজাদের পতনের পর থেকেই কেবল পরদেশবাসীর দাসত্বে ভারতকে দিন কাটাতে হয়েছে। আমাদের দেশের বড় বড় পণ্ডিতরা যাই বলুন না কেন কয়েকশত বছরের বৌদ্ধ রাজত্ব ছাড়া, রাজায় রাজায়, জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে, জাতিতে জাতিতে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ ও সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষে সুস্থ, সংহত, প্রগতিশীল সমাজজীবন কখনও গড়ে উঠতে পারেনি। বরং এক প্রতিক্রিয়াশীল সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠলো যেখানে অগণিত শ্রমিক সাধারণের শ্রমের ফল মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের লোক নিরঙ্কুশভাবে বংশানুক্রমে ভোগ করতে পারে। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এদেশে সেই সমাজব্যবস্থা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসলো। কায়িক পরিশ্রমই হয়ে উঠলো অস্পৃশ্যতার চিহ্ন। এই তথাকথিত অস্পৃশ্যদের রক্ত-ওঠা কায়িক পরিশ্রমে মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের লোক একটা ধর্মের নামে ভণ্ডামির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখলেন।

ধর্মের ও বিবেকের প্রতিক্রিয়াশীলতা কি করে ধীরে ধীরে হিন্দুদের সমাজজীবনকে গ্রাস করে ফেললো সে সম্বন্ধে অদ্বিতীয় সংস্কৃত পণ্ডিত অধ্যাপক তেলাঙ্গ লিখেছেনঃ

"তাহলে ভাগবদগীতায় জাতি বিভাগের কথা দু'জায়গায় উল্লেখ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। প্রথম লেখনে উল্লেখ করা হয়েছে যে জাতি বিভাগ নির্ভর করে গুণাবলী ও কর্তব্যাদির উপর। দ্বিতীয় লেখনে গুণগত তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন কর্তব্যের কথা পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পথে বিচরণ করতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে গীতাতে এমন কোনো উল্লেখ নেই যাতে গীতার মতে জাতিবিভাগকে বংশানুক্রমিক বলা যায়। কিন্তু আপস্তম্ব পরিষ্কারভাবে একে তাই বলেছেন। গীতার প্রথম লেখন সম্বন্ধে আপস্তম্বের সূত্রগুলির সঙ্গে গীতার দ্বিতীয় লেখনটির তুলনা করা যাক। গীতার প্রথম লেখনটিই আমার কাছে মনে হয় একটি পূর্বতন যুগকে লক্ষ্য করেই লেখা হয়েছে সামাজিক বা ধর্মীয় অগ্রগতির লক্ষণ ততটা দেখা যায়নি। প্রসঙ্গত গীতায় বলা হয়েছে ব্রাহ্মণের কর্তব্যকর্ম হচ্ছে প্রশান্তি, আত্মসংযম ইত্যাদি।

"কিন্তু আপস্তম্ব সূত্রে এগুলি হচ্ছে সেই ছয়টি প্রসিদ্ধ কর্তব্য কাজ। যথা—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজ্ঞ উৎপালন, অন্যের যজ্ঞে পৌরহিত্য, দান করণ, দান গ্রহণ এবং আরও তিনটি; যথা—সম্পত্তির উত্তরাধিকার, সম্পত্তি দখল এবং শস্য সংগ্রহ করা, বলা যেতে পারে যেগুলির উল্লেখ মনুতে নেই।' আমার মতে প্রথমোক্ত কর্তব্যগুলি সেই-যুগের দিকে দৃষ্টি নির্দেশ করে যখন যে সকল গুণাবলী পুরাকালে ব্রাহ্মণকে হিন্দু সমাজের শীর্ষে এনে দিয়েছিল তখনও সেগুলি বাস্তবজগতে বিদ্যমান। লক্ষ্য করতে হবে কর্তব্যকর্মের ওই সূচীর মধ্যে এমন কিছু নেই যা জাতিগত বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে আবশ্যকীয় বা স্বাভাবিকভাবে সম্পর্কিত। বিধি অনুসারে এই কর্তব্যকর্মগুলিকে কর্তব্য হিসাবেই ধরা হয়েছে। ওদিকে আপস্তম্বের লেখায় বৈপরীত্যের সঙ্গে দুই বিষয়েই আমরা শেষের মানসিকতার প্রতি নৈকট্য লক্ষ্য করি।

"যেখানে আমরা নৈতিক ও ধর্মীয় গুণাবলীর কোনো উল্লেখ পাই না, শুধু অনুষ্ঠানাদি ও ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করতে হবে। কর্তব্য কর্মের শিরোনামে শুধুমাত্র করণীয় কাজের কথা নেই। আছে অধিকারের কথা। দান গ্রহণের কর্তব্য এখন অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং একইভাবে অধ্যাপনা ও অন্যের যজ্ঞাদিতে পৌরহিত্যের বেলাতেও। কারণ আমরা শুধু পরের যুগের ঘটনাবলী থেকেই তা জানি না পরন্তু মনু ও আপস্তম্ব কৃত একদিকে ব্রাহ্মণের কর্তব্যাদির সঙ্গে অন্যদিকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্তব্যাদির তুলনামূলক আলোচনাতেও তা জানতে পারি।

"আপস্তম্বের বিধি সেই সময়কার মনে হয় যখন ব্রাহ্মণেরা অনেকদিন যাবৎ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সেই সকল মূল্যবান অধিকার নিজেদের বলে জাহির করছেন যা তাঁরা পরবর্তী যুগে সর্বদাই দাবি করতেন। ওদিকে গীতার বচন কিন্তু এই যুগের বহু আগের যুগের প্রতি উল্লেখ করছে যখন

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণেরা তাদের নৈতিক ও চিন্তাশীলতার গুণাবলী দিয়ে হিন্দু সমাজে সেই সু-উচ্চ মর্যাদার ভিত্তি তৈরী করেছিলেন যা দিয়ে তাঁরা পরবর্তী যুগে অন্যান্য সকল জাতির উপরে প্রভুত্ব করতে সক্ষম হতেন। এই বক্তব্যগুলি মোটামুটি অন্যান্য জাতিগুলির বেলায় প্রযোজ্য বিধি-নিয়মাদি সম্বন্ধেও খাটে। এ ব্যাপারেও গীতা চারিত্রিক গুণাবলীর উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছে, যেমন ক্ষত্রিয়শক্তির নিযুক্তির বিষয়ে, কিন্তু আপস্তম্বের বিধিতে ব্রাহ্মণদের শক্তি-শালী প্রভাব প্রতিপত্তির কথাই উল্লিখিত আছে। কারণ যেমন আমি পূর্বেই বলেছি, অন্যের যজ্ঞাদিতে পৌরহিত্য, অপরকে শিক্ষাদান এবং দান গ্রহণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের বেলায় সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের কাছে ব্রাহ্মণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল কারণ উভয়ের উপরেই যজ্ঞাদি ও দানাদির ব্যাপারে অধ্যয়নের দায়িত্ব নির্দিষ্ট হয়েছিল। তাঁর লেখা "হিষ্ট্রী অফ এনসিয়েণ্ট রিলিজিয়ন্স্" বইতে ব্রাহ্মণদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তির কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক টীলে লিখেছেনঃ "প্রথমে রাজপুরুষ এবং অভিজাত শ্রেণীর প্রতি আনুগত্য ও তাদের উপর নির্ভরতার দ্বারা ব্রাহ্মণরা এঁদের অনুকম্পায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং এঁদের নিকট প্রতিভাত করেছিলেন যে তাঁদের (ব্রাহ্মণদের) রক্ষণাবেক্ষণ ও দয়া প্রদর্শন একটি ধর্মমূলক কর্তব্য। ইতিমধ্যে, তাঁরা (ব্রাহ্মণরা) এঁদের কাছে নিজেদের অপরিহার্য করে তোলবার প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন এবং ধীরে ধীরে সার্বজনীন পূজাপার্বনের পৌরহিত্যের এক-চেটিয়া অধিকার অর্জন এবং অধ্যাপনা কার্যের নায়কত্ব অর্জন করেন। (পৃঃ ১২০)।" (ইনট্রোডাক্শন টু দি ভাগবত গীতা, সেক্রেড বুক্স্ অফ দি ইষ্ট, পৃঃ ২২-২৩)

অধ্যাপক তেলাঙ্গ আবার বলেছেনঃ

"দেখা যাচ্ছে, আপস্তম্বের যুগের আগে থেকেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরিধেয় বেশভূষা ও উপবীত সম্বন্ধে পৃথক পৃথক নির্দেশ দেওয়া ছিল। অনুগীতায় পার্থক্যের লেশমাত্র ছিল না যেখানে বিদ্যার্থীরা সকলেই একই নামে সম্বোধিত হোতো। এই যে পার্থক্যের সৃষ্টি হোলো তাতে দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় যে পরে সেই আনুষ্ঠানিকতা ও আক্ষরিকতা আরো প্রাধান্য লাভ করলো যার কথা আমরা আগেই বলেছি। এই প্রচেষ্টায় বাহ্যিক নিদর্শনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণকে অন্য জাতিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করবার প্রবণতা দেখা দিল। এবং আমার মনে হয় সেই প্রবণতা দেখা দিল তখন, যখন ব্রাহ্মণজাতির যে সকল কৃতিত্ব পূর্বকালে তাকে হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানে এনে দিয়েছিল সেগুলি আর বাস্তব জগতে বিদ্যমান ছিল না এবং জাতি বিভাগের ব্যবস্থাটি ক্রমে পরবর্তীকালের জাতির অধঃপতিত প্রতিনিধিদের

www.pathagar.com

যোগ্যতা ও কার্যাবলীর উপরে নয়, বলতে গেলে অতীতের মহৎ জাতির স্রষ্টাদের যোগ্যতা ও কার্যাবলীর ভিত্তিতে নিজেকে জাহির করতে সচেষ্ট হলো।" (ইনট্রোডাকশন টু দি অনুগীতা, সেক্রেড বুকস্ অফ দি ইস্ট, পৃঃ ২১৭)

তথাকথিত আর্য ও তথাকথিত অনার্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতের বুকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে মহান বিশ্বজনীন ধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল অধঃপতিত প্রতিনিধিরা (degenerating representatives) নিজেদের স্বার্থে ও লোভের বশে সেই মহান বিশ্বজনীন আদর্শকে ধীরে ধীরে বিকৃত, সংকীর্ণ ও বিদ্বেষপূর্ণ করে তুলেছিলেন। মহামতি বুদ্ধই সর্বপ্রথম ভারতের এই সনাতন মানবিক ধর্মের বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁর মহান বিদ্রোহ দেশে কিছুদিনের জন্য এক নবযুগের সূচনা করেছিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মের 'অধঃপতিত প্রতিনিধি'দের চক্রান্তে তাঁর বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। এবং তার পরে ভারতে যে তীব্র সামাজিক আলোড়নের সৃষ্টি হয় তাতে হিন্দু ধর্মের এই 'অধঃপতিত প্রতিনিধি'রাই ধীরে ধীরে নিজেদের আদর্শকে সমগ্র দেশের মাটিতে খুব ভালো করে শিকড় গেড়ে বসিয়ে দিতে সক্ষম হন। বুদ্ধের অনেক পরে বাংলায় শ্রীচৈতন্যও খানিকটা এই অধঃপতিত আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনিও সফল হতে পারেন নি।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিলক, অরবিন্দ ও তাঁদের ভক্তেরা যখন দেশে হিন্দুদের পুরাতন ধর্ম ও সমাজ-দর্শনের আদর্শকে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা আরম্ভ করলেন তখন তারা কেউই হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের অধঃপতিত প্রতিনিধিদের আদর্শের নিন্দা করেন নি এবং এমন কি এ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখমাত্র করেননি যেমনটি করেছিলেন বহুযুগ আগে বুদ্ধদেব পরে শ্রীচৈতন্য এবং আধুনিক যুগে রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ এবং এমন কি, স্বামী বিবেকানন্দ। হিন্দুধর্মের এই অধঃপতিত প্রতিনিধিদের আদর্শের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ পরম-হংসও নিজের কাজের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন। কৈবর্তজাতীয়া (মাহিষ্য) রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত কালী-মন্দিরে সে যুগে কোন ব্রাহ্মণ পূজারী কাজ করতে রাজী হতেন না। এমন কি রাণী রাসমনি কৈবর্তজাতীয়া বলে তাঁর ভগবানের মন্দির প্রতিষ্ঠারও অধিকার ছিল না কারণ হিন্দুদের ভগবান শুধু উচ্চবর্ণের লোকেদের দ্বারাই পূজিত হতে পারতেন, তথা-কথিত নীচবর্ণের লোকদের সেই ভগবানকে পূজা করবার অধিকার ছিল না। বাধ্য হয়ে রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ভবতারিণী মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে সেই সম্পত্তি তাঁর ব্রাহ্মণ কুলগুরুর নামে দান করে দেন এবং মন্দির প্রতি-

www.pathagar.com

ষ্ঠিত হবার পর কুলগুরু আবার মন্দির রাণী রাসমণিকে প্রত্যর্পণ করেন। এইভাবে হিন্দু ধর্মের অনুশাসনকে ফাঁকি দিয়ে রাণী রাসমণি ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বটে কিন্তু দেশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভবতারিণীর মন্দির কৈবর্তের মন্দির বলেই খ্যাত ছিল এবং সেই কারণে প্রথমে বহুদিন কোন ব্রাহ্মণ এই মন্দিরে ভবতারিণীর পূজার প্রসাদ গ্রহণ করতেন না। এমন কি কাঙালীরাও কৈবর্তের মন্দিরের ভবতারিণীর অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করতো না। কাজেই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের জগজ্জননী ভবতারিণীর অন্নপ্রসাদ প্রথম প্রথম প্রত্যহ গরুকে খাওয়ানো হোত। প্রথম প্রথম রামকৃষ্ণ পরমহংসও কৈবর্তের মন্দিরে ভবতারিণীর পূজা করে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করতেন না। অন্য জায়গায় নিজের হাতে রান্না করে ভাত খেতেন। যেদিন বাধ্য হয়ে প্রথমে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করতে হয় সেদিন তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর দেবী ভবতারিণীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেনঃ "মা, শেষকালে আমাকে কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি।" (স্বামী সারদানন্দের লেখা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ দেখুন)। কিন্তু দেশাচারের এই জগদ্দল পাথর ভেদ করে রামকৃষ্ণ পরমহংস শেষ পর্যন্ত কৈবর্তের মন্দিরের পূজারী হয়ে থেকে যান। বাল্য-কালে তিনি এক তথাকথিত অস্পৃশ্যা রমণীকে ভিক্ষা-মা হিসাবে নির্বাচন করেও হিন্দু ধর্ম ও সমাজের অধঃপতিত প্রতিনিধিদের আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

হিন্দু ধর্ম ও সমাজের এই অধঃপতিত প্রতিনিধিদের আদর্শ সমগ্র দেশে এক বিকৃত গৌরবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল যাকে আঁকড়ে ধরে যুগে যুগে আমাদের দেশের সমাজপতিরা দেশময় এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করে-ছিলেন যার নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সামাজিক দাসত্বের চোরাবালি (quicksands of social slavery) বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক, অরবিন্দ ও তাঁদের অগণিত ভক্তশিষ্যের দল হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের 'অধঃপতিত প্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ-সম্ভূত বিকৃত গৌরবের ছায়াকেই দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। যদি বলা হয় যে বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক, অরবিন্দ হিন্দু ধর্ম দর্শনের অধঃপতিত প্রতিনিধিদের আদর্শ নয় পরন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিশ্বজনীন হিন্দু ধর্মকেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে-ছিলেন তাহলে আমি বলতে বাধ্য হবো, যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি সত্যকার মহাপুরুষেরা বহুদিন আগেই বিফল হয়েছিলেন দু-পাতা ভালো ইংরেজী লিখে বা দু-একটা ভালো উপন্যাস লিখে তাঁরা সেই আদর্শকে এদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন এভেবে তাঁরা আকাশকুসুমের স্বপ্ন দেখেছিলেন। দেশের সাধারণ রাজনৈতিক বিপ্লবী কর্মীর মনে বা

www.pathagar.com

দেশের সংখ্যাধিক হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনে সেই আদর্শের রূপটি কখনও পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠেনি। তাই বঙ্কিম, তিলক, অরবিন্দের প্রচারণায় দেশের রাজনৈতিক বিপ্লবী কর্মীর দল প্রচলিত হিন্দু ধর্মের সংমিশ্রণে হিন্দু জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করলেন এবং সেই হিন্দু জাতীয়তাবাদকে জয়যুক্ত করবার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত পণ করে চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলেন।

এই হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রবলভাবে এবং সুপরিকল্পিত আকারে প্রকাশ পেল বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে ১৯০৫ সালে। বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতারা ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদের পরিকল্পনা করেন নি। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সীমাবদ্ধ। এবং বঙ্গ-বিভাগ বন্ধ হওয়ায় তখনকার মত ইংরেজ সরকারের অহমিকাতে আঘাত লাগা ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ক্ষতি হয়েছিল মুসলমানদের এবং সেই হেতু ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন নিঃসন্দেহে মুসলমান বিরোধী ছিল।

ভারতের নব-জাগ্রত হিন্দু জাতীয়তাবাদের তাগিদে আমরা মুসলমানদের সুখ সুবিধা লাভালাভের প্রশ্নে অন্ধ হয়ে উঠলাম। মুখে যতই হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা ঘোষণা করি না কেন, রাজনৈতিক দিক দিয়ে মুসলমানদের জন্য কিছু করা হচ্ছে দেখলেই আমরা হিন্দুরা তাতে বাধা দিয়েছি। পূর্ববাংলা মুসলমান প্রধান প্রদেশে রূপান্তরিত হলে সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি ইত্যাদিতে হিন্দুদের কোন হাত থাকবে না, বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে এইটাই ছিল আমাদের আন্দোলনের প্রধান কারণ।

ডঃ আম্বেদকর লিখেছেনঃ

"The opposition to the partition of Bengal on the part of the Bengali Hindus was due principally to their desire not to allow the Bengali Musalmans to take their place in Eastern Bengal. Little did the Bengali Hindus dream that by opposing partition and at the same time demanding Swaraj they were preparing the way for making the Musalmans the rulers of both Eastern as well as Western Bengal." (Pakistan or Partition of India. p. 110)

"বাঙালী হিন্দুদের বাংলা বিভাগের বিরোধিতার কারণ ছিল এই যে তাঁরা চাইতেন না মুসলমানরা পূর্ব বাঙলায় তাদের যথাযোগ্য স্থান অধিকার করুক। বাঙালী হিন্দুরা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে বাঙলা বিভাগের বিরোধিতা ক'রে এবং সেই সঙ্গে স্বরাজের দাবী ক'রে তাঁরা মুসলমানদের পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় বাঙলার শাসক শ্রেণীতে পরিণত ক'রে

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন।" (পাকিস্তান অর পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১১০)

সিন্ধু প্রদেশেও ঠিক এমনটিই হয়েছিল। ১৯১৫ সালে হিন্দুরা সিন্ধুকে বোম্বাই হতে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন কারণ তখন সিন্ধুদেশে মুসলমান সংখ্যাধিক্যের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ১৯২৯ সালে যখন মুসলমান সংখ্যাধিক্য অবধারিত তখন হিন্দুরা সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে বিচ্ছিন্ন করার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের সাফল্য সাধারণভাবে মুসলমানদের মনকে যে পীড়িত করেছিল একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। হিন্দু জনসাধারণের প্রবল আন্দোলনে বঙ্গ-বিভাগ রদ হওয়ার সম্ভাবনায় মুসলমানদের মনে যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল তারই ফলে কিছু অবাঙালী মুসলমানের প্রচেষ্টায় বাংলায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। অবশ্য, কিছু পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমান বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন কিন্তু তার কারণ ছিল এই যে, বঙ্গ বিভাগ হলে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু হিসাবে তাঁরা হিন্দুদের দয়ার পাত্র হয়ে পড়ে থাকতেন।

মুসলমানদের এই আশা ভঙ্গের কথা ঘোষণা করে ঢাকার নবাব সলিমুল্লা এক প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলেছিলেনঃ

"পার্টিশান আমাদের নবজাগরণের একটা বৃহৎ সুযোগ এনে দিয়েছিল এবং আমাদের হৃদয়ে এক নতুন জাতীয় জীবনের সাড়া জাগিয়েছিল যা পূর্ব বাঙলায় আমাদের সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর মধ্যে তরঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি আশা করি, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন যদি বলি যে পূর্ব বাঙলার মুসলমানরা বঙ্গ বিভাগকে সমর্থন করেছিল হিন্দুদের বিরুদ্ধে শত্রুতার জন্য বা সরকারী নির্দেশ পালনের জন্য নয়; পরন্তু কারণ আমরা ভেবেছিলাম যে পূর্ব বাঙলার নতুন শাসন ব্যবস্থায় আমাদের আত্মবিকাশের সম্যক সুযোগ দেবে। আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম এই ভেবে যে পূর্ব বাঙলার অধিবাসীরা বিশেষ ক'রে মুসলমান সম্প্রদায় গভীরভাবে উপকৃত হ'বে এমন একটি সহানুভূতি সম্পন্ন শাসন ব্যবস্থায় যার সঙ্গে যোগাযোগ খুব সহজ হয়ে উঠবে এবং যার সময় ও দৃষ্টি উভয়ই এদেরই মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হবে। পূর্ব বাঙলার মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা বলতে গেলে আমাদের ইতিহাসে এই প্রথম আমরা বুঝতে পারলাম যে, ব্রিটিশ জাতির প্রজা হিসাবে আমাদেরও অধিকার এবং মর্যাদা রয়েছে; এবং বিভাগের পূর্বকালে আমরা এতদিন যে এক আধিপত্যকারী সম্প্রদায়ের নিকট দাসসুলভ অধীনতা নিয়ে বাস করছিলাম সেই অবস্থা থেকে মুক্ত হবার জন্যে এখন চাকায় কাঁধ লাগানোটাই একমাত্র প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।" (স্পীচেস এন্ড রাইটিংস্ অফ মহম্মদ আলী)

www.pathagar.com

কিন্তু তখনকার হিন্দু জাতীয়তাবাদী পত্রিকা দি বেঙ্গলী (The Bengalee) নবাব সলিমুল্লার বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করে সম্পাদকীয় লেখেন। তার উত্তরে মৌলানা মহম্মদ আলি নিজের কাগজ কমরেড (Comrade)-এ লিখেছিলেনঃ

"বর্তমান গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃতি অনুসারেই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ বহু-দিন ধরে অবহেলিত হয়েছিল তাদের মধ্যে একটা আশার উদয়ের চিত্র আমরা পেয়েছি। নিজেদের শিক্ষা, ধনশক্তি ও সংখ্যার ব্যবহারে যারা পারদর্শী সেই এক আগ্রাসী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নিকট এই লক্ষ লক্ষ মানুষের অধীনতাকে যদি "কয়েক শতাব্দীর হিন্দু ও মুসলমানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যা বাঙলার গ্রামে গ্রামে প্রতি ঘরে বিদ্যমান" এবং "কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে মাঝে মাঝে সাহায্যের জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট দাঁড়ায়" সেই সম্পর্কের সঙ্গে তৈরী নিরপেক্ষভাবে তুলনা করা হয় তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বাঙালির পতাকার নিচে দৃঢ় ও অনুগতভাবে যারা বহু সংগ্রাম করেছে সেই দৃঢ় ও অনুগত কয়েকজন বিহারের হোতাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আমরা আধ ঘণ্টার জন্য দাঁড় করাতে খুবই ইচ্ছা করি এবং বাংলা ও বিহারের যে সম্পর্ক সম্প্রতি ছিন্ন করা হলো সেই সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাই এবং সেই যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন দেড় শ' বছর ধরে মনমুগ্ধকারী শান্তি ও আনন্দের পর সম্প্রতি ছিন্ন হয়ে গেলো তাদের নিজেদের ভাষায় তার বিবরণী শুনতে চাই।"

ভারত বিভাগের পূর্বক্ষণে ১৯৪৭ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার একদা সভাপতি হুসেন ইমাম লিখেছিলেনঃ

"Bengal's partition was the origin of the terrorists' movement and the whole of Hindu Bengal Eastern as well as Western—protested against Lord Curzon's policy. Thiss agitation had the support of the whole of Hindu India of those days...

"As long as the foreign domination remained, the Western Bengal Hindus wanted to dominate all services and advantages at the cost of the majority people (Muslims) who had no voice in the administration. But as soon as the prospects of a democratic will of the people, for the people, by the people became apparent, the exploiters became nervous and wanted to safeguard themselves by receding to an area where they could have free licence to exploit." (Muslim League. A. B. Rajut)

www.pathagar.com

"বাঙলা বিভাগ হতেই সমগ্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উৎপত্তি হয়েছিল এবং পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাঙলার হিন্দুরাই লর্ড কার্জনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল। এই আন্দোলন সে সময়ে সমগ্র হিন্দু ভারতের সমর্থন লাভ করেছিল".....।

"যতদিন বিদেশী শাসন বিদ্যমান ছিল ততদিন পশ্চিম বাঙলার হিন্দুরাই চাকরী-বাকরী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধায় আধিপত্য করেছে সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে, শাসন ব্যবস্থায় যাদের কোনো প্রকার প্রভাব থাকত না। যখনই জনগণের গণতান্ত্রিক এবং তাদের দ্বারা ও তাদের পক্ষের অভিমত প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিল তখন শোষণকারীরা স্নায়ু দৌর্বল্যে পতিত হোলো। নিজেদের সুরক্ষিত করবার জন্য এমন জায়গায় তারা নিজেদের সরিয়ে নিল যেখানে তাদের শোষণের অবাধ সুযোগ থাকবে।" (মুসলিম লীগ, এ. বি. রাজপুত দেখুন)

বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিম আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে ও মুসলিম জনমত অগ্রাহ্য করে আমরা হিন্দু জাতীয়তাবাদের জয়ধ্বজা তুলে ধরেছিলাম—একথা অস্বীকার করা যাবে না।

অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা সাধারণভাবে মুসলিম-বিরোধী ছিলেন।—আমার এই লেখা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই, অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই এবং তাঁদের ভক্তেরা আমার উপর রুষ্ট হতে পারেন।

আমার প্রতিপাদ্য বক্তব্য এই যে, বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন উপলক্ষ্যেই বাংলাদেশে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের প্রকাশ্য আবির্ভাব ঘটে এবং বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন নিঃসন্দেহে মুসলিম বিরোধী ছিল। সেই হেতু আমি বলতে চাই, অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা সাধারণভাবে মুসলিম বিরোধী ছিলেন কারণ মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি থাকলে তাঁরা মুসলিম জনমতকে উপেক্ষা করতে পারতেন না—যে জনমত নিঃসন্দেহে বঙ্গ বিভাগকে একটা আশীর্বাদরূপে ধরে নিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান মিলনের একটা পৃথিগত অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম না করে তাঁরা যদি পূর্ববঙ্গকে মুসলমান প্রধান প্রদেশে পরিণত হতে দিতেন তাহলে শিক্ষা-দীক্ষা বাণিজ্য-রাজনীতিতে মুসলমানদের আত্মপ্রকাশের পথ অধিকতর সুগম করে দিয়ে তাঁরা মুসলমানদের ঢের বেশী মঙ্গল করতেন।

আমার মতের সমালোচনায় অনেকে হয়ত বলবেনঃ "স্বয়ং বিশ্বকবি বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। আপনি কি বলতে চান তিনিও মুসলমান বিরোধী ছিলেন?"

স্বভাবতঃ এবিষয়ে মনের সন্দেহ দূর করবার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনার উল্লেখ করা!

www.pathagar.com

অগ্নিযুগের বিপ্লব তথা বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাষায় লিখেছিলেনঃ

"...দেশের যে সকল লোক গুপ্তপন্থাকেই রাষ্ট্র হিতসাধনের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাদিগকে গালি দিয়াও কোনো ফল হইবে না এবং তাহাদের ধর্মোপদেশ দিতে গেলেও তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমরা যে যুগে বর্তমান, এযুগে ধর্ম যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিকট প্রকাশ্য-ভাবে কুণ্ঠিত তখন এরূপ ধর্মভ্রংশতার যে দুঃখ তাহা সমস্ত মানুষকেই নানা আকারে বহন করিতেই হইবে ; রাজা ও প্রজা, প্রবল ও দুর্বল, ধনী ও শ্রমী কেহ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না।...

"অধৈর্য বা অজ্ঞানবশত স্বাভাবিক পন্থাকে অবিশ্বাস করিয়া অসামান্য কিছু একটাকে ঘটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি নষ্ট হয়, তখন সকল উপকরণকেই উপকরণ, সকল উপায়কেই উপায় বলিয়া মনে হয়। তখন ছোট ছোট বালকদিগকেও এই উন্মত্ত ইচ্ছার নিকট নির্মম-ভাবে বলি দিতে মনে কোনো দ্বিধা উপস্থিত হয় না। আমরা মহাভারতের সোমক রাজার ন্যায় অসামান্য উপায়ে সিদ্ধিলাভের প্রলোভনে আমাদের অতি সুকুমার ছোট ছেলেটিকেই যজ্ঞের অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া বসিয়াছি—এই নির্বিচার নিষ্ঠুরতার পাপ চিত্রগুপ্তের দৃষ্টি এড়ায় নাই—তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, বালকদের জন্য বেদনায় সমস্ত দেশের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। দুঃখ আরও কত সহ্য করিতে হইবে জানি না।

"দুঃখ সহ্য করা তত কঠিন নহে, কিন্তু দুর্মতিকে সম্বরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। অন্যায়কে অত্যাচারকে একবার যদি কর্মসাধনের সহায় বলিয়া গণ্য করি তবে অন্তঃকরণের বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি চলিয়া যায়, ন্যায় ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্মের স্থিরতা থাকে না, তখন বিশ্বব্যাপী ধর্ম ব্যবস্থার সঙ্গে আবার আমাদের ভ্রষ্ট জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য হইয়া উঠে।

"সেই প্রক্রিয়া কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে চলিতেছে একথা নম্র-হৃদয়ে দুঃখের সহিত আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই আলোচনা আমাদের পক্ষে একান্ত অপ্রিয়, তাই বলিয়া নীরবে ইহাকে গোপন করিয়া অথবা অত্যুক্তি দ্বারা ইহাকে ঢাকা দিয়া অনিষ্টকে সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে দেওয়া আমাদের কাহারও পক্ষে কর্তব্য নহে।

"আমরা সাধ্যমত বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতি সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছু

www.pathagar.com

বলিব এমন আশঙ্কা করিবেন না। বহুদিন পূর্বে আমি যখন লিখিয়াছিলামঃ

নিজ হস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে—
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে—

তখন লর্ড কার্জনের উপর আমাদের রাগ করিবার কোনো কারণই ঘটে নাই এবং বহুকাল পূর্বে যখন স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলাম তখন সময়ের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল।

"তথাপি দেশে বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে স্বদেশী পণ্য প্রচার যত বড় কাজই হউক, লেশমাত্র অন্যায়ের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে হইবে এ কথা আমি কোনো মতেই স্বীকার করিতে পারি না।...কিন্তু হায়, মনে নাকি ভয় আছে যে, এক মুহূর্তের মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টারের কল যদি বন্ধ করিয়া দিতে না পারি তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুঃসাধ্য উদ্দেশ্য অটল নিষ্ঠার সহিত বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই, সেইজন্য এবং কোনমতে হাতে হাতে পার্টিশনের প্রতিশোধ লইবার তাড়নায়, আমরা পথ বিপথ বিচার করিতেই চাই নাই। এইরূপে চারিদিক হইতে সাময়িক তাগিদের বধিরকর কলকলায় বিভ্রান্ত হইয়া নিজের প্রতি বিশ্বাসহীন দুর্বলতায় স্বভাবকে অশ্রদ্ধা করিয়া, শুভ-বুদ্ধিকে অমান্য করিয়া অতিসত্বর লাভ চুকাইয়া লইতে চায় এবং পরে অতি-দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষতির নিকাশ করিতে থাকে; মঙ্গলকে পীড়িত করিয়া মঙ্গল পাইব, স্বাধীনতার মূলে আঘাত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিব, ইহা কখনো হইতেই পারে না, একথা মনে আনিতেও তাহার ইচ্ছা হয় না।

আমরা অনেকে সম্পূর্ণ জানি না এবং অনেকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে, বয়কট ব্যাপারটা অনেক স্থলে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচারের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। আমি যেটাকে ভাল বুঝি, দৃষ্টান্ত ও উপদেশের দ্বারা অন্য সকলকে তাহা বুঝাইবার বিলম্ব যদি না সহে পরের ন্যায্য অধিকারে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করাকে অন্যায় মনে করিবার অভ্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া যাইতে থাকে তবে অসংযমকে কোনো সীমার মধ্যে আর ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কর্তব্যের নামে যখন অকর্তব্য প্রবল হয় তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে। সেই-জন্যই স্বাধীনতা লাভের দোহাই দিয়া আমরা যথার্থ স্বাধীনধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছি, দেশে মতের অনৈক্য ও ইচ্ছার বিরোধকে দন্ড উত্তোলন করিয়া বলপূর্বক একাকার করিয়া দিতে হইবে এইরূপ দুর্মতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমি যাহা করিব সকলকেই তাহা করিতেই হইবে, আমি যাহা

www.pathagar.com

বলিব সকলকেই তাহা বলিতেই হইবে, এইরূপ বলপ্রয়োগে দেশের সমস্ত মত ইচ্ছা ও আচরণ বৈচিত্রের অপঘাত মৃত্যুর দ্বারা পঞ্চত্ব লাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি। মতান্তরকে আমরা সমাজে পীড়ন করিতেছি, কাগজে অতি কুৎসিতভাবে গালি দিতেছি; এমনকি শারীরিক আঘাতের দ্বারাও বিরুদ্ধ মতকে শাসন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছি। আপনারা নিশ্চয় জানেন এবং আমি ততোধিক নিশ্চয়তররূপে জানি, এরূপ বেনামি শাসনপত্র সময়বিশেষে আমাদের দেশের অনেক লোকই পাইয়া থাকেন এবং দেশের প্রধান ব্যক্তিরাও অপমান হইতে রক্ষা পাইতেছেন না। জগতে অনেক মহাপুরুষ বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মত প্রচারের জন্য নিজের প্রাণও বিসর্জন করিয়াছেন, আমরাও মত প্রচার করিতে চাই, কিন্তু আর সকলের দৃষ্টান্ত পরিহার করিয়া একমাত্র কালাপাহাড়কেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছি।" ('পথ ও পাথেয়'—রাজা প্রজা)।

বঙ্গ-ভংগ প্রতিরোধ আন্দোলনের স্বরূপ প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেনঃ

"আমরা পার্টিশন-ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া একদিন দেশকে বিলাতি কাপড় ছাড়াইব ইহাই পণ করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা বড় কথা এবং দূরের কথা আমরা ভাবি নাই।

"যদি জিজ্ঞাসা করো ইহা অপেক্ষা বড় কথাটা কি তবে আমি উত্তর দিব যে, বাংলা দেশকে দুই ভাগ করার দ্বারা যে আশংকার কারণ সেই কারণটাকেই দূর করিবার চেষ্টা করা—রাগ প্রকাশ করা তাহার কাছে গৌণ।

"পার্টিশনে আমাদের প্রধান আশংকার কারণ কী সে কথা আমরা নিজেরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি; এমন কি আমাদের মনে এই ধারণা আছে যে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কর্তৃপক্ষ বাংলাকে পূর্ব ও অ-পূর্ব এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বঙ্গকে ব্যঙ্গ অর্থাৎ বিকলাঙ্গ করিয়াছেন।...

"ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ, বাঙালি হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ঐক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গিয়াছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই; দুইপক্ষে একরকম করিয়া মিলিয়াছিলাম।

"কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড় করিতে চান এবং দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন হিন্দু-মুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

"...ব্যংলাদেশের যে অংশের লোকেরা আপনাদিগকে ব্যঙালি বলিয়া জানে

www.pathagar.com

সে অংশটি খুব বড় নহে ; এবং তাহার মধ্যেও যে ভূভাগ ফলে শস্যে উর্বর, ধনে ধান্যে পূর্ণ যেখানকার অধিবাসীর শরীরে বল আছে, মনে তেজ আছে, ম্যালেরিয়া এবং দুর্ভিক্ষ যাহাদের প্রাণের সার শুষিয়া লয় নাই, সেই অংশটিই মুসলমান প্রধান। সেখানে মুসলমান সংখ্যা বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া চলিয়াছে, হিন্দু বিরল হইয়া পড়িতেছে।

"এমন অবস্থায় এই বাঙালির বাংলাটুকুও এমন করিয়া যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলা দেশের মতো এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও থাকিবে না।

"এমন স্থলে বঙ্গ বিভাগের জন্য আমরা ইংরাজ-রাজের প্রতি যতই রাগ করি না কেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতিবর্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হউক না কেন, তাহার চেয়ে বড় আবশ্যক আমাদের পক্ষে কী ছিল? না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।

"সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমরা বয়কট-ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে-কোন প্রকারেই হোক্, বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশি মাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গ-বিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।

"আমরা ধৈর্য হারাইয়া সাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুবিধা-অসুবিধা বিচার মাত্র না করিয়া বিলাতি লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কার সাধনের কাছে আর কোন ভালোমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না। ক্রমশ লোকের সম্মতিকে জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে হাতে হাতে তাহার কর্মফল দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

"এই উপলক্ষ্যে আমরা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম, সে কথা স্বীকার করিতে আমাদের ভালো লাগে না, কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না।

"তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি। তাহা-দিগকে আমাদের মনের মত কাপড় পরাইতে কতদূর পারিলাম তাহা জানি না, কিন্তু তাহাদের মন খোয়াইলাম। ইংরেজের শত্রুতা সাধনে কতটুকু কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমরা যে, সকল মুসলমান ও নিম্ন-

www.pathagar.com

শ্রেণীর হিন্দুদের অসুবিধা ঘটাইয়া বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছি, একথা সত্য নহে। এমন কি, যাহারা বয়কটের কল্যাণে বিশেষ লাভবান হইয়াছে তাহারাও যে আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছে এমন প্রমাণও আছে। ইহার কারণ, আমরা ইহাদিগকে কাজে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টার পূর্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মন পাই নাই, মন পাইবার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করি নাই, আমাদের প্রতি ইহাদের অবিশ্বাস ও দূরত্ব দূর করি নাই। আমরা ইহাদিগকে নিজের মতে চালাইবার এবং কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ইহাদিগকে কাছে টানি নাই। সেইজন্য সহসা একদিন ইহাদের সুপ্তপ্রায় ঘরের কাছে আসিয়া ইহাদিগকে নাড়া দিতে গিয়া ইহাদের সন্দেহকে বিরোধকেই জাগাইয়া তুলিয়াছি। ইহাদের আত্মীয় করিয়া না তুলিয়াই ইহাদের নিকট হইতে আত্মীয়তা দাবি করিয়াছি। এবং যে উৎপাত আপন লোকে কোনমতে সহ্য করিতে পারে সেই উৎপাতের দ্বারা ইহাদিগকে পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ দূরে ফেলিয়াছি।

"এবারে এতকাল পরে আমাদের বক্তারা ইংরেজি সভার উচ্চ মঞ্চ ছাড়িয়া দেশের সাধারণ লোকের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেশের লোকের মনে একটা প্রশ্ন উদয় হইল—একী ব্যাপার, হঠাৎ আমাদের জন্য বাবুদের এত মাথাব্যথা হইল কেন!

"বস্তুতই তাহাদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা পূর্বেও অত্যন্ত বেশি ছিল না, এখনও এক মুহূর্তে অত্যন্ত বেশি হইয়া উঠে নাই। আমরা এই কথা মনে করিয়া তাহাদের কাছে যাই নাই যে, "দেশী কাপড় পরিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে এইজন্যই আমাদের দিনে আহার নাই এবং রাত্রে নিদ্রার অবকাশ ঘটিতেছে না।" আমরা এই বলিয়াই গিয়াছিলাম যে, "ইংরেজদের জব্দ করিতে চাই, কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না ; অতএব ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তোমাদিগকে দেশী কাপড় পরিতে হইবে।"

"কখনও যাহাদের মঙ্গল চিন্তা ও মঙ্গল চেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনও কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতি স্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সংগে সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।

"সাড়া যখন না পাই তখন রাগ হয়। মনে এই হয় যে, কোনদিন যাহা-দিগকে গ্রাহ্য মাত্র করি নাই আজ তাহাদিগকে এত আদর করিয়াও বশ করিতে পারিলাম না, উল্টা উহাদের গুমর বাড়িয়া যাইতেছে।...

"ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষি-সম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ

www.pathagar.com

করিয়াছিলেন। একথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনোদিন দিই নাই ; অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে বটে কিন্তু ভাই বলিয়া একজন খামকা আসিয়া দাঁড়াইলেই যে অমনি তখনই কেহ তাহাকে ঘরে অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতরো ঘটে না। আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরূক আমাদের ব্যবহারে এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।...

"আমাদের দুর্ভাগ্যই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মতো ধৈর্য আমাদের নাই, আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে দ্রুতবেগে পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি। পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোপা নাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নি প্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ সমস্তই দাস-বৃত্তিকেই অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপায়। কাজ ফাকি দিবার জন্য, পথ বাঁচাইবার জন্য আমরা যখনই এই সকল উপায় অবলম্বন করি তখনই প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কি অমূল্য ধন তাহা আমরা জানি না। আমরা মনে করি আমার মতে সকলকে চালানোই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয় ; অতএব সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়াও সে পথে চলে তবে ভালই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝিয়াও চালাইতে হইবে—অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে, জবরদস্তি।

"বয়কটের জেদে পড়িয়া আমরা এই সকল সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া হিতবুদ্ধির মূলে আঘাত করিয়াছি সন্দেহ নাই। অল্পদিন হইল মফঃস্বল হইতে পত্র পাইয়াছি সেখানকার কোনো একটি বড় বাজারে লোকে নোটিস পাইয়াছে যে, যদি তাহারা বিলাতি জিনিষ পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিসের আমদানি না করে তবে নির্দিষ্ট কালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই বাজারে আগুন লাগিবে, সেই সঙ্গে স্থানীয় ও নিকটবর্তী জমিদারের আমলাদিগকেও প্রাণহানির ভয় দেখানো হইয়াছে।

"এইরূপভাবে নোটিস দিয়া কোথাও কোথাও আগুন লাগানো হইয়াছে। ইতিপূর্বে জোর করিয়া মাল আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং খরিদদারদিগকে বলপূর্বক বিলাতি জিনিস খরিদ করিতে নিরস্ত করা হইয়াছে। ক্রমে এখন সেই উৎসাহ ঘরে আগুন লাগানো এবং মানুষ মারাতে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

www.pathagar.com

"দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ উৎপাৎকে আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন না। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, দেশের হিত সাধনের উপলক্ষ্যে এরূপ উপদ্রপ করা যাইতে পারে।

"ইহাদের নিকট ন্যায়ধর্মের দোহাই পাড়া মিথ্যা। ইঁহারা বলেন, মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য যাহা করা যাইবে তাহা অধর্ম হইতে পারে না। কিন্তু অধর্মের দ্বারা যে মাতৃভূমির মঙ্গল কখনোই হইবে না সে কথা বিমুখবুদ্ধির কাছেও বার বার বলিতে হইবে।

"জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতি কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না? দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী প্রচারের ব্রত লইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই সকল লোকের বিদ্বেষকে কি চিরস্থায়ী করা হয় না?

"এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না। "যাহারা কখনও বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে, তাহারা আজ কাপড় পরানো বা অন্য কোনো উপলক্ষ্যে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রকাশ করিবে ইহা আমরা সহ্য করিব না"—দেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং নমঃশূদ্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া, এমন কি ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিলাতি সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে।" ('সদুপায়'-সমূহ)।

রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়লে একটা সত্য আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। আমাদের দেশে আমাদের সমাজে সে একটা স্বৈরতান্ত্রিক, ফাসিস্ত মনোবৃত্তি রাজত্ব করে আসছে রবীন্দ্রনাথ তার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন, অগ্নিযুগের বিপ্লব, স্বদেশী আন্দোলন প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণ অনেক বড় বড় ও অনেক গৌরবময় কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন এবং দেশকে ও জাতিকে সেই সকল কাহিনী বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিজেই এর প্রতিবাদ করে গেছেন, তাঁর লেখাগুলি থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

আমাদের সমাজের যে ফ্যাসিস্ত মনোবৃত্তি আমাদের সকল প্রকার বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে তার থেকে সমাজকে মুক্ত করবার কথা বিশেষ কেউ চিন্তা করেন নি। এই ফ্যাসিস্ত মনোবৃত্তি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে প্রথমে যে সমাজ-বিপ্লবের

www.pathagar.com

প্রয়োজন তার কথা কেউ চিন্তাই করেন নি। সমাজের নানান অসংগতি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে না পারলে শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করলেই দেশে সুস্থ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় না—চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ বহু বৎসর আগে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির সেই ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে গিয়েছেন। কিন্তু, হায়, রাজনীতির সুউচ্চ কলরবে এই মহান চিন্তা-নায়কের বাণী সেদিন অশ্রুতই থেকে গেছে। তার ফলে আমাদের দেশ ও সমাজ এক পাপ চক্র থেকে অন্য পাপ চক্রে গিয়ে পড়েছে বারবার, কিন্তু মুক্তির সন্ধান তার কবে মিলবে কে জানে?

বাংলা বিভাগের প্রস্তাব করা হয়েছিল ১৯০৩ থেকে। সেই বছরই মাদ্রাজ কংগ্রেসে সভাপতি লালমোহন ঘোষ বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ করে প্রস্তাব পাশ করিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব পাকাপাকিভাবে ঘোষণা করা হয়। সেইদিন থেকেই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব নিয়ে সারা দেশময় প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে। ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট কলকাতা টাউন-হলে যে প্রতিবাদ সভা হয় তাতে বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেনঃ "On behalf of the people of Bengal I declare that the partition of Bengal is not a settled fact but a settled failure." "বাংলার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি যে বাংলা-বিভাগ একটি সম্পাদিত ঘটনা নয় একটি সম্পাদিত ব্যর্থতা।"

তারপরে ২২শে সেপ্টেম্বর ও ২৯শে সেপ্টেম্বর প্রতিবাদ সভা হয়। ১৬ই অক্টোবর ফেডারেশন হলে প্রতিবাদ সভা হয়। এই সকল প্রতিবাদ সভায় কোনো মুসলমান নেতা বা কর্মী বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের বিপক্ষে বক্তৃতা করেছিলেন বলে কোনো ইতিহাসে উল্লেখ নেই। বাংলা ও ভারতের প্রবল হিন্দু জনমতের কাছে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায় মুসলমানদের মনে যে হতহাশার সৃষ্টি হয়েছিল তারই ফলে মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

একথা সত্য, পশ্চিমবঙ্গে কিছু মুসলমান নেতা বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু তার কারণ ছিল এই যে তাদের ভয় ছিল পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা সংখ্যালঘু হয়ে হিন্দুদের দয়ার উপর পড়ে থাকবেন। তবে পূর্ববঙ্গের প্রায় সকল বিখ্যাত মুসলমান নেতা বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। এই সময়কার স্বদেশী আন্দোলনের কালে বিক্ষুব্ধ মুসলমানেরা ময়মন-সিংহের জামালপুরে ও কলকাতার বড়বাজারে দাঙ্গা বাধিয়েছিলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতি বাংলার সাধারণ মুসলমান যে বিমুখ ছিলেন সে সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে বহুবার

www.pathagar.com

লিখেছেন। তিনি বারবার বলেছেন বাংলার মুসলমান এই বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতি-রোধ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল।

১৯০৭ সালে তিনি লিখেছেনঃ "কিছুকাল হইতে বাংলা দেশের মনটা বঙ্গ বিভাগ উপলক্ষে খুবই একটা নাড়া পাইয়াছে।...আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যিই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন। দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না ইংরেজকে আমরা এত বড় নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব এমন কি কারণ ঘটিয়াছে।

"মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়।...

"হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে, এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোন মতেই নিষ্কৃতি নাই।...

"আর মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

"আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখে সুঃখে মানুষ, তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত যাহা ধর্মবিহিত তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনো মতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।

"আমরা জানি, বাংলা দেশের অনেক স্থলে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমান বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।" (রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৬২৩-৮)।

১৯১১এ লিখছেনঃ

"আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের চেষ্টা যখনই প্রবল হইল, অর্থাৎ যখনই নিজের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চেতনার উদ্রেক হইল তখনই আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের সংগে এক করিয়া লই কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এক করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হইতে পারিত বটে কিন্তু সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে একটা

www.pathagar.com

সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজন সাধনের আগ্রহবশত সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।

"হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না।...

"মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইয়া আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অঙ্ক বেশি হইবে বটে কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশি হইবে কি না মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের একথা বলা অসংগত নহে যে আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড় হইতে পারি তবেই তাহাতে আমাদের লাভ।...

"আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন-সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়।...

"আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারত-বর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদ-মান শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৪-৫)

১৯১৪ সালে লিখছেনঃ "অল্পদিন হইল আমাদের একটা শিক্ষা হইয়া গেছে। যে কারণেই হউক যেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম।

"সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রু গদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদি-বা তাহার সঙ্গে

www.pathagar.com

আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না—সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া আপন বলিয়া মানিতে না পারি—দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্য ভঙ্গী করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারে না।

"হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রী-ভাবে বে-আব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বশে মানুষ মানুষকে ঠেলিয়া রাখে, অপমানও করে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কুস্তির সময়ে কুস্তি-গিরদের গায়ে পরস্পরের পা ঠেকে তাহার হিসাব কেহ জমাইয়া রাখে না, কিন্তু সামাজিকতার স্থলে কথায় কথায় কাহারও গায়ে পা ঠেকাইতে থাকিলে তাহা ভোলা শক্ত হয়। আমরা বিদ্যালয়ে আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি, সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে তাহা মানি, তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে।...

"বঙ্গ-বিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ২৬২)।

১৯২৩ সালে লিখছেনঃ "বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান মেলেনি। কেননা, বাংলার অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গ করার দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব ছিল না। আজ অসহকার (অসহযোগ) আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে তার কারণ রুম-সাম্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গীকরণের দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব। এমনতরো মিলনের উপলক্ষ্যটা কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা সত্যতঃ মিলিনি। আমরা একদল পূর্বমুখ হয়ে অন্যদল পশ্চিমমুখ হয়ে কিছুক্ষণ পাখা ঝাপটিয়েছি।" (ঐ, পৃঃ ৩৫৪)।

১৯২৪এ রবীন্দ্রনাথ লিখছেনঃ "হিন্দু-মুসলমানের মিলন হোক, বাহিরের দিক থেকে এই পরোয়ানা জাহির করা কঠিন নয়। এই উপলক্ষে হিন্দুরা খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিতে পারে কেন না সেরকম যোগ দেওয়া খুবই সহজ। এমন কি নিজেদের আর্থিক সুবিধাও মুসলমানদের জন্য

www.pathagar.com

অনেক পরিমাণে ত্যাগ করতে পারে, সেটা দুরূহ সন্দেহ নেই, তবু এহ 'বাহ্য'। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উদ্দেশে পরস্পরের মনের চিরাগত সংস্কারের পরিবর্তন করা সহজ নয়। সমস্যাটা এইখানেই ঠেকেছে। হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের—স্বরাজ-প্রাপ্তির লোভেও একথাটা ভিতর থেকে উভয়পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না।... ধর্মনিয়মের আদেশ নিয়ে মনের যে সকল অভ্যাস আমাদের অন্তর্নিহিত সেই অভ্যাসের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের দৃঢ়তা আপন সনাতন কেল্লা বেঁধে আছে, খিলাফতের আনুকূল্য বা আর্থিক ত্যাগ স্বীকার সেই অন্দরে গিয়ে পৌঁছয় না।" (ঐ, ২৪শ খণ্ড, পৃ ৪১৭)।

১৯২৫এ লিখছেনঃ "আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলাম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয়নি, বিরুদ্ধ ছিল। জননায়কেরা কেউ কেউ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ওদের একেবারে অস্বীকার করা যাক। জানি ওরা যোগ দেয়নি। কিন্তু কেন দেয়নি। তখন বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে এত প্রবল যোগ হয়েছিল যে সে আশ্চর্য! কিন্তু এতে বড়ো আবেগ শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল, মুসলমান সমাজকে স্পর্শ করল না। সেদিনও আমাদের শিক্ষা হয় নি। পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ডোবাটাকে আমরা সমাজের দোহাই দিয়ে গভীর করে রেখেছি।...

"আমি যখন আমার জমিদারি সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানার এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিগ্গেস করলেম 'এ কেন' তখন জবাব পেলেম, যে-সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। এক তক্তপোষে বসাতেও হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ প্রথা তো অনেকদিন ধরে চলে এসেছে; অনেকদিন মুসলমান এ মেনে এসেছে, হিন্দুও মেনে এসেছে। জাজিম তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম পাতা আসনে অন্যে বসেছে। তারপর ওদের ডেকে একদিন বলেছি, "আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে।" তখন হঠাৎ দেখি অপরপক্ষ লাল টকটকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, আমরা পৃথক। আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়? বাধা ঐ জাজিম-তোলা আসনের বহুদিনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোট নয়। ওখানে অকূল অতল কালাপানি। বক্তৃতামঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না।" (ঐ, পৃঃ ৩৩-৪)।

১৯৩১এও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ "যখন বঙ্গ-বিভাগের সাংঘাতিক

www.pathagar.com

প্রস্তাব নিয়ে বাঙালির চিত্ত বিক্ষুব্ধ তখন বাঙালি অগত্যা বয়কট-নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছিল। বাংলার সেই দুর্দিনের সুযোগে বোম্বাই-মিলওয়ালা নির্মমভাবে তাঁদের মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টাকে প্রতিহত করতে কুণ্ঠিত হন নি। সেই সঙ্গে দেখা গেল বাঙালি মুসলমান সেদিন আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। সেই যুগেই বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানে লজ্জাজনক কুৎসিত কাণ্ডের সূত্রপাত হোল।" (ঐ, পৃঃ ৪৪৭)।

৭

ভারতের মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধেও একটু আলোচনা দরকার। এ বিষয়ে একটা জিনিষ আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সমস্যা কোনদিনই মূলত ধর্মের ব্যাপার নয় বা ছিল না। ভারতবর্ষে সত্যিকারের হিন্দু-মুসলমান যে বিরোধ বহুদিন থেকে চলে এসেছে তা বস্তুতঃ হিন্দুধর্মের সংগে মুসলমান ধর্মের ছিল না।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকালে আমার নিবন্ধে আমি দেখিয়েছিলেম কোরাণের কোন কোন অংশ (যেমন ৪·১ অনুচ্ছেদ) ভাবের এমন কি ভাষার দিক থেকেও হিন্দুদের উপনিষদের বহু অনুচ্ছেদের সংগে মিলে যায়। তেমনি কোরাণের ১০·৫ অনুচ্ছেদে যদিও বিধর্মীদের প্রকারান্তরে ধ্বংস করবার বিধান দেওয়া আছে তবুও কোরাণেই ১০·৬ অনুচ্ছেদে লেখা আছেঃ

"If one amongst the Pagans ask thee for asylum, grant it to him, so that he may hear the word of God and then escort him to where he can be secure. That is because they are men without knowledge."

(বিধর্মীদের মধ্যে কেউ যদি তোমার নিকট আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে তাই দাও যাতে সে ঈশ্বরের বাণী শুনতে পারে এবং তার পর তাকে এমন স্থানে নিয়ে যাও যেখানে সে নিরাপত্তা লাভ করে, তার কারণ তারা জ্ঞান বর্জিত মানুষ।)

অর্থাৎ, কোরাণ বিধর্মীদের ধ্বংস করবার কথাই শুধু বলেন নি তাকে ক্ষমা করবার এবং নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেবার কথাও বলেছে। ভারতবর্ষের সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমানের সম্পর্ক তাই অনেক বিবাদ-বিসন্বাদের মধ্যেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় নি।

মুসলমান রাজত্বে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা--বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা—মুসলমান

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। রাজকার্যে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সহায়তা না পেলে মুসলমান সম্রাটদের শাসনকার্য পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ত। এবং মুসলমান রাজত্বকালে দেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ত। এ বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক আর্ণল্ড টয়ন্‌বী লিখেছেনঃ

"Under all political regimes in India, one of the prerogatives of the Brahmans had been to serve as ministers of state. They had played this part in the Indic world before playing it in an affiliated Hindu society and after the breakdown of the Hindu civilization in the time of the century of the Christian era and the subsequent progressive intrusion of Iranic Muslim invaders found it convenient if not indispensable to follow in this point the practice of the Hindu states which they were supplementing. Brahman ministers and minor officials in the service of Muslim rulers made this alien rule less odious than it would otherwise have been to the Hindu majority of these Indian Muslim princes subjects because the Brahman intermediaries understood how to handle their fellow Hindus and at the same time enjoy a prestige in their eyes which reconciled the rank and file to following the dominant caste's lead in accommodating themselves to an irksome political life." (A Study of History. Vol. VII. P. 200.)

"ভারতের সকল রাজনৈতিক শাসনেই রাজ্যের মন্ত্রী হবার একটা বিশেষ অধিকার ব্রাহ্মণদের ছিল। বিস্তারের আগে হিন্দু জগতে তারা এই অধিকার আদিম ভারতীয় সভ্যতার কালেও এই কাজই করেছে। খৃষ্টীয় যুগের প্রথম শতাব্দীতে হিন্দু সভ্যতার পতনের পর পরবর্তী কালে ক্রমশঃ বিধর্মী ইরানীয় মুসলমান আক্রমণকারীরাও এ বিষয়ে পূর্ববর্তী হিন্দু শাসকদের ব্যবস্থাই সুবিধামত শুধু নয় অপরিহার্য ভাবে মেনে চলতো যার পরিপূরক ছিল তাদের শাসনব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ মন্ত্রীবর্গ ও অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ মুসলমান শাসকদের অধীনে কার্য গ্রহণ করায় ঐ বিদেশী মুসলমান শাসকরা এদেশের সংখ্যাগুরু হিন্দু প্রজাদের নিকট অপেক্ষাকৃত কম ঘৃণিত বলে পরিগণিত হতো। কারণ ব্রাহ্মণ মধ্যবর্তীরা ঠিক জানতো কিভাবে তাদের স্ব-জাতীয় হিন্দুদের পরিচালনা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে তারা সাধারণের চোখে মর্যাদাবান হয়ে ওঠাতে সাধারণ হিন্দুরাও একটি বিরক্তিকর রাজনৈতিক

www.pathagar.com

জীবনের সঙ্গে আপস করার ব্যাপারে উচ্চতম জাতির প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করতো।" (এ স্টাডি অফ হিস্টরী, ভলিয়ুম ৭, পৃঃ ২০০)

তাহলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ আসলে কিসের ছিল? যদি হিন্দু ধর্মে এবং মুসলমান ধর্মে বিরোধ না থেকে থাকে তাহলে এত দাঙ্গা, নরহত্যা, লুটতরাজ ভারতবর্ষে বারে বারে হয়েছিল কি কারণে? ১৮৫৭ সালের ভারতবর্ষের প্রথম ও শেষ স্বাধীনতার যুদ্ধে (শেষ বললাম এই জন্য যে এরপরে ইংরেজের সংগে সশস্ত্র যুদ্ধ ভারতবর্ষে আর কখনও ঘটেনি। অবশ্য, বহু লেখক ও ঐতিহাসিক যেমন ডঃ হরপ্রসাদ চ্যাটার্জি একে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলতে নারাজ এবং তথ্যের দিক দিয়ে বলতে গেলে আমি এঁদের মতই সমর্থন করি।) মুসলমানরাই অগ্রণী ছিলেন বটে কিন্তু হিন্দুরাও তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছেন—বুকের রক্ত দিয়েছেন, প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছেন। যুদ্ধে ইংরেজকে পরাজিত করলে ভারতের সিংহাসনের অধিকারী মুসলমানেরা হবেন সেই নিয়ে, যে হিন্দুরা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা মাথা ঘামান নি। কিন্তু তবুও হিন্দু মুসলমানে এত বিরোধ হোল কেন? এত রক্তপাত, এত নিষ্ঠুরতার নিদর্শন আমরা কেন প্রত্যক্ষ করলাম?

অবশ্য, একটি বিষয়ে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রকৃতিগত মিল রয়েছে। উভয়ই ধর্মের খুঁটিনাটির প্রতি গভীরভাবে এবং প্রখরভাবে সজাগ। ধর্মের সারবস্তু প্রতিপালিত বা অনুসৃত হোল কিনা সে বিষয়ে উভয়েরই একটা উল্লেখযোগ্য উদাসীনতা আছে কিন্তু ধর্মাচারের খুঁটিনাটি এবং তুচ্ছ বস্তুগুলি ঠিকমত প্রতিপালিত হচ্ছে কি না অথবা তা প্রতিপালনে অপর সম্প্রদায় কোনো বাধা দিচ্ছে কি না সে বিষয়ে উভয়েরই প্রখর ও সজাগ দৃষ্টি। এ বিষয়ে হিন্দুরা মুসলমানদের প্রভাবিত করেছে, না, মুসলমানরা হিন্দুদের প্রভাবিত করেছে, বলা শক্ত। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশ ছিল এই ধরণের গোঁড়ামিতে একই পথের পথিক।

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে পার্থক্য যা আছে তাও কম নয়। মার্শাল আয়ুব খাঁ তাঁর আত্মজীবনী 'Frinds Not Master' বইতে মন্তব্য করেছেন, পীর, ফকির ও উলেমারা পবিত্র ইসলাম ধর্মকে ঘোরতর ভাবে বিকৃত করেছেন। এঁদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে ইসলামকে তার পূর্ব গৌরবে ফিরিয়ে আনাই এখন প্রধান কাজ হওয়া উচিত।

সেইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ

"Even to the Mohamamedn Rule we owe that great blessing, the destruction of exclusive privilege. That Rule was, after all, not bad, nothing is all bad and nothing is all good. The Mohammedan conquerers of India came as salvation to the

www.pathagar.com

downtrodden, to the poor. That is why one-fifth of our people have become Mohammedans. It is not the sword that did it all. If would be the height of madness to think it was all the work of sword and fire." (Selections from Swami Vivekananda. P. 206.

"মুসলমান শাসনব্যবস্থায় আমরা এই আশীর্বাদটুকু লাভ করেছিলামঃ সকল একচেটিয়া অধিকারের ধ্বংস সাধন। সেই শাসন ব্যবস্থা বলতে গেলে খারাপ ছিল না; কোনো জিনিসই সম্পূর্ণ খারাপ বা সম্পূর্ণ ভালো নয়। মুসলমানদের ভারত বিজয় নিপীড়িত ও দরিদ্র মুক্তির রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। সেইজন্যই আমাদের দেশে এক পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। শুধু তরবারির সাহায্যে এটি সংঘটিত হয় নি। এটা একেবারে চরমতম উন্মাদের কাজ হবে যদি ভাবা যায় যে এই সবই ছিল তরবারি ও বহ্নি সংযোগের ফল।" স্বামী বিবেকানন্দ

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের আসল এবং প্রধান কারণ অর্থনৈতিক। ১৭৯৩ সালে ইংরেজরা যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন, তাতে ভারতবর্ষের রাজস্ব ব্যবস্থার একটা তৎকালীন সমাধান হয়েছিল বটে কিন্তু এর দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শক্তিশালী হিন্দু জমিদারের কাছে দরিদ্র মুসলমান কৃষকের অসহায়তাকেও চিরস্থায়ী করে দেওয়া হয়। সাধারণ মুসলমান চাষী এই কারণে ইংরেজদের রাজক্ষমতা লাভকে সুনজরে দেখেনি। ইংরেজদের আগমনকে সাধারণভাবে হিন্দুরা স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেই জন্যই ইংরেজরাও হিন্দু জমিদারদের সংগে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তি করেছিলেন যাতে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে এঁরা ইংরেজদের শাসন-পরিচালনায় সাহায্য করতে পারেন। অবশ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে মুসলমান জমিদাররাও সুবিধা পেয়েছিলেন কিন্তু ইংরেজরা ইতিমধ্যে এত ব্যাপকভাবে হিন্দু ভূম্যধিকারীদের সৃষ্টি করেছিলেন যাতে হিন্দু জমিদারের সংখ্যায় বেশী হয়ে দাঁড়ালো। ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবার জন্য ইংরেজরা দেশে বহু বড় বড় হিন্দু জমিদারীর সৃষ্টি করলেন। যেমন, সিরাজদ্দৌলার সৈন্যদের আক্রমণ থেকে ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রাণ রক্ষা করতে সাহায্য করার দরুণ কান্ত মুদীকে কাশিমবাজারের মহারাজা করে দেওয়া হয়। মহারাজা নন্দকুমারের বিচারে তাঁর বিরুদ্ধে হেস্টিংসকে সাহায্য করবার দরুণ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে পাইক-পাড়ার রাজা করে দেওয়া হয়। এইভাবে ইংরেজদের শাসনকার্যের সুবিধা হোল, হিন্দু জমিদারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল, কিন্তু মুসলমান কৃষকের অসহায়তা চিরস্থায়ী হোল।

www.pathagar.com

ইংরেজরা আসবার পর থেকেই হিন্দুরা ইংরেজদের শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করলেন কিন্তু মুসলমানেরা দূরে সরে রইলেন। তাতে বিপদ হোল মুসলমানদেরই। আদালতে, রাজকার্যে আমাদের দেশে আগে ফারসী ভাষার প্রচলন ছিল। ইংরেজরা এসে দেশ থেকে ফারসী ভাষার প্রচলন তুলে দিলেন। ১৮৪৪ সালে ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি হুকুম জারি করলেন যে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বা জ্ঞান সম্বলিত ব্যক্তিরাই শাসন-ব্যবস্থায় যোগদান করতে পারবে এবং ইংরেজ রাজ-দরবারে চাকরী পাবে। ইংরেজীতে শিক্ষাদীক্ষাহীন মুসলমানেরা এতে এক কথায় ইংরেজের সরকারী চাকরীর অনুপযুক্ত ঘোষিত হোলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই এই চাকরীগুলি হিন্দুদের দ্বারা পূর্ণ করা হোল।

১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের ফলে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মুসলমানেরা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভারতের ভূম্যধিকারীর দল, যাঁদের অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন তাঁরা নিষ্ঠার সংগে ইংরেজদের সাহায্য ও সমর্থন করেছিলেন। ইংরেজরা জয়লাভ করবার পরে এঁদের বহু প্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন, কিন্তু সাধারণ মুসলমান প্রজা বা কৃষকের উপর এঁরা স্বভাবতই সদয় হতে পারেননি।

মুসলমানেরা পরে বুঝেছিল যে ইংরেজদের সমর্থন না করে ও তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা মস্ত ভুল করেছেন। সেইজন্য ১৮৭৫ সালে সৈয়দ আহমেদ খান আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করলেন এবং মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষায় প্রবুদ্ধ করলেন। ওদিকে ১৮৫৭ সালের যুদ্ধে ভারতের মুসলমানেরা মধ্য প্রাচ্যের সংস্কার পন্থী ওয়াহ্‌বী সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও আদর্শে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁদের মনে অনেকটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ১৮৫৭ সালের যুদ্ধ যেন একটা ধর্মযুদ্ধ, তাতে জয়লাভ করতে পারলে ইসলামের পুনরভ্যুত্থান হবে।

একদিকে ওয়াহ্‌বী সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও প্ররোচণা, অন্যদিকে ইংরেজদের পক্ষপাতপুষ্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের অগ্রগমনে জাগতিক বিষয়ে মুসলমানদের সমূহ ক্ষতি এবং সাধারণভাবে মুসলমানদের অসহায় অবস্থা তাদের মনকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিক্ত ও বিষাক্ত করে দিল। অশিক্ষিত অধিকাংশ দরিদ্র সাধারণ মুসলমানের মধ্যে অনেকেই আবার ছিল কয়েক পুরুষ আগের তথাকথিত অস্পৃশ্য হিন্দু, এখন ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান। নিজের সমাজের হাত থেকে পাওয়া অবিচার ও অপমান এরা পুরুষানুক্রমে ভুলতে পারে নি। এদের মধ্যে একটা সহজাত হিন্দু বিদ্বেষ বহুদিন থেকেই দানা বেঁধে ছিল।

এই সব মিলিয়ে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে এক তীব্র হিন্দু বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় যার গভীরতা এতদূর বিস্তৃত ছিল যে তা সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা কোনদিনই সম্ভব হয় নি। তাই সৈয়দ আহমেদ খান যখন মুসলমানদের

www.pathagar.com

ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদের সামাজিক অগ্রগতির রাস্তা খুলে দিলেন, তখন তারাও আর এক সম্মিলিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কথা ভাবতে পারলেন না। কি করে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংগে পাল্লা দিতে পারা যায় সেইটাই যেন তাঁদের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ালো। হিন্দু সম্প্রদায় থেকে তাঁরা নিজেদের পৃথক করে দেখতে শিখলেন এবং একটা মুসলমান জাতীয়তাবাদের কাঠামো ধীরে ধীরে রূপ নিতে লাগল। এই মুসলমান জাতীয়তাবাদই শেষে একদিন হিন্দু জাতীয়তাবাদের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ালো।

আবার, ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানেরাও একদিক দিয়ে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ালেন। ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক। এখানেও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ছিল সুগভীর। হিন্দু সমাজেও তা ছিল এক সময়ে। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ও তাদের সাহচর্যে হিন্দুদের মধ্যে এক শিক্ষিত বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় এই সামন্ততান্ত্রিক প্রাধান্যকে অনেকাংশে ভেঙে দিয়েছিল। মুসলমানদের বেলা তা হয় নি। গরীব গৃহস্থের বাড়ীর ছেলে বড় হবার স্বপ্ন দেখতে পারতেন না মুসলমান সমাজে। সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর লোকেরাই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জাতীয় জীবনে নেতৃত্বের স্থান করে নেবার জন্য সচেষ্ট হলেন।

কিন্তু চাকরী, ব্যবসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকায় মুসলমানদের এসব বিষয়ে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সংখ্যাধিক্যপুষ্ট হিন্দুদের কাছে তাঁরা প্রতিযোগিতায় পারতেন না। তখন তাঁরা সম্প্রদায়গতভাবে চাকরী ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নিজেদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে লাগলেন। এবং সেই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবীতে অশিক্ষিত সাধারণ মুসলমানের মনে একটা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যার ফলে সারা মুসলমান সমাজে একটা তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় যা সম্পূর্ণভাবে কোনোদিনই বিলুপ্ত হয় নি। মুসলমানদের এই শিক্ষিত সম্প্রদায় সত্যকার মুসলমানদের কতটা উপকার করেছিলেন বলা শক্ত তবে সাধারণ মুসলমানের মনে একটা এই বিশ্বাস জাগানো হয়েছিল যে, যেহেতু হিন্দুরাই সব লুটেপুটে খাচ্ছে সেই কারণে হিন্দুরাই মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

এটা স্বীকার না করে উপায় নেই, মুসলমানদের মধ্যে অন্য ধর্মীদের সংগে সহযোগিতার ভাব সাধারণভাবে প্রায় ছিল না বললেই হয়। নিজেদের ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্যদের সংগে খোলাখুলিভাবে মিশতে না পারার এই যে প্রবণতা এটাই মুসলমানদের জীবনের ও প্রগতির গতিকে অনেকাংশে রুদ্ধ করে দিয়েছিল। ভারতবর্ষের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ মহামতি বুদ্ধের যে শিক্ষা, যে শিক্ষার বাণী বহন করে ভারত ও ভারতবাসীরা যুগে যুগে ধন্য

www.pathagar.com

হয়েছে, সেই ক্ষমা ও তিতিক্ষার মহান আদর্শ মুসলমানদের মনে রেখাপাত করে নি।

একটা তুলনামূলক দৃষ্টান্ত দেব। মেদিনীপুর ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলনে সফল হয়ে তিনি যখন মেদিনীপুর থেকে ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নিতে তখনকার বাংলা সরকারকে বাধ্য করেছিলেন তখন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে বসলেন। কিন্তু তখন থেকেই বাংলার কংগ্রেস নেতারা তাঁর ওপর বিরূপ হয়ে ওঠেন তার কারণ হিন্দুদের মধ্যে তথাকথিত উচ্চবর্ণে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি। সেই কারণে, বাংলা দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কোনো সামান্য ভাগও যাতে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের হাতে না পড়ে তার জন্য বাংলার কংগ্রেস নেতাদের সর্বদা সজাগ দৃষ্টি ছিল। স্বরাজ্য দলের সভায় চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে বাংলার কংগ্রেস নেতারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, যেহেতু মেদিনীপুরের কৈবর্ত (মাহিষ্য) সমাজে তাঁর জন্ম, সেইহেতু কলকাতায় এসে রাজনৈতিক নেতৃত্ব করার কোনো অধিকার তাঁর নেই। এর অবশ্য আরও একটা কারণ ছিল। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন প্রধানতঃ মেদিনীপুরের লক্ষ লক্ষ কৃষক-কুলের নেতা। একজন কৃষক নেতা শেষকালে অভিজাত শ্রেণীর কংগ্রেস কর্তাদের ওপর নেতৃত্ব করবে সেজন্যেও কংগ্রেস নেতাদের গাত্রদাহ কম ছিল না। বাংলার কংগ্রেস নেতারা তাঁর ওপর দু-দুবার অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে তাঁকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা করেন। কংগ্রেস থেকে প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করা হয় যে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলই সুভাষচন্দ্র বসুকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। যখন তিনি রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন তখনও বাংলার কংগ্রেস নেতাদের শান্তি ছিল না। মাত্র ৩০০৲ টাকার এক বিতর্কমূলক দাবীতে বাংলার বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা, পরে কলকাতার মেয়র নির্মলচন্দ্র চন্দ্র বীরেন্দ্র-নাথ শাসমলের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার করিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়ে সিভিল জেলে পাঠিয়েছিলেন। যখন তিনি দেশের কাজে সর্বস্ব খুইয়ে দীন এবং রিক্ত তখনই বাংলার কংগ্রেস নেতারা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সুভাষচন্দ্র বসুকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন (অতএব তিনি ইংরাজের গুপ্তচর) বলে প্রচার করলেন। ঠিক এই সময়ে যখন তিনি দীন এবং রিক্ত এবং কংগ্রেসী চক্রান্তের শত্রুর গুপ্তচর বলে পরিগণিত, তখন বাংলার গভর্ণর লর্ড ফজলুল হক মারফৎ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে বাংলা সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তাব পাঠান। তখনকার দিনে ইংরেজ বণিক সভার মুখপত্র 'Capital' লিখেছিলঃ "Stars in their courses are fighting for Lord Lytton if the Strong Man of Midnapore (Mr. Sasmal) is after a diarchical ministership." "লর্ড লিটনের ভাগ্যাকাশে নক্ষত্রদল তার হয়ে

www.pathagar.com

সংগ্রাম করেছে যদি মেদিনীপুরের শক্ত মানুষ (মিঃ শাসমল) দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ইচ্ছা করে থাকেন।" কিন্তু সেই বন্ধুহীন সম্বলহীন নিতান্ত দুর্দিনে বীরেন্দ্রনাথ ইংরেজের পাঠানো মন্ত্রীত্ব গ্রহণের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তবু নিজের জীবিতকালে কোনো কারও বিরুদ্ধে এমন কি কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও কখনও কোনো অভিযোগ তিনি করেন নি। তাঁর মৃত্যুর পরেও কংগ্রেসী কলকাতা কর্পোরেশন তাঁর নামে একটা রাস্তা নামাঙ্কিত ক'রে পরে সেই রাস্তার খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে একজন কংগ্রেস নেতার নামে করে দিয়েছেন।

ওদিকে, আমরা আগে দেখেছি, ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা ও মহান বিপ্লবী মৌলানা মহম্মদ আলি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ নিয়ে অনেক বীরোচিত আন্দোলন করেছিলেন। তবু কংগ্রেসের সংগে মতের মিল না হওয়াতে তিনি শেষ পর্যন্ত ইংরেজ প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডকে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।

সাধারণত মুসলমান চরিত্রে এই যে ক্ষমা ও তিতিক্ষার অভাব, এইটাই তাদের জীবনে প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯২৭ সালে মুসলিম লীগ সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেস নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেনঃ "হিন্দু সংখ্যাধিক্যের প্রদেশগুলিতে মুসলমানেরা যে ব্যবহার পাবে, মুসলমান সংখ্যাধিক্যের প্রদেগুলিতেও হিন্দুরা ঠিক সেই ব্যবহার পাবে।"

এই যে প্রতিশোধমূলক মনোবৃত্তি, এর জন্যই বহু চেষ্টা সত্বেও হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে এবং ফলস্বরূপ শেষে যা হোল তার ইতিহাস আর কারো বলার অপেক্ষা রাখে না।

৮

বাংলা, পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্র এই তিন প্রদেশে বিপ্লবাদীদের বা টেরোরিষ্টদের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। বাংলা দেশে বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, পাঞ্জাবে লাজপত রায় ও মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলক বিপ্লববাদীদের গুরুস্থানীয় ছিলেন। এঁদের প্রত্যেকেই প্রাচীন হিন্দু ধর্মের দার্শনিক ভিত্তির উপর বিপ্লববাদীদের গঠনকর্মের আদর্শ রচনা করেছিলেন। শিবাজীর আদর্শে ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠা ও তার আরাধনা করা বিপ্লববাদের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিপ্লবীদের আখড়াগুলিতে নিয়মিত গীতা পাঠ

www.pathagar.com

ও আলোচনার ব্যবস্থা থাকতো। ভবানীর পূজা করা বা গীতা পাঠ ও আলোচনা করা নিঃসন্দেহে প্রশংসার কাজ কিন্তু যখন কোনো ধর্মদর্শনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে দাঁড় করানো হয় তখন অন্য ধর্মাবলম্বীরা এর প্রতি বিরূপ মনোভাব অবলম্বন করতে বাধ্য।

কোন কোন নেতার মনে হিন্দু ধর্মের সার্বজনীনরূপের আদর্শ হয়ত উপ্ত ছিল কিন্তু সাধারণ বিপ্লবী কর্মীর মনে এই হিন্দুধর্ম-ঘেঁষা বিপ্লববাদ তথাকথিত লুপ্ত হিন্দু গৌরব পুনরুদ্ধার এবং হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার সুঘোষিত পথ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার এই স্বপ্ন স্বভাবতঃই মুসলমানদের প্রতি খুব প্রেমের দৃষ্টি দিতে পারে না। এবং শুধু মুসলমানদের প্রতি কেন হিন্দু জাতির তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের প্রতিও এঁদের মনোভাব কতকটা শাসক-শাসিতের সম্পর্কের মত ছিল।

একথা ভুললে চলবে না, ভারতবর্ষে হিন্দুরা বহুদিন থেকেই মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নিজেদের পারস্পরিক অনৈক্য ও সামাজিক দুর্বলতার জন্য মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে তাঁরা কার্যকরী কিছু করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু ইংরেজদের আগমনে ভারতের হিন্দুদের বহুদিনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হবার অবকাশ পেল। ভারতবর্ষের সিংহাসন থেকে মুসলমানদের সরিয়ে হিন্দুরাই বসিয়েছিল ইংরেজকে। পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বিখ্যাত মারাঠা নায়ক বালাজী বাজিরাও ক্লাইভকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে তিনি বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য ইংরেজদের নিজের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। ক্লাইভ সেই চিঠিখানি সিরাজের কাছে পাঠিয়ে দেন সিরাজকে ভয় দেখাবার জন্য। (Col. Malleson-এর লেখা Lord Clive গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে)।

পলাশী যুদ্ধে মিরজাফর শিখণ্ডি ছিলেন মাত্র। সিরাজের প্রায় সমস্ত হিন্দু সেনাপতি মিরজাফরকে সামনে খাড়া করে গোপনে ইংরেজ পক্ষের সুবিধা করে দিয়েছিলেন। একমাত্র মোহনলাল সিরাজের পক্ষে লড়াই করেছিলেন বটে কিন্তু তিনি খুব উচ্চপদের সেনাপতি ছিলেন না।

ইংরেজদের হাতে ভারতের শাসনভার অর্পিত হলে হিন্দুরা যেরকম প্রীত হয়েছিলেন মুসলমানরা তা হতে পারেন নি। ইংরেজরা এদেশের শাসনভার গ্রহণ করতে না করতেই আমরা হিন্দুরা ইংরেজদের শিক্ষা সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানে নিজেদের রপ্ত করতে আরম্ভ করলাম। এ থেকেই বোঝা যাবে ইংরেজ-শাসনকে আমরা হিন্দুরা আন্তরিকভাবে চেয়েওছিলাম।

www.pathagar.com

মুসলমানরা বহুদিন পর্যন্ত ইংরেজী সভ্যতার নানান প্রতীকের প্রতি রীতিমত বিরূপ ছিল। এমন কি, বহুদিন পর্যন্ত মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করাও অধর্মের কাজ বলে মনে করে এসেছে। মুসলমানেরা চিরদিন ইংরেজদের তাদের রাজ্য অপহরণকারী বলে মনে করতেন। কিন্তু হিন্দুদের কাছে ইংরেজ রাজত্ব যেন ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ এসে উপস্থিত হয়েছিল। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেনঃ

"অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাবে দুর্বল সিরাজদ্দৌলার রাজ্যকালে বাঙ্গলা দেশে ইংরেজরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল। অজ্ঞান, স্বার্থান্ধ, কুচক্রী, মনুষ্যত্ববিহীন জনকয়েক বাঙ্গালী ও বঙ্গপ্রবাসী জমিদার, সমাজ-নেতা ও ধনী ব্যক্তি মিলিয়া স্বদেশকে ইংরাজের হাতে তুলিয়া দিল।" (জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য। পৃঃ ৯৫)।

মেকলে লিখেছিলেনঃ

"এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়, আজ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে বাঙলায় একজনও পুতুল পূজার সমর্থক থাকবে না। ধর্মান্তরকরণের প্রয়াস ছাড়াই এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় সামান্যতম হস্তক্ষেপ ছাড়াই শুধুমাত্র জ্ঞান ও চিন্তার স্বাভাবিক প্রবর্তনেই এটা করা সম্ভব হবে।

"কোনো হিন্দু যে এতটুকু ইংরেজি শিক্ষালাভ করেছে সে তার ধর্মের প্রতি আন্তরিকভাবে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে কোনো মুসলমান যে এতটুকু ইংরেজী শিক্ষালাভ করেছে সে তার ধর্মের প্রতি আন্তরিকভাবে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে না।"

কারণ ইংরেজদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ আমরা আমাদের ধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় না হলে ভারতের হিন্দুদের একটা বড় অংশ যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতো সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ইংরেজরা হিন্দুদের এই কৃতজ্ঞচিত্ততার প্রতি যে স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন সেটাও স্বাভাবিক।

১৮৪৩ সালে লর্ড এলেনবরা লিখেছেনঃ

"I cannot close my eyes to the belief that this race (Muslim) is fundamentally hostile to us and therefore our true policy is to conciliate the Hindus."

"আমি এই বিশ্বাসের প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখতে পারি না যে এই (মুসলমান) জাতি মূলত আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং সেই জন্য আমাদের প্রকৃত নীতি হবে হিন্দুদের সন্তোষবিধান করা।"

www.pathagar.com

সোমনাথের শিবমন্দির পুনর্নির্মাণের প্রস্তাবে তিনি লিখেছিলেনঃ

"Hindus, on the other hand, are delighted. It sseems to me most unwise when we are sure of the hostility of the one-tenth, not to secure the enthusiastic support of the nine-tenths which are faithful."

"অন্যদিকে হিন্দুরা উল্লসিত। আমার নিকট এটা খুবই অবিজ্ঞজনোচিত হ'বে যদি আমরা নবম-দশমাংশের উৎসাহিত সমর্থন লাভ না করি যখন আমরা এক দশমাংশের শত্রুতার কথা নিশ্চিতরূপে জানি।"

কিন্তু ইংরেজদের হিন্দুপ্রীতি এবং হিন্দুদের ইংরেজ প্রীতি ঠিক এমনটি চিরদিন রইল না। ইংরেজী শিক্ষার গুণে এবং ইংরেজী জীবনাদর্শের মহত্তর দিকের সংগে পরিচিত হবার সংগে সংগে হিন্দুরা যা বহুদিন আগে হারিয়ে ফেলেছিলেন সেই আত্মমর্যাদা ফিরে পেলেন। অতএব মেকলে যা আশা করেছিলেন ধীরে ধীরে ফল দাঁড়ালো তার ঠিক বিপরীত। ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন ও দেশপ্রেমের শিক্ষা পেয়ে হিন্দুরা নিজেদের জাতীয় আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে এক নতুন অনুপ্রেরণা পেলেন। হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু জাতীয়তাকে যেন তারা এক নতুন দৃষ্টি দিয়ে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে শিখলেন।

রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও নেতৃত্ব সমগ্র হিন্দুজাতিকে এক নতুন গৌরবে অধিষ্ঠিত করলো। ইংরেজী জাতীয়তাবাদের শিক্ষায় অবশেষে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হোল; শেষে এমন দাঁড়ালো যে হিন্দু ধর্ম দর্শন ও জাতীয়তাবাদ যেন ইংরেজদের সর্ববিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিল। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুরা যেন ইংরেজদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলতে লাগলেন যে আমাদেরও কিছু দেবার আছে, শুধু নেবার জন্যই আমরা জন্মাইনি।

ইংরেজরা হিন্দু ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার উপরে যে বিজাতীয় ঘৃণা নিয়ে এদেশে তাঁদের শিক্ষা-সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন তাতে এইরকম ফল ছাড়া অন্য কিছু হতেও পারতো না। ইংরেজরা ভেবেছিলেন যে হিন্দুদের তাঁরা এমনভাবে শিক্ষা দেবেন ও সভ্য করে তুলবেন যে তাঁরা হিন্দুত্ব ভুলে গিয়ে ইংরেজী সমাজেরই একটি অঙ্গে পরিণত হবেন। মানুষকে বড় করে তোলবার যে প্রচেষ্টায় এই রকম ঘৃণা মিশ্রিত থাকে, সেখানে ফল এইরকম বিষময়ই হয়।

এমন যখন হোল তখন ইংরেজরাও পথ বদলালেন। তাঁরা আস্তে আস্তে তাঁদের হিন্দুপ্রীতি বন্ধ করে দিলেন, বদলে আরম্ভ করলেন মুসলমান-প্রীতি। 'Divide et impera' এই ছিল ইংরেজী শাসকদের নীতি। কিন্তু প্রথম দিকে

www.pathagar.com

তা আরম্ভ হয়েছিল হিন্দু-প্রীতি দিয়ে এবং তখন অবশ্য আমরা হিন্দুরা ইংরেজী শাসনকে ভারতের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ মনে করেছিলাম। কিন্তু ইংরেজ শাসকেরা যখন মুসলমান-প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখালেন তখনই আমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে মনে মনে ক্ষুব্ধ হতে আরম্ভ করলাম এবং ফলে বাংলায় পাঞ্জাবে মহারাষ্ট্রে গুপ্ত সমিতির সৃষ্টি হোল এবং বিপ্লববাদের পতাকা উড্ডীন করা হোল।

আমাদের বার বার বলা হয়ে থাকে যে ইংরেজ শাসকেরা হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টি করে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখবার জন্য ভারতবর্ষ বিভাগ করে দিয়ে গেছেন। এর চেয়ে ভ্রান্ত যুক্তি আর কিছুই হতে পারে না। ইংরেজরা Divide and rule নীতি চালিয়েছিলেন নিশ্চয়ই—কিন্তু সে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে নয়, হিন্দু-মুসলমানের চিরন্তন বিভেদের সুযোগ নিয়ে। হিন্দু সমাজের সমর্থনে এবং সাহায্যে ও মুসলমানদের অগ্রাহ্য করে ইংরেজরা এদেশে তাঁদের রাজত্ব কায়েম করেন। তারপর যখন সুযোগ বুঝলেন তাঁরা হিন্দুদের ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুসলমানদের সাহায্য ও সমর্থন পাবার আশায় তাঁদের সংগে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। হিন্দুদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সঙ্ঘবদ্ধতা ধীরে ধীরে ইংরেজ শাসকদের ভয়ের কারণ হয়ে উঠলো। তাই তাঁরা মুসলমান সমর্থন লাভের জন্য হাত বাড়ালেন। বাংলা বিভাগ করে মুসলমান প্রধান প্রদেশের সৃষ্টি করা হোল। দি স্টেটস-ম্যানের মতে এর উদ্দেশ্য ছিলঃ

"To foster in Eastern Bengal the growth of a Mohammedan power, which it is hoped, will have the effect of keeping in check the rapidly growing strength of the educated Hindu community."

বাংলায় পাঞ্জাবে মহারাষ্ট্রে বিপ্লববাদ ইংরেজদের এই মুসলমান-প্রীতির বিরুদ্ধেই অসন্তোষের বহিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। স্বভাবতই তাই অগ্নিযুগে বিপ্লবীরা মুসলমান সমাজকে অনেকটা দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তাঁরা এই বিপ্লবের আন্দোলনকে একটু সন্দেহের চোখেই দেখতেন।

এই ধরনের হিন্দু-ঘেঁষা জাতীয় আন্দোলনের সম্ভাব্য ব্যর্থতার কথা গান্ধীজীই প্রথম উপলব্ধি করেন। সেই কারণেই তিনি খিলাফৎ আন্দোলনকে ভারতের স্বরাজ সাধনার আন্দোলনের সংগে প্রথমেই যুক্ত করে দেন। অবশ্য, এ কথা স্বীকার করতেই হবে, এর মধ্যে খিলাফৎ আন্দোলনের যৌক্তিকতার উপর নির্ভর করার চেয়ে মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যটাই ছিল বড় এবং সেই হেতু এই পদক্ষেপ কতকটা সুবিধাবাদদোষে দুষ্ট ছিল। কিন্তু

www.pathagar.com

একথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে রাজনৈতিক দিক দিয়ে হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে মুসলমান সমাজের প্রতি এই প্রথম একটা কার্যকরী সদিচ্ছার ভাব দেখানো হোল। কারণ, ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ হিন্দু-মুসলিম চুক্তি প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছিল এবং গান্ধীজির এই খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থন ও তার সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংযুক্তিকরণ দেশের বহু শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় হিন্দুর সমর্থন পায় নি। 'মডার্ন রিভিয়ু'-র সম্পাদক বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেনঃ

"Reading between the lines of the speeches of Moulana Mohammad Ali and Mahatma Gandhi it is not difficult to see that with one of them the sad plight of the Khilafat in distant Turkey is the central fact while with the other attainment of Swaraj in India is the object in view."

"মৌলানা মহম্মদ আলী ও মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতাগুলি খুঁটিয়ে পড়লে এটা লক্ষ্য করা কঠিন হ'বে না যে একজনের বেলায় সুদূর তুরস্কের খিলাফতের শোচনীয় দুরবস্থার কথাই মূল ঘটনা কিন্তু অন্যজনের বেলায় ভারতবর্ষের স্বরাজলাভই প্রার্থিত বস্তু।"

গান্ধীজী ২০.১০.১৯২০ তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে রামানন্দ বাবুকে জবাব দিয়ে লিখেছিলেনঃ

"I claim that with us both, Khilafat is the central fact; with Maulana Mohammad Ali because it is his religion, with me because in laying down my life for the Khilafat I ensure safety of the cow, that is my religion, from the Musalman knife."

"আমি দাবি করছি যে আমাদের উভয়ের জন্যই খিলাফতই মূল ঘটনা। মৌলানা মহম্মদ আলীর বেলায় এটা তাঁর ধর্মের ব্যাপার এবং আমার বেলায় খিলাফতের জন্য জীবন দান ক'রে আমি মুসলমানদের ছুরিকা থেকে গো-জাতির নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে চাই কারণ সেই আমার ধর্ম।"

মুসলমানদের বিক্ষোভের বিষয় নয়ে হিন্দুদের সহানুভূতি দেখানো প্রকাশ্যভাবে এই প্রথম এই খিলাফৎ আন্দোলনেই হয়েছিল। কিন্তু একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে এই ধরনের প্রচেষ্টা হিন্দু সমাজের একটা প্রভাবশালী অংশের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি।

হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শকে আমরা মন থেকে কখনই ঝেড়ে ফেলে দিতে পারিনি। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যেমন হিন্দু ধর্ম ও সমাজের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য হিন্দু জীবনদর্শনকে এক নবরূপে রূপায়িত

www.pathagar.com

করবার প্রচেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন, তেমনি গান্ধীজীর 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার আদর্শের মধ্যেও অনেকে হিন্দুধর্মের অতীত ঐতিহ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। একথা জওহরলাল নেহরুও তাঁর আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন।

রাজনীতির সংগে ধর্ম-দর্শনের সংমিশ্রণ যে অতীব বিপজ্জনক তার জন্য আমরা বারবার মুসলীম লীগের দৃষ্টান্ত দিই বটে কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, রাজনীতির প্রশ্নের সংগে ধর্ম-দর্শনকে জড়িয়ে ফেলে এই ভুল আমরা হিন্দুরাই সর্ব প্রথম করেছি।

৯

আমাদের দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রারম্ভিক পটভূমিকাকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ

"ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসের প্রারম্ভে দলগত বিরোধ ছিল না যা আজ বিদ্যমান। সে সময়ে ভারতীয় কংগ্রেস বলে একটি দল ছিল যার কোনো প্রকৃত কার্যক্রম ছিল না।.....সেই দল শীঘ্রই ক্ষমতাহীন হয়ে পড়লো কারণ জনগণ বুঝতে পারলো যে এদের অনুসৃত অন্তঃসারশূন্য নীতি কতখানি বিফল। দলটি দুভাগ হয়ে গেল এবং চরমপন্থীদের আবির্ভাব হলো যারা কর্মপ্রচেষ্টায় স্বাধীনতার কথা প্রচার করলো এবং ভিক্ষানীতিকে বিসর্জন দিলো...। এদের সকল আদর্শের ভিত্তি ছিল পাশ্চাত্যদেশের ইতিহাস...।

"ভারতের বিশেষ সমস্যাবলী সম্বন্ধে এদের কোনো সহানুভূতি ছিল না। তারা এই স্পষ্ট কথাটি স্বীকার করতে চাইতো না যে আমাদের সমাজ সংগঠনে এমন সব কারণ বিদ্যমান ছিল যা ভারতের অধিবাসীদের বিদেশীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার অক্ষমতা এনে দিয়েছিল। আমরা কি করতে পারি যদি হঠাৎ কোনো কারণে ইংরেজরা বিতাড়িত হয়? আমরা সাদা কথায় অন্য দেশের আক্রমণের বলি হ'ব। সেই সকল সামাজিক দুর্বলতা বিদ্যমান থাকবে। ভারতের এখন যা চিন্তা করতে হবে তা এই—সেই সকল সামাজিক প্রথা ও চিন্তাধারা দূর করে দিতে হ'বে যা আমাদের মধ্যে আত্মসম্মানের অভাব ঘটিয়েছে এবং আমাদের উপরে যারা আছে তাদের উপর একান্তভাবে নির্ভর-শীল করে তুলেছে। যে অবস্থা নিশ্চয় সম্পূর্ণভাবে তৈরী হয়েছে ভারতে জাতিভেদ প্রথার আধিপত্যের দরুণ এবং যে সকল পুরাতন আদর্শ বর্তমান যুগে একেবারেই অসংবদ্ধভাবে অচল সেইগুলির অন্ধ ও অক্ষম অনুকরণের অভ্যাসের দরুণ।" (ন্যাশন্যালিজম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১১৩-৪)

www.pathagar.com

গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মপন্থার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল আমাদের সমাজের এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলিকে ধীরে ধীরে নির্মূল করে দেওয়া। এ বিষয়ে গান্ধীজী যে আমাদের পরাধীনতার মূল কারণটি খুঁজে বার করতে পেরেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং পরাধীনতার সেই মূল কারণটি হোল আমাদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও সামাজিক ব্যবস্থার গভীর অসাম্য যার ফলে দেশের প্রতি ও সমাজের প্রতি অগণিত জনসাধারণ শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিল। অবশ্য এটা স্বীকার করতেই হবে 'রামরাজ্য' এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গান্ধীজীও অনেকটা পুরাতন ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে পুরাতনপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বলা যায় না।

আমাদের দেশের রাজনীতিকদের একটা অভ্যাস আছে দেশের সর্বপ্রকার দুর্গতির জন্য সর্বদাই পরদেশকে বিশেষতঃ ইংরেজদের দায়ী করা। ভারত-বর্ষের লোকেরা আসলে ভারত-বিভাগ চায়নি—ইংরেজরাই ভারতকে বিপদে ফেলবার জন্য ভারতকে ভাগ করে দিয়ে এদেশ ত্যাগ করেছে। তারপর থেকেই ভারতবর্ষ সমস্যার পর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং বর্তমানে সমস্যা আরও ঘোরতর হয়ে উঠেছে। ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগের অন্ত নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার চিহ্ন, যা ভারতবিভাগের পরবর্তী অবস্থার চেয়ে অনেকাংশে বেশী ভয়াবহ ছিল, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ কিভাবে নিঃশেষ করে মুছে ফেলে দিয়ে নূতন নগর, নূতন সমাজ গড়ে তুলেছে সেকথা অবশ্য আমাদের ভাববার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, আমাদের দুর্গতির জন্য সর্বদাই হয় ইংরেজ না হয় চীনারা না হয় পাকি-স্তানীরা দায়ী।

গান্ধীজীই সর্বপ্রথম আমাদের এই বহু পুরাতন ভ্রান্ত মনোবৃত্তি পরিহার করে নিজেদের দুর্বলতা মোচনের জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনিই দেশকে দেখালেন নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা না করলে কোন দিনই জাতীয় দুর্গতি শেষ হবে না। এবং সত্যকার স্বাধীনতা মানে শুধু শাসনযন্ত্র অধিকার করাই নয় পরন্তু সমগ্র জাতির আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা করাই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সোপান। সেই হেতু, দেশের অধিকাংশের জীবন যে গ্রামে গ্রামে বিস্তৃত সেই গ্রামীন জীবনের পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনই হোল স্বাধীনতার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

যুক্তির দিক দিয়ে দেখলে গান্ধীজীর পথ নির্দেশে কোনো ভুল ছিল না। কিন্তু গান্ধীজী যেটা ভালো করে বুঝতে পারেন নি তা হোল এই যে, এই কর্মপন্থা ব্যাপকভাবে কার্যকরী হওয়া আমাদের দেশে অসম্ভব ছিল, প্রধানত

www.pathagar.com

একটি কারণে। এই কর্মপন্থা আমাদের দেশে কার্যকরী করার প্রধান বাধা ছিলাম আমরাই, মানে আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়। শিক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে বিভিন্ন পেশাগত বৃত্তিতে আমরা ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত শাসনযন্ত্রের সংগে এমন গভীরভাবে বাঁধা ছিলাম যে গ্রামীন জীবনের পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের কাজ সফল হলে আমাদের শিক্ষিত শহুরে জীবন নিশ্চিত হয়ে যেতো। সব দেশেই গ্রামের রক্ত শোষণ করে শহর ফুলে ওঠে। গ্রামের পুনর্গঠন হলে শহরের ফুলে ওঠা চুপসে যেতে বাধ্য। তাছাড়া গান্ধীজী যে ধরণের অসহযোগের প্রস্তাব দেশের সামনে তুলে ধরেছিলেন ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত শাসন-যন্ত্রের সংগে সেই ধরণের অসহযোগ আমাদের মত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে আত্মহত্যারই সমতুল্য হোত। আমাদের দেশের বৃত্তিজীবি শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের সুখ-সুবিধা আশা-ভরসা ভবিষ্যৎ জীবনধারার উদ্বেগহীন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের তথাকথিত গ্রামীন সভ্যতা গড়ে তোলার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠবে গান্ধীজী এই আশা করে মস্ত বড় ভুল করেছিলেন। সেই কারণে তাঁর পরিকল্পিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন দেশে কোনোদিন ভালোভাবে আরম্ভই হতে পারেনি। কোন জাতির পক্ষে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা বা তার প্রকাশ্য দাবী করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা জাতির একটা বিরাট অংশ নিশ্চিত আত্মবিলুপ্তির ভেতর দিয়ে জাতির স্বাধীনতার রাস্তা বানিয়ে দেবে এমনটি বাস্তবজীবনে ঘটানো আমাদের পক্ষে সম্ভব কি-না সেকথা গান্ধীজী ভেবে দেখেন নি।

তাঁর এই মস্ত বড় ভুলের জন্যেই তাঁর প্রস্তাবিত গঠনমূলক কর্মপন্থা এদেশে কোন জায়গায় শিকড় গেড়ে বসতে পারেনি। তাঁর জীবিতকালে তাঁর গঠনমূলক কর্মপন্থার যে তথাকথিত প্রসারের কথা ঘোষণা করা হোত সেটা ছিল এক ধরণের খয়রাতি কাজ যার বেশীর ভাগ টাকা যোগাতেন বোম্বাইয়ের মিল-মালিকরা। খয়রাতি কাজের ছকে ফেলা হয়েছিল বলেই আজও পর্যন্ত আমাদের সরকারকে কোটি কোটি টাকা সাহায্য দিয়েও গান্ধীজীর পরিকল্পিত খাদি ও গ্রামোদ্যোগের পরিকল্পনাকে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়নি। বোম্বাইয়ের মিলগুলি না থাকলে গান্ধীজীর খাদি আন্দোলনের প্রসার হোত না এবং গান্ধীজীর মৃত্যুর পর বিপুল অর্থসংগ্রহ করে গান্ধী স্মারকনিধি গড়ে তোলাও সম্ভবপর হোত না।

অপরের দয়ার দানে কখনও বিপ্লবকে সফল করা যায় না। অর্থবান ও মিল-মালিকদের দয়ার দানে পুষ্ট গান্ধীজীর খাদি আন্দোলন সেই কারণেই তাঁর বহু বিঘোষিত অহিংস বিপ্লবকে সফল করতে পারে নি। গান্ধীজী ও তাঁর প্রিয় গঠনমূলক কর্মীদের মধ্যে এই মিল-মালিকদের দাক্ষিণ্যের প্রতি অন্ধ নির্ভরশীলতা এত উৎকট ছিল যে ফরাসী মনীষী রোম্যাঁ রোলাঁ এ

www.pathagar.com

বিষয়ে লিখেছিলেনঃ

"এমন কি গান্ধীর পক্ষেও এই ক্ষণে তাঁর মনের দিগন্তকে প্রসারিত করা কতখানি প্রয়োজনীয়! শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রমজীবীদের সংগ্রামের প্রশ্ন নিয়ে সম্প্রতি তিনি যা লিখেছেন তা থেকে দেখা যাবে, পৃথিবীর রক্তক্ষয়ী পদযাত্রা যে নব পর্যায়ের পথে এগিয়ে গেছে সে সম্বন্ধে তিনি প্রায় সম্পূর্ণরূপে অনবহিত। যেখানে সৌভ্রাত্যপূর্ণ-হৃদয়বত্তা বর্জিত ছিল না, প্রাচীন সমাজের সেই সেকেলে শ্রেণী-বৈষম্যের ধারণাতেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আবদ্ধ। এবং তাঁর কাছে পুঁজিবাদের ছবি ঐ আদোবাদের বিরাট বস্ত্র-উৎপাদকদের রূপ নিয়েই সর্বদা দেখা দেয়, ধার্মিক ও সজ্জন হিসাবে যাঁরা তাঁর কথায় প্রভাবিত হন এবং যাঁরা তাঁদের শ্রমিকশ্রেণীর সংগে সম্পর্কবিহীন নন। সেই নব্য শাসন-যন্ত্র, সেই অবয়বহীন, হৃদয়হীন ধনতন্ত্র, সেই বৃহদাকার যৌথ কোম্পানী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-পরিষদ সেই অন্ধ বিকটাকার রাক্ষসগুলির সংগে তাঁর সম্যক পরিচয় হয়নি—রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী যে-যন্ত্রদানবের বিরুদ্ধে বহু নিরর্থক তীর নিক্ষেপ করেছেন তার চাইতেও এরা বহুগুণ ভয়ংকর, কারণ এই ধনতন্ত্রই বর্তমানের অদৃশ্য মহাযন্ত্র। এই মহাযন্ত্রই আজ বিভিন্ন রাষ্ট্রকে জনমতকে পরিচালনা করে। এই যে অবয়বহীন, নামহীন, মনুষ্যত্বের পরিশিষ্টাংশের সংগে সম্পর্ক বিহীন যন্ত্রশক্তি, এর কার্যপ্রণালী আর রক্তমাংসে গড়া মানব গোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তি বা এমনকি স্বেচ্ছাচারী প্রজা-পীড়কের নৃশংস কার্যপ্রণালীও কি কখনো এক গোত্রের হতে পারে?" (Inde. পৃঃ ২৪৩। মূল ফরাসী থেকে অনূদিত)

১৯২০-২১ সালে গান্ধীজীর পরিকল্পিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হতে না হতেই ধাক্কা খেল দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট থেকে—তাঁদের মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ালেন চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু। এঁরা দুজনেই গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মপন্থার বিরোধী ছিলেন। নিজের হাতে কাটা সুতো চাঁদা হিসাবে দিলে তবেই কংগ্রেসের সভ্য হওয়া যাবে গান্ধীজীর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এঁরা দুজনেই একবার সদলে কংগ্রেসের অধি-বেশন মন্ডপ ত্যাগ করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। গয়া কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছিলেনঃ

"I have not yet been able to understand why to enable a people to civilly disobey particular laws it should be necessary that at least eighty percent of them should wear pure "Khadi." I am not much in favour of general mass civil disobedience, to my mind the idea is impracticable."

"আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি জনগণকে বৈধ পন্থায় আইন অমান্য

www.pathagar.com

করতে প্রস্তুত করবার জন্য কেন তাদের মধ্যে আশি শতাংশকে খাদি পরিধান করতে হবে। আমি ব্যাপক হারে আইন অমান্য সমর্থন করি না, আমার মতে এই পরিকল্পনাটি কাজে রূপায়িত করা যাবে না।"

গান্ধীজীর মানস পুত্র জওহরলাল নেহরুও গান্ধীজীর এই খাদি আন্দোলনকে স্পষ্ট ভাষায় সমালোচনা করতে ছাড়েন নিঃ

"খাদি আন্দোলন, হাতে সূতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন করা যা গান্ধীজীর বিশেষ প্রিয়, সবই উৎপাদনে ব্যক্তি স্বার্থের সমষ্টিকরণ এবং সেইহেতু এগুলি প্রাক-যন্ত্রশিল্প যুগে পশ্চাদপসরণ। বর্তমান কালের মূল্যবান সমস্যাগুলির সমাধান হিসাবে এগুলিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা যায় না। এবং এগুলি এমন একটি মানসিকতার সৃষ্টি করে যা উন্নয়নের সঠিক পথের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ভারতের বর্তমান খাদি আন্দোলনের বিভিন্ন উপকারিতা সত্বেও আমার মনে হয় এটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা। পরেও অবশ্য একটি সমান্তরাল আন্দোলন হিসাবে এটি চলতে পারে উচ্চতর অর্থনীতিতে পরিবর্তননের পথকে সহজ করে দেবার জন্য। বর্তমান যুগে কোনো দেশই সত্যকারের স্বাধীন হ'তে পারে না বা বহিঃশত্রুর আক্রমণের বাধা দেবার ক্ষমতা রাখে না যদি না সেটি যন্ত্রশিল্পে উন্নত না হয়।" (অটোবায়োগ্রাফি, পৃঃ ৫২৫-৬)

কংগ্রেসের উচ্চ পর্যায়ের নেতারা কেউই গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মপন্থায় বিশ্বাস করতেন না, যেমন গান্ধীজী করতেন। দেশের শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত বৃত্তিজীবি সম্প্রদায় যে এই কর্মপন্থায় বিশ্বাস করতে পারেন না তার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু আমরা সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছি গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মপন্থার কথা এবং এতে আরোপ করেছি একটা যেন অলৌকিক গুরুত্ব যার ফলে মনে করান হয়েছে যে ভারতের লক্ষ লক্ষ গামবাসী যেন ক্ষিপ্র-গতিতে নূতন কলেবর ধারণ করে একটা নূতন গ্রামীন সভ্যতার গোড়া পত্তন আরম্ভ করে দিয়েছে। আসলে তার কিছুই হয় নি।

১৯২২ সালেই চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু প্রভৃতি নেতারা গান্ধীজীর অসহযোগমূলক ও গঠনমূলক কর্মপন্থায় আস্থা হারিয়ে ফেলে দেশের সামনে নূতন প্রস্তাব তুলে ধরলেন—কাউন্সিল প্রবেশ। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় গান্ধীজীর আন্দোলনের মধ্যে নিজের 'স্বজাতীয়' কিছু খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কোনো ভোটাভুটি নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, পরস্পরকে ভাষার আক্রমণে নিশ্চিহ্ন করে দেবার সুযোগ নেই, বক্তৃতার খই ফোটাবার অবকাশ নেই—এ কেমন ধারা রাজনীতির দিকে গান্ধীজী দেশকে টেনে নিয়ে চলেছেন। এ রাস্তা 'ত তাঁদের নয়। তাই দাবী উঠলো, চাই—কাউন্সিল প্রবেশ।

www.pathagar.com

১০

চৌরি-চৌরার থানা পোড়ানোর ঘটনার পর গান্ধীজী যখন ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন সম্পূর্ণ অহিংস নয় এই কারণে তা প্রত্যাহার করলেন তখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আইন অমান্য আন্দোলন তদন্ত কমিটি বসানো হয় আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রয়োজন ছিল কিনা খুঁজে দেখবার জন্যে। গান্ধীজীর প্রস্তাবিত অহিংস অসহযোগ যে কোনো কালেই সম্পূর্ণভাবে সফল হতে পারবে না (কারণ, চৌরি-চৌরার মত হিংসাত্মক ঘটনা যে আবার ঘটবে না তার প্রতিশ্রুতি কে দিতে পারতো?) এই কথাটা ওই তদন্ত কমিটির দ্বারা নির্ভুলভাবে প্রমাণ হয়ে যাক সেই অপেক্ষায় অনেকেই ছিলেন। তাই ঐ তদন্ত কমিটির রায় বেরোবার সংগে সংগেই ঐ দলের দাবী উঠলো— চাই কাউন্সিল প্রবেশ। এঁদের নেতা হলেন চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু।

কিন্তু ঐ কমিটির রিপোর্ট বেরোবার পূর্বে গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছেনঃ

"যে শাসনব্যবস্থা জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের নিজস্ব নয় তাকে স্বরাজের প্রকৃত ভিত্তি হিসাবে কখনও স্বীকার করা যায় না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা জনগণের জন্য বা জনগণের দ্বারা নয়। আমাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন মধ্যবিত্ত সমাজকেই জন-সাধারণের জন্যে স্বরাজ অর্জন করে আনতে হবে। আজকে যদি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের প্রবর্তন করে আমার দিক থেকে আমি এর প্রতিবাদ করবো কারণ তাহ'লে নিশ্চিতভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠবে। মধ্যবিত্ত সমাজ তখন সেই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ চাইবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। ভারতের তাতে কি সুবিধা হবে যদি বর্তমানের শাসনরত শ্বেত বর্ণের আমলাতন্ত্রের জায়গায় মধ্যবিত্ত সমাজের আমলাতন্ত্র স্থান অধিকার করে? আমলাতন্ত্র মানে আমলাতন্ত্র এবং আমলাতন্ত্রের অবস্থিতির সঙ্গে স্বরাজের সমগ্র ধারণাটুকুই সম্পূর্ণ বিরোধী।"

তবে কাউন্সিল প্রবেশের যে রাস্তা দাশ সাহেব খুলে দিলেন তাতে power যে শেষ পর্যন্ত middle class (মধ্যবিত্ত সমাজ)-এর হাতেই গিয়ে পড়বে একথা তাঁর মত বিচক্ষণ আইনজ্ঞ যে কেন বুঝতে পারেন নি তা বলা দুষ্কর। কারণ, কার্যতঃ শেষ পর্যন্ত সেইটাই হোল। অবশ্য চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর নীতি ছিল (Non co-operation from within) যাতে শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলগুলির পরিচালনা ভণ্ডুল করে দেওয়া যায়।

www.pathagar.com

তাঁরা সেইজন্যেই বিভিন্ন প্রদেশের কাউন্সিল অধিকার করবার কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু যাঁদের নিয়ে তাঁরা "non-co-operation from within" করতে চেয়েছিলেন সেই "middle class" (মধ্যবিত্ত সমাজের) বুদ্ধিজীবির দল আর কাউন্সিলে গিয়ে non-co-operation (অসহযোগ) করতে চাইলেন না। তাঁরা অন্য রূপ ধরলেন। নেতারাও আর এ নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না করাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন।

প্রথমে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল স্বরাজ্য দলের প্রার্থীরা সভ্য নির্বাচিত হলে তাঁরা পদত্যাগ করবেন এবং পুনর্বার নির্বাচন প্রার্থী হবেন। নির্বাচিত হলেই তাঁরা আবার পদত্যাগ করবেন এবং এইভাবে কাউন্সিলগুলির কার্য পরিচালনা অসম্ভব করে তুলবেন। কিন্তু নির্বাচিত হবার পর অধিকাংশ সদস্যই বার বার পদত্যাগ ও বার বার পুনর্নির্বাচনের কর্মপন্থা বাতিল করে দেন। কাজেই non-co-operation from within-এর মূল পরিকল্পনা শুরুতেই ভেস্তে যায়।

নিখিল ভারত স্বরাজ্যদলের অন্যতম সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এই নিয়ে মতিলাল নেহরুর নিকট অভিযোগ করেছিলেন এবং স্বরাজ্য দলের এই নীতিবিচ্যুতির জন্য তিনি স্বরাজ্যদলের কার্যনির্বাহক পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। অবশ্য পদত্যাগের আরও অনেকগুলি কারণ ছিল। তাঁর পদত্যাগের চিঠির জবাবে মতিলাল নেহরু লিখেছিলেন (১৪.১.১৯২৬)ঃ

আনন্দ ভবন

প্রিয় শাসমল,

আপনার চিঠি পড়ে এবং যে মত আপনি প্রকাশ করেছেন তাতে আমি দুঃখিত হয়েছি। আপনার পক্ষে কার্যনির্বাহক সমিতিতে থাকা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠছে এই বিশ্বাসে যে যুক্তিগুলি আপনি দেখিয়েছেন সেগুলিই আমার মতে একমাত্র কারণ যে জন্য আপনাকে কার্যনির্বাহক সমিতিতে শুধু থাকতেই হবে না পরন্তু এখন পর্যন্ত তাতে আপনি যতখানি অংশ গ্রহণ করেন তার চেয়ে বেশি কার্যকরীভাবে অংশ নিতে হবে।

আপনার প্রথম কারণ হচ্ছে যে দলের কার্যক্রম "যথেষ্ট সংগ্রামশীল" নয়। আমি স্বীকার করছি, আমি বুঝতেই পারছি না আমরা কীভাবে একে বর্তমানের চেয়ে সংগ্রামশীল করতে পারি। কাণপুরের সভ্যদের সাধারণ সভায় পুনঃ পুনঃ পদত্যাগ ও বার বার পুনর্নির্বাচনের যে প্রস্তাব আপনি দিয়েছিলেন তা এমনকী বাঙলার সভ্যদেরও সমর্থন লাভ করতে পারেনি এবং তার প্রকৃতিতে দেশের কোনও অংশেই শুধু মেদিনীপুর বিভাগ ছাড়া বাঙলাতেও কার্যে পরিণত করা অসম্ভব ছিল। তবে, আপনার যদি অন্য

www.pathagar.com

কোনও প্রস্তাব উত্থাপনের ইচ্ছা থাকে তাহ'লে দলের কার্যনির্বাহক সমিতি নিশ্চয়ই তার জন্য একমাত্র স্থান এবং সেখানেই আপনাকে সেসব উত্থাপন করতে হবে।

আপনার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে "কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে এমন এক শ্রেণীর লোক করায়ত্ত করে ফেলেছে যারা কংগ্রেসকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন ক'রে কংগ্রেসের অবলুপ্তির উপরে নিজেদের দলকে গড়ে তুলতে চায়।" এটাও একটি প্রধান কারণ যার জন্য আপনার কার্যনির্বাহক সমিতিতে থাকা দরকার এবং দল থেকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের বহিষ্কারের কাজে সহায়তা করবেন।

আপনার তৃতীয় কারণ এই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের নিকট থেকে ব্যক্তিগতভাবে আপনি যে ব্যবহার পেয়েছেন তারই উল্লেখ। আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছি যে দেশবন্ধুর কথা মত, যা আপনি নিজে উদ্ধৃত করেছেন, যিনি বাঙলা দেশকে নেতৃত্ব দান করবেন ব'লে মনে করা হয় সেই আপনি এই সব দুষ্কৃতকারীদের ভীতিপ্রদর্শনে এতটা বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমি সব সময়েই আশা করেছি যে বাঙলায় আপনার যেরকম প্রভাব এবং শক্তি আছে বলে আমি জানি তারই সাহায্য নিয়ে আমি এইসব লোকদের সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা নেব এবং আপনার নিকট থেকে একথা শুনে বেদনা পাচ্ছি যে "বাঙলায় এইসব ব্যাপারে প্রতিকার করবার লোক নেই।"

আমি বাঙলায় বেশ কিছুদিন থেকে এই অবস্থা সম্বন্ধে সরেজমিনে তদন্ত করতে চাই কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বেশ কিছুদিনের জন্যে আমার পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না। সেইজন্য আমি তুলসী গোস্বামীকে বলেছি আমার সঙ্গে বসে ব্যাপারটি খোঁজখবর নিতে যাতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা ব্যক্তিগত শত্রুতার ইতি করা যায়। তুলসী গোস্বামী বাংলায় দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে এবং আশা করি এ বিষয়ে ঠিক মত কাজ করতে সে সক্ষম হবে। সারা দেশময় যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে সে সময়ে আপনিই কিন্তু সেই ব্যক্তি যাঁর সমর্থনের আশায় আমি চেয়ে আছি এবং আমি নিশ্চিত জানি এই দুঃসময়ে আপনি দল ছেড়ে যাবেন না। পুরোদমে কাজ শুরু করার আগে আমার আরও কিছু বিশ্রাম দরকার এবং সেইজন্য ১৭ই তারিখের আগে আমি দিল্লি যাবো না। এর মধ্যে আপনার লেখা পাবো ব'লে আশা করি।

ভবদীয়

মতিলাল নেহরু

শুধু এইটুকুই নয়—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্বরাজ্য দলের সভ্যরা নির্বাচিত হবার পর ইংরেজ পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের ব্যবস্থা পাকাপাকি করতে চাইলেন। স্বরাজ্য দল মধ্যপ্রদেশে নিরঙ্কুশ

www.pathagar.com

সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করেছিল এবং বাংলা ও বোম্বাইয়ে বৃহত্তম দল হিসাবে কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছিল। এর মধ্যে মধ্য প্রদেশের স্বরাজ্য দলের নেতা তাম্বে কাউন্সিলে নির্বাচিত হবার পরই তাঁর দলবল নিয়ে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন। বোম্বাইয়ে মুকুন্দরাম জয়াকর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেন নি, তাই তাঁর আর মন্ত্রীত্ব লাভ হোল না। তিনি প্রকাশ্যভাবে তাম্বের পথকেই সমর্থন করে বিবৃতি দিলেন। মতিলাল নেহরু অনেক তর্জন গর্জন করলেন কিন্তু তাম্বে মন্ত্রীত্ব ছাড়লেন না। জয়াকরও মন্ত্রীত্ব গ্রহণকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানানোর জন্য কোন ভুল স্বীকার করলেন না। পরে মতিলাল নেহরু ভারত সরকার কর্তৃক Skein Commission-এর সদস্য মনোনীত হলে জয়াকর একে মন্ত্রীত্ব গ্রহণেরই সামিল বলে অভিযোগ করেছিলেন।

অর্থাৎ বস্তুতপক্ষে স্বরাজ্যদলের একটা বড় অংশ মধ্যপ্রদেশে ও বোম্বাইয়ে প্রকাশ্যভাবে স্বরাজ্য দলের বিঘোষিত নীতির বিরোধী কর্মপন্থা গ্রহণ করলেন। তাঁদের কাছে Non co-operation from within খোলাখুলিভাবে 'ভিতরে বাইরে সহযোগিতায়' (Co-operation in and out) গিয়ে দাঁড়ালো এবং এই প্রকাশ্য বিদ্রোহের ব্যাপারে স্বরাজ্যদলের নেতারা অসহায় শিশুর মত চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন নি।

বাংলায়ও স্বরাজ্য দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নি। এবং এখানে চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর আইনজগতের গুরু ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সংগে আসন ভাগাভাগি করে কিছু আসন ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর ন্যাশনালিস্ট দলের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। কথা ছিল, ন্যাশনালিস্ট দলের সংগে স্বরাজ্য দল কাউন্সিলে একযোগে কাজ করবে। এই ন্যাশনালিস্ট দলের প্রার্থী হয়ে মেদিনীপুরের নাড়াজোলের জমিদার দেবেন্দ্রলাল খান ও ডঃ বিধানচন্দ্র রায় কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কিন্তু নির্বাচিত হবার পর ন্যাশনালিস্ট দলের নেতা ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন। স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধেই বাংলা কাউন্সিলে ন্যাশনালিস্ট ও স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে ইংরেজের কারাগারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করে প্রস্তাব আনা হয়। এই রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে কয়েক মাস পরে ধৃত সুভাষচন্দ্র বসু পরে মান্দালয় জেলে বন্দী ছিলেন। ১৯২৪ সালের ২৪শে জানুয়ারী দুটি পৃথক পৃথক প্রস্তাবে সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করা হয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রিয়পাত্র এবং পরে মতিলাল নেহরু ও জওহরলাল নেহরুর বন্ধু নাড়াজোলের জমিদার দেবেন্দ্রলাল খান এই দুটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই সরকার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন যার অর্থ এই যে, তিনি চেয়েছিলেন

www.pathagar.com

সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বাংলার বিপ্লবী বন্দীদের কারাগারে আবদ্ধ রাখাই উচিত।

১৯২৪-এর ২৮শে জানুয়ারী ন্যাশনালিস্ট দলের প্রস্তাবে বাংলার দমন-নীতিমূলক আইনগুলি রদ করবার প্রস্তাব করা হয়। দেবেন্দ্রলাল খান এই দিন অনুপস্থিত হন। রাজবন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হলেও বাংলা সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়নি বলে ১৯২৪-এর ১৯শে মার্চ সরকারের বাজেট প্রত্যাখ্যান করবার প্রস্তাব করে স্বরাজ্য দল ও ন্যাশনালিস্ট দল। দেবেন্দ্রলাল খান এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

অবশ্য এর জন্য দেবেন্দ্রলাল খানের বিরুদ্ধে চিত্তরঞ্জন দাশ বা আর কেউ কিছুই করতে সাহস করেন নি। কারণ মনে রাখতে হবে, তিনি বড় জমিদার এবং প্রভূত অর্থ সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তাছাড়া স্বরাজ্য দলের নির্বাচনী খরচের জন্য তিনি দাশ সাহেবের হাতে প্রচুর টাকা দিয়েছিলেন। ('প্রণব', মাসিক পত্রিকা, কার্তিক ১৩৭২, পৃঃ ২৬৬)।

এর পরে দেখাব দেবেন্দ্রলাল খানকে কংগ্রেস থেকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল এবং নেহরু পরিবার এঁর এত বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন যে মৃত্যুর কিছুদিন আগে মতিলাল নেহরু এঁর কলকাতার বাড়ীতে অতিথি হয়ে চিকিৎসিত হয়েছিলেন। জওহরলাল নেহরুও বহুবার এঁদের বাড়ীতে অতিথি হয়ে উঠেছিলেন। এই জমিদার বাহাদুরের ড্রয়িংরুমের আরাম কেদারায় বসে গান্ধীজীর উত্তরাধিকারী জওহরলাল নেহরু নিশ্চয়ই Poorest man in India-র মুখছবি চিন্তা করতেন—যে 'talisman' একদিন মহাত্মা গান্ধী বাংলার গঠন কর্মীদের জন্য দিয়েছিলেন। ঘটনাটা লিখলাম এই জন্য যে কংগ্রেস নেতাদের আদর্শপ্রিয়তার কথা এর থেকে বোঝা যাবে।

একথা সত্য যে, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করেও চিত্তরঞ্জন দাশ ইংরেজ চালিত বাংলা সরকারকে দু-একবার বাংলা কাউন্সিলে ভোটে হারিয়ে দিয়েছিলেন—যদিও তার বিশেষ কিছু দাম ছিল না কারণ তখনকার আইনে গভর্ণর নিজে সার্টিফিকেট দিয়ে যে-কোনো আইন চালু করতে পারতেন। সে সময়ে প্রচার করা হয়েছিল যে এইভাবে কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দল বিপুল জয়লাভ করেছে। কিন্তু আসলে সে সময়ে দাশ সাহেব টাকা দিয়ে ভোট কিনতেন এবং এইভাবে তিনি কয়েকজন নির্দলীয় মুসলমান সদস্যের ভোট টাকা দিয়ে কিনে বাংলা সরকারকে ভোটে হারিয়েছিলেন। শোনা যায়, তিনি অনেক সময়ে ভয় দেখিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে ওই সকল নির্দলীয় সদস্যকে সরকার পক্ষে ভোটদানে বিরত থাকতে বাধ্য করতেন। এই সময়ে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল স্বরাজ্যদলের সদস্য হিসাবে কাউন্সিলের সভ্যপদ ত্যাগ করেন পরে

www.pathagar.com

পুনর্নির্বাচনে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে কাউন্সিলে প্রবেশ করেন।

চিত্তরঞ্জন দাশের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শ্রীসাতকড়িপতি রায় এই ব্যাপারে লিখেছেনঃ "বললেন দেশবন্ধু, কাউন্সিলে এসে কয়েকজন মুসলমানের জন্যে এত নোংরা ঘাঁটতে হয়েছে যে গা ঘিন্ ঘিন্ করে।" ('প্রণব', মাসিক পত্রিকা, পৌষ ১৩৭২, পৃঃ ৩৬৩)।

যদিও দেশকে দান করা তাঁর বসতবাটি তাঁর জীবিতকাল থেকেই আড়াই লক্ষাধিক টাকায় বন্ধক ছিল এবং দেশবাসী সেই আড়াই লক্ষ টাকার ঋণ পরিশোধ করে তবে তাঁর দান গ্রহণ করে তথাপি চিত্তরঞ্জন দাশের ব্যক্তিগত ত্যাগের দৃষ্টান্ত যে কোন দেশের পক্ষে বিরল দৃষ্টান্ত। দরিদ্রের দুঃখে তাঁর ভাবপ্রবণ মন সহজেই কাতর হোত একথাও সকলেই জানে। কিন্তু এখানে আমরা দেশে তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা আলোচনা করছি, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুর্লভ ত্যাগের দৃষ্টান্ত নিয়ে নয়। সেই 'non-co-operation from within' করতে গিয়ে এমন কাজ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে কেন করতে হয়েছিল যার জন্য গা ঘিন্ ঘিন্ করে একথা আমাদের মনে এক চিরন্তন প্রশ্ন হিসাবে থেকে যাবে।

১১

চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর স্বরাজ্য দল যে-কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য আন্দোলন করেছিল সে কাউন্সিল কাদের দ্বারা নির্বাচিত সে কথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে। আমাদের দেশের সেই নির্বাচক মণ্ডলী, সেই 'জনতা মহারাজ' সম্বন্ধে কার্ল মার্ক্স লিখেছেনঃ

"আমাদের ভুললে চলবে না যে এই সকল চিত্রবৎ গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি বাইরে থেকে দেখলে শান্তিপ্রিয় মনে হয় বটে কিন্তু তারাই ছিল প্রাচ্য নিষ্ঠুরতার সুসংবদ্ধ উৎসস্থল, তারা মানুষের মনকে যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বন্দী করে রাখতো এবং সেইভাবে তাকে কুসংস্কারের প্রতিরোধহীন যন্ত্রে পরিণত করতো; তাকে লোকাচারের দাসত্ববন্ধনে বন্দী করে রাখতো এবং তাকে সকল বিরাটত্ব ও ঐতিহাসিক প্রেরণা থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখতো। আমরা কখনই ভুলতে পারি না যে, আত্মকেন্দ্রিকতা যা একটি নগণ্য ভূমিখণ্ডের প্রতি আসক্ত থেকে কত সাম্রাজ্য-ধ্বংসের কত অকথ্য অত্যাচারের ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে.....আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না যে এই আত্মগৌরবহীন, চিরাবদ্ধ প্রগতিহীন নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির জীবন অন্যদিকে ঠিক বিপরীত ধর্মের বল্গাহীন, লক্ষ্যহীন ও সীমাহীন ধ্বংসের শক্তিকে

www.pathagar.com

উন্মুক্ত করে দিয়েছিল এবং এমন-কী নরহত্যাকে হিন্দুস্থানে এক ধর্মীয় প্রথায় পর্যবসিত করেছিল। আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না যে এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলি জাতিভেদপ্রথা ও ক্রীতদাসত্বের দ্বারা নিষিক্ত হয়েছিল। তারা মানুষকে প্রাকৃতিক ঘটনার নিয়ন্তা হবার পরিবর্তে তাকে প্রাকৃতিক ঘটনার দাসত্ব গ্রহণ করিয়েছিল, তারা একটি আত্মবিকাশরত সামাজিক সংগঠনকে অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক দৈবঘটনায় পরিবর্তত করিয়েছিল এবং এইভাবে এক হৃদয়হীন প্রকৃতিপূজার ধারা নিয়ে এসেছিল এবং স্বীয় অধঃপতন প্রদর্শনের জন্য প্রকৃতির নিয়ন্তা মানুষ, হনুমান নামক বানর ও সরলা নামক গাভীর প্রতি ভক্তিতে নতজানু হয়ে থাকতো।" (দি ফার্স্ট ওয়ার অফ ইনডিপেন্ডেন্স, পৃঃ ২০)

যদিও মার্ক্স একথা লিখেছিলেন ১৮৫৩ সালে তবুও ১৯২৩ সালে এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটার কোন কারণ ঘটেনি। কারণ, যেমন স্যার উইলিয়ম আইভর জেনিংস লিখেছেন, আমাদের দেশেঃ

"খুব ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সংগঠন যা বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তা স্বজন-পোষণতাহীন (দুর্নীতিহীনতার কথা বাদই দিলাম) ও পক্ষপাতিত্বহীন এক নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা চরমভাবে কঠিন ক'রে তুলেছে। যতদিন স্বজাতীয়ের মধ্যে বিবাহ প্রথা রহিত না হচ্ছে ততদিন এই সকল বিপত্তির অবসান হবে না বলেই মনে হয় কারণ বিবাহের প্রথা থেকেই বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর উৎপত্তি।" (কমনওয়েলথ ইন এশিয়া, পৃঃ ১০৬)

অতএব কাউন্সিল প্রবেশের পথ দিয়ে nepotism, favouritism এবং corruption যে আরও কায়েম হয়ে বসবে এবং নেতারাও যে তারই পৃষ্ঠ-পোষকতা করতে বাধ্য হবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

স্বরাজ্য দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের কার্যকলাপের সমালোচনা ক'রে ১৯২৪-এর ২১শে জুলাই বিলেতে হাউস অফ লর্ডস্-এ শ্রমিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় ভারত সচিব লর্ড অলিভিয়ার বলেছিলেনঃ

".....In the Bengal Council the Swaraj party of Mr. (C. R.) Das not being able to lead or procure a majority of votes for the purpose of embarrassing the Government organised the purchase for cash of the requisite balance of votes or of abstentions to enable them to win the narrow division which they did. This fact is notorious."

.....বাঙলা কাউন্সিলে মিঃ (সি. আর.) দাশের স্বরাজ দল গভর্ণমেণ্টকে বিপন্ন করবার জন্য গরিষ্ঠ ভোট করায়ত্ত বা সংগ্রহ করতে সক্ষম

www.pathagar.com

না হওয়ায় প্রয়োজনীয় বাকি ভোট নগদ টাকা দিয়ে কিনবার ব্যবস্থা করেছিল যাতে ভোটাভুটিতে খুবই অল্প ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছিল। এই ঘটনাটি সর্বজনবিদিত।"

এর উত্তরে দাশ সাহেব বলেছিলেন যে লর্ড অলিভিয়ার যদি হাউস অফ লর্ডসের বাইরে এসে ওসব কথা বলতেন তাহলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। তখন দাশ সাহেবকে জবাব দেবার জন্য লর্ড অলিভিয়ার ২৫শে জানুয়ারী ১৯২৫ এর দি স্টেটসম্যানে লিখলেনঃ

"দুর্ভাগ্যবশতঃ এর চেয়ে বেশি নিশ্চয়তা আর কিছুতে নেই যে, কোনো রাজনীতিক তার ভক্তদের দ্বারা স্তুতিবাক্যে ভূষিত অথচ তাঁর রাজনৈতিক বিপক্ষ দলের নিকট প্রচণ্ডভাবে নীতিহীন এবং মিঃ (সি. আর.) দাশ সম্বন্ধে আমি যা শুনেছি মুখবন্ধ দিয়ে তাই শুরু করে আমার বাকী বক্তব্যে আমি দেখাতে চেয়েছিলাম তিনি (মিঃ দাশ) শুধুমাত্র একজন নীতিহীন রাজনীতিকই নন্ পরন্তু কার্যকরী রাজনৈতিক পন্থাগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী।

"আমি যা বলেছিলাম তা এই যে, তাঁর দল বাঙলা কাউন্সিলে উৎকোচ এবং ভীতিপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিল বলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে রাজনীতিক হিসাবে মিঃ দাশ সম্বন্ধে নীতিগতভাবে বিশেষ নিন্দা ঘোষণার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ প্রথমতঃ সরকারীভাবে নৈতিক দিক থেকে রোষ প্রদর্শন স্পষ্টতঃ একেবারেই অচল, এবং দ্বিতীয়তঃ আমি যে দলের সঙ্গে যুক্ত আছি তাদের বরাবরের নীতি হচ্ছে এই ধরণের সকল বলপ্রয়োগমূলক পন্থাকে নস্যাৎ করে দেওয়া শুধুমাত্র নৈতিক স্খলনের জন্য ছাড়াও সেগুলির নির্বুদ্ধিতা ও অসারতার কারণেও।"

চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনীকার প্রখ্যাত সাংবাদিক পৃথ্বীশ চন্দ্র রায় 'লাইফ এণ্ড টাইমস অফ সি. আর. দাশ' বইতে লিখেছেনঃ

"এটা প্রকাশ্যেই বলা হতো যে, চিত্তরঞ্জন দাশ এমন একটি মানুষ যিনি যৌবনে ভোগাসক্ত ছিলেন, পয়সাকড়ি খরচের বেলায় খুব দরাজ ছিলেন এবং তাঁর রাজনৈতিক পন্থা একেবারেই নীতিবিগর্হিত ছিল কারণ তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, যাতে লক্ষ্য চরিতার্থ হতে পারে তার জন্য যে কোনো রকমের পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

.....চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক সততা এবং উদ্দেশ্যের একনিষ্ঠতা ততখানি স্বচ্ছ ছিল না যতটা ছিল মিঃ গান্ধীর।" (লাইফ এণ্ড টাইম্স্ অফ সি, আর, দাশ, পৃঃ ২৪১, পৃঃ ২৩৮)

বস্তুতঃ, 'ভিতরে বাইরে অসহযোগিতা' করার মহান নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ নিজেই ইংরেজ সরকারের সংগে সহযোগিতা করে কিভাবে বাংলায় মন্ত্রীত্ব

www.pathagar.com

গঠন করা যায় তার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পৃথ্বীশচন্দ্র রায় লিখেছেনঃ

"১৯২৫-এর এপ্রিলে লর্ড বার্কেনহেডের আমন্ত্রণে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন লর্ড রেডিং। কোনো ভুল সূত্রের খবর পেয়ে চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস করেছিলেন যে মুডিম্যান কমিটির সংখ্যালঘু সদস্যদের রিপোর্ট ভারত সচিব কর্তৃক যাতে গৃহীত হয় সেই ব্যবস্থা করবার জন্য বড়লাট লন্ডনে গেছেন। এবং আশা করেছিলেন যে লর্ড বার্কেনহেড ভারতে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সেই সম্বন্ধে কথা বলার জন্য তাঁকে ডেকে নেবেন। সেইজন্য ইংল্যান্ড থেকে এই ধরণের কোনো আহ্বান পাবার আশা তিনি করেছিলেন। কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর সঙ্গে আলোচনা না করে কোনো শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না বা যেতে পারে না। এই আহ্বান কখনও এসে পৌঁছায়নি এবং তিনি নিরতিশয় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এই আশাহতের বেদনা তাকে অসুস্থ করে তুলেছিল এবং তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যের মধ্যে তার বিধ্বস্ত স্নায়ু-গুলির পক্ষে এই আঘাত সহ্য করা বোধহয় আশাতিরিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"তাঁর মৃত্যুর দু সপ্তাহ আগে চিত্তরঞ্জন একদিন সকালে শহর থেকে দূরে আমার নিরালা কুটিরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কথাচ্ছলে আমার নিকট অকপটে স্বীকার করেছিলেন বার্কেনহেড রেডিং আলোচনা সম্বন্ধে তাঁর আশার কথা। আমার যতদূর মনে হয়, তিনি আমায় বুঝতে দিয়েছিলেন যে, যা তিনি আশা করেছেন সেইভাবে প্রতিশ্রুতি হলে তিনি মন্ত্রিত্ব গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং হস্তান্তরিত দপ্তরগুলি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিচালনা করবেন। সম্মানজনক মীমাংসা বলতে তিনি এমন কি মণ্টেগু আইন (১৯১৯ এর) অনুসারে শাসনকার্য চালাতে রাজি ছিলেন এই শর্তে যে, হস্তান্তরিত দপ্তরগুলির মন্ত্রীরা তাঁদের বিভাগগুলির প্রভু হয়ে কাজ করবেন এবং তাঁদের অর্থব্যয়ের স্বাধীন ক্ষমতা থাকবে ও শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয়ের পক্ষ থেকে কোনো হস্তক্ষেপের বিপদ থাকবে না। তিনি এইমতে কাজ করতেই সন্তুষ্ট হতেন কিন্তু তাঁর মনে মনে ছিল সংরক্ষিত দপ্তরগুলির মধ্যে পুলিশ বিভাগ ও কারা বিভাগ মন্ত্রীদের পরিচালনায় নিয়ে আসতে হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এইসব প্রশ্নগুলি দুঃস্বপ্নের মত তাঁর উপর চেপে বসেছিল এবং তিনি কোনো বিশ্রাম বা শান্তি পেতেন না।"

(লাইফ এন্ড টাইম্‌স্‌ অফ সি, আর, দাশ পৃঃ ২২২)

শ্রীসাতকড়িপতি রায় লিখেছেনঃ "মন্ত্রীত্ব গ্রহণের প্রস্তাবটি প্রথমে লর্ড বার্কেনহেডের নিকট থেকেই আসে। তখন প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য গান্ধীজী ও মতিলাল নেহরুর নিকট পাঠানো হয়। কিন্তু গান্ধীজী ওই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দিতে বলেন।" ('প্রণব', মাসিক পত্রিকা, মাঘ ১৩৭২, পৃঃ ৪০৫)। কিন্তু এ ধরণের কোনো সংবাদ জাতীয় কংগ্রেসের

www.pathagar.com

ইতিহাস বা জওহরলালের আত্মজীবনীতে উল্লেখ করা নেই। এতবড় একটা সংবাদের ইতিহাসে কোন উল্লেখ থাকবে না এটা অসম্ভব বলে মনে হয়।

বরং, জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে পট্টভি সীতারামাইয়া লিখেছেনঃ

"১৯২৫ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভায় সি, আর, দাশ নিম্নলিখিত শর্তগুলিকে সরকারের সঙ্গে মীমাংসার সূত্র হিসাবে উত্থাপিত করেছিলেন। (১) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি-দান (২) অদূর ভবিষ্যতে কমনওয়েলথের ভিতরে আমাদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পূর্ণ অধিকার সর্বতোভাবে স্বীকৃত হবার প্রতিশ্রুতি এবং যতদিন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা না হচ্ছে তার প্রতিষ্ঠার জন্য অবিলম্বে সুনিশ্চিত ও ব্যাপক প্রস্তুতির আয়োজন। (৩) আমাদের পথ থেকে আমরাও প্রতিশ্রুতি দেব যে বাক্য, কার্য্য এবং ইঙ্গিতে আমরা বিপ্লবীদের প্রচারকার্যকে উৎসাহিত করবো না। আমরা সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা দিয়ে এই ধরণের আন্দোলন যাতে আর না হয় তাই করবো।"

(হিস্টরী অফ দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস। পৃঃ ২৮০-২)

লর্ড বার্কেনহেড এক সময়ে চিত্তরঞ্জন দাশকে Evil Genius of India বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁকেই মন্ত্রীত্ব গ্রহণের প্রস্তাব পাঠানো লর্ড বার্কেনহেডের পক্ষে কতখানি সম্ভব সেটা ভুললে চলবে না। অবশ্য, সাম্রাজ্য-বাদী রাজনীতিকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব ছিল না। তবু, মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সম্ভাবনা জানিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশই প্রথমে লর্ড বার্কেনহেডকে চিঠি লেখেন—এইটাই সত্য বলে মনে হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ ও লর্ড বার্কেনহেডের পত্র বিনিময়ের মূল নথিপত্র এখন ইণ্ডিয়া অফিসের রেকর্ড রুমে রাখা আছে। ইণ্ডিয়া অফিসের রেকর্ড রক্ষক এ সম্বন্ধে আমাকে লিখেছেনঃ

No. R.4235/63 November 25, 1963

Dear Sir,

I am writing in reply to your letter of the 29th October in which you enquire about correspondence between C. R. Das and Lord Birkenhead.

As far as original documents are concerned, we are bound by the British Public Records Act of 1958, which provides that only material more than fifty years old may be made available for consultation. Unfortunately, the correspondence you refer to would come under this ban.

In view of this difficulty, I have had a special search made to see if the letters have been published in any way. But we have I am afraid had no success.

www.pathagar.com

I am so sorry not to be able to help you in the matter.

Dr. B. Sasmal

Yours faithfully,

S. C. Sutton

"প্রিয় মহাশয়,

আপনার ২৯শে অক্টোবরের যে চিঠিতে আপনি সি, আর, দাশ এবং লর্ড বার্কেনহেডের মধ্যে পরস্পরকে লেখা চিঠিপত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন তার জবাবে এই চিঠি লিখছি।

মূল দলিল সম্বন্ধে বলতে গেলে, আমরা ব্রিটিশ পাবলিক রেকড্স এ্যাক্ট ১৯৫৮ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যার শর্ত অনুসারে আমরা কেবল সেই সকল কাগজ সাধারণের অবগতির জন্য উন্মুক্ত ক'রে দিতে পারি যেগুলি পঞ্চাশ বছরের বেশী পুরাতন। দুর্ভাগ্যবশতঃ, আপনি যে চিঠি পত্রাদির কথা বলেছেন তা এই আইনের বাধার মধ্যে পড়বে।

এই বিপত্তির কারণে, আমি বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ করেছিলাম দেখবার জন্যে যে, ঐ চিঠিগুলি অন্য কোথাও ছাপা হয়েছে কি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সে ব্যাপারে সফল হ'তে পারিনি।

আপনাকে এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারলাম না বলে আমি বিশেষ দুঃখিত।

ডঃ বি. শাসমল

আপনার বিশ্বস্ত

এস. সি. সাট্ন

দাশ সাহেবের সংগে বার্কেনহেডের পত্র-বিনিময়ের প্রমাণ উদ্ঘাটিত হলে নিশ্চয়ই জানা যাবে তিনি মন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তবে বার্কেনহেডের পুত্র রে বার্কেনহেডকে আমি চিঠি লিখে এই ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে লিখেছিলেন যে তাঁর লেখা তাঁর আত্মজীবনীতে যা আছে তার বাইরে কোনও চিঠিপত্রের কথা তিনি জানেন না।

কিন্তু সাতকড়ি বাবুর কথা যদি সত্যিও হয় তাহলে বলতে হবে গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু প্রভৃতি নেতা ও সহকর্মীদের সুস্পষ্ট অভিমত অমান্য করে তাঁদের অমতেই এবং জাতীয় দাবী অগ্রাহ্য করে চিত্তরঞ্জন দাশ লর্ড বার্কেনহেডের সংগে চিঠিপত্র চালিয়েছিলেন এবং মন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে লেওনার্ড শিফ লিখেছেনঃ

"There were rumours that Das was negotiating with the Government. He seems to have had great hopes of Lord Birkenhead and a pronouncement of his on India was awaited eagerly. But in June 1925, Das died." (The Present Condition of India. Published in 1939, P. 91)

www.pathagar.com

"কথা রটে গিয়েছিল যে (সি. আর.) দাশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে মীমাংসার আলোচনা চালাচ্ছেন। লর্ড বার্কেনহেডের উপর তাঁর এক বিরাট ভরসা ছিল এবং ভারত সম্বন্ধে বার্কেনহেডের একটি ঘোষণা সম্বন্ধে তিনি উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু ১৯২৫ এর জুনে দাশ পরলোকগমন করলেন।" (দি প্রেজেণ্ট কন্‌ডিশন অব ইণ্ডিয়া, ১৯৩৯ এ প্রকাশিত পৃঃ ৯১)

আসলে যতই জোর গলায় আমরা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও গঠনমূলক কর্মপন্থার সাফল্যের কথা বলি না কেন আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজের রচিত শাসন-ব্যবস্থার অংশীদার হয়ে ক্ষমতা দখলের জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলেন। এঁদেরই নেতা ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু। তাঁরা জানতেন পূর্ণ স্বাধীনতা না হোক্ যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজরা একদিন দেবেই। সেই ক্ষমতা-অর্পণের বেলায় পাছে নিজেরা বাদ পড়ে যান তাই আগে হতেই নিজেদের অংশ সম্বন্ধে পাকাপাকি ব্যবস্থা করে রাখতে চেয়েছিলেন। আর যাই হোক্, এর মধ্যে বৈপ্লবিক কিছুই ছিল না এবং একে স্বাধীনতার গৌরবময় সংগ্রাম বললে ভুল বলা হবে।

দাশ সাহেব বা মতিলাল নেহরুকে বুঝতে কষ্ট হয় না। কারণ একই অবস্থায় অন্য পাঁচজন সাধারণ রাজনৈতিক নেতা যা করতেন তাঁরাও তাই করেছিলেন। ক্ষমতা দখলই রাজনীতিকের প্রধান উদ্দেশ্য সে সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল টনটনে। কিন্তু বুঝতে পারি না গান্ধীজীকে। বুঝি না তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও দর্শনকে। যখন ভাবি গান্ধীজী নিজে কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব সমর্থন করে দাশ সাহেব ও মতিলাল নেহরুর সংগে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন এই শর্তে যে এঁরা এবং এঁদের স্বরাজ্য দল চরকা ও খাদি আন্দোলনের সহায়তা করবে, তখন গান্ধী, দাশ, নেহরু (মতিলাল) প্রভৃতি দেশের মহান্ নেতাদের সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য না করে পারা যায় না। দাশ ও নেহরু চরকা ও খাদি আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু উভয়-পক্ষই পরস্পরকে যা তাঁরা বিশ্বাস করতেন না তাই সমর্থন করতে রাজী করালেন একে অন্যের আদর্শকে গ্রহণ করবেন বলে। এই ধরণের রাজনৈতিক সুবিধাবাদ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মজ্জায় প্রবেশ করেছিল বলেই আজ রাজনৈতিক দিক থেকে আমরা দেউলিয়া।

কাউন্সিল প্রবেশের আন্দোলন সফল হবার মুখে গান্ধীজী যখন চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর সংগে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এই আন্দোলনকে পরোক্ষ সমর্থন জানালেন সেইদিনই বাস্তবিক পক্ষে গান্ধীজী তার অসহযোগ আন্দোলনের কবর রচনা করলেন। অবশ্য এটাই গান্ধীজীর জীবনে শেষ

www.pathagar.com

আত্মসমর্পণ নয়। বহু বৎসর পরে ভারত বিভাগের অব্যবহিত পূর্বেও গান্ধীজী এই রকম হঠাৎ আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, কাউন্সিল প্রবেশের আন্দোলন সফল হবার সংগে সংগে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটল। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা সত্যকার ত্যাগী ও সন্ন্যাসী সদৃশ তাঁদের প্রচেষ্টায় এবং পরবর্তীকালে গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার আদর্শকে যাঁরা নিষ্ঠার সংগে জীবনের ঐকান্তিক ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রভাবে সমগ্র দেশে যে-একটা মহিমময় আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল হঠাৎ একদিনের ঝড়ে দেশ থেকে সেই আবহাওয়া চিরদিনের জন্যে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্ব সম্বন্ধে আমাদের দেশে বহু প্রকারের কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু আরও অনেক কথা আছে যার সম্বন্ধে অনেকেই খবর রাখেন না।

আমরা জানি চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন দু-ছত্রের কবিতা, যা খুব বিখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু জানি না এই কবিতা লেখার ভিতরকার ইতিহাস। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এই চিঠি লেখেনঃ

"কল্যানীয়েষু, চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু উপলক্ষে আমার কলকাতায় যাওয়া উচিত বলে আমার মনে একটা আন্দোলন চল্‌ছে। যেমন আশুবাবুর মৃত্যু-ঘটনায় শোকপ্রকাশে দেশের লোকের সংগে আমাকে যোগ দিতে হয়েছিল এ ক্ষেত্রেও আমার তাই কর্তব্য কি না ভালো করে ভেবে দেখিস্। বিশেষতঃ চিত্তর সংগে বরাবরই আমার একটা বিরোধ ছিল—একথা কেউ যেন মনে না করে যে আমার মনে তার প্রতি একটুও প্রতিকূল ভাব আছে। আর কিছু নয় কলকাতায় গিয়ে ওদের বাড়িতে একবার দেখা করে আসা উচিত হবে বলে বোধ হচ্ছে। নিতান্তই যদি সভাসমিতিতে টানাটানি করে তাহলেও দু-চার কথা বলতে হবে। এ চিঠি পেয়েই আমাকে urgent তার যোগে তোদের পরামর্শ জানাস। প্রশান্তকেও এ সম্বন্ধে লিখছি। ইতি ৪ আষাঢ় ১৩৩২।" (চিঠিপত্র, ২য় ভাগ, পৃঃ ৭৯)

রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনকে কি চোখে দেখতেন তা প্রকাশ পেয়েছিল ১৯২২ সালে চিত্তরঞ্জনের কারামুক্তির সময়ে। ইংলণ্ডের যুবরাজের কলকাতা আগমন উপলক্ষ্যে হরতাল ডাকবার অপরাধে ছ-মাস কারাদণ্ড ভোগ করবার পর চিত্তরঞ্জন যখন মুক্তিলাভ করেন তখন বাংলায় কংগ্রেসের উদ্যোগে জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রকাশ্য সম্বর্দ্ধনা জানাবার ব্যবস্থা হয়। বাংলার কংগ্রেস-কর্তারা চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই সম্বর্দ্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করুন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জন দাশের সম্বর্দ্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করতে অস্বীকার

www.pathagar.com

করেন। বাংলার রাজনৈতিক কর্তা ব্যক্তিরা শেষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে অনুরোধ করেন যাতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে রাজি করিয়ে চিত্তরঞ্জনের সম্বর্ধনা সভায় সভাপতির পদ গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করেন। তথাপি রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের সম্বর্ধনা-সভায় যোগ দিতে রাজি হন নি। বেশ ধরাধরি করাতে তিনি কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে চলে যান।

১৯২৬-এর জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ ফ্রান্সে গিয়ে রোমঁ্যা রোলাঁর সংগে দেখা করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চিত্তরঞ্জনের হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে, আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘটের সময়ে ঐ অঞ্চলে কোন কোন কুলি-বস্তিতে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয়। রেলের ধর্মঘটের দরুণ ওই কুলিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার উপায় ছিল না বলে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে কয়েকদিনের জন্য রেল চালু করতে অনুরোধ করেন, যাতে ওই অসহায় কুলিদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ এই অনুরোধ সরাসরি অগ্রাহ্য করেন। অবশ্য, এমন কি গান্ধীজীও এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেন। ফলে অগণিত দরিদ্র কুলি বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। (Inde. রোমঁ্যা রোলাঁ। পৃঃ ১০৯)।

আমরা অনেকে বলি, আজ কংগ্রেস নেতাদের অধঃপতন হয়েছে কারণ তাঁরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ভুলে যাই, কামরাজ, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, চন্দ্রভানু গুপ্ত, বা বিজু পট্টনায়ক, এঁরা মানুষ হিসাবে বা নেতা হিসাবে খুবই সামান্য এবং সাধারণ স্তরের। এঁদের যেমন ভাল করবার ক্ষমতা নেই তেমনি এঁরা খারাপ করবারও ক্ষমতা রাখেন না। সমাজের ঢেউ হঠাৎ এঁদের উপরে তুলে দিয়েছিল—সমাজের ঢেউ এঁদের যেদিকে নিয়ে যায় এঁরা সেইদিকে যেতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু যাঁরা আমাদের ভাল করতে পারতেন, যাঁরা সমাজের নেতৃত্ব করবার ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন—যেমন মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, জওহরলাল প্রভৃতি—এঁরাই প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষ-ভাবে দুর্নীতির সংগে বারে বারে এমনভাবে আপোষ করে গেছেন যে দুর্নীতিকে রাজনীতির একটা অংগ হিসাবেই ধরে নেওয়া হয়েছিল।

কলকাতা কর্পোরেশন স্বরাজ্য দলের সদস্যদের দ্বারা যখন অধিকৃত হলো এবং চিত্তরঞ্জন দাশ যখন কলকাতার প্রথম মেয়র হলেন তখন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি লিখেছিলেনঃ

"মিঃ সি. আর. দাশকে মেয়র হিসাবে নির্বাচিত করা এই নতুন পরিচালক-দের চরমতম ভ্রান্তি হয়েছিল। পক্ষপাতহীন দর্শকের কাছে এটা ক্ষমতা-মত্ততার উন্মাদনার ফল হিসাবে প্রতিভাত হবে। মিঃ সি. আর. দাশ তাঁর সমগ্র

www.pathagar.com

রাজনৈতিক জীবনে কখনও কোনো পৌরসভার ধারে কাছে ঘেঁসেননি। কিন্তু তাঁর দল ক্ষমতায় থাকার দরুন এবং তিনি তাদের নেতা হওয়ার দরুন তাঁকে মেয়রের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হলো যদিও তাঁর পৌরসেবার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতাও ছিল না। এই নির্বাচন কি অসংখ্য কলকাতা বাসীদের নিকট আরও অনুপযুক্ত ও অবৈধ হ'ত যদি মিঃ দাশ ছাড়া অন্য কাউকে নির্বাচিত করা হতো। এই নির্বাচনে মিঃ দাশের চেয়ে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন বহু অধিবাসীদের প্রতি অবিচার করা হয়নি কি?

যে প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনীতিকে বিসর্জন দেবার কথা মিঃ দাশ নিজেই ঘোষণা করেছেন সেখানে উচ্চপদে নিয়োগের পদ্ধতি কি ন্যায়বিচার না দলীয় সংকীর্ণতা দিয়ে স্থিরকৃত হবে?

মিউনিসিপ্যাল আইন করপোরেশনের সভাপতির কার্যাবলী চিফ একজিকিউটিভ অফিসারের কাজ থেকে পৃথক ক'রে দেওয়া হয়েছে। মিঃ দাশ কার্যকরীভাবে উভয় পদের সংযুক্তি করে দিয়েছেন।" (এ নেশন ইন মেকিং, পৃঃ ৩৬৩-৪)

কলকাতা কর্পোরেশনের নামে অনেকেই এখন নানারকম অভিযোগ করেন। কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের সম্বন্ধে নানারকম টিকা-টিপ্পনী করা হয় আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদী পত্রিকায় এবং এমনকি স্টেটসম্যানের মত পত্রিকায়ও! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বা সুভাষচন্দ্র বসুর আমলেও কলকাতা কর্পোরেশনের অবস্থা কি এখনকার চেয়ে খুব বেশী আলাদা ছিল? কর্পোরেশনে ঘুষের রাজত্ব চিত্তরঞ্জন দাশের আমল থেকেই শুরু হয়। তবে চিত্তরঞ্জনের খ্যাতির জ্যোতিতে এ-ব্যাপারটা ঢাকা পড়েছিল। এখন চিত্তরঞ্জন দাশের বদলে চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জির খ্যাতি দিয়ে আর এই কেলেঙ্কারীকে ঢেকে রাখবার উপায় নেই। বরং বলবো, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতির আমলে প্রকাশ্যভাবে কেউ কর্পোরেশনের সমালোচনা করতো না, যদিও সকলেই জানতো কর্পোরেশন বস্তুটি কি; এবং এখন তবু কিছু কিছু লোক এর সমালোচনা করতে অস্বীকার করে না।

এমন কি স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু একবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কর্পোরেশনের স্তূপীকৃত জঞ্জাল (augean stable) সাফ করে পরিষ্কার করে দেবেন। বোধ হয় সেই কারণেই কর্পোরেশনের ক্ষমতা হাতে রাখবার জন্যে তিনি শেষকালে মুসলিম লীগের এম এ এইচ ইস্পাহানীর সংগেও একবার জোট বেঁধেছিলেন। কিন্তু কর্পোরেশনের augean stable আজও পর্যন্ত সাফ করা আর হয়ে ওঠেনি।

কংগ্রেসীরা শাসন ক্ষমতা হাতে পেলে কেমনভাবে দেশ গঠন করবেন তার

www.pathagar.com

সবচেয়ে জ্বলন্ত প্রমাণ তাঁরা বহুদিন আগেই দিয়েছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনে। এবং সে ব্যাপারে শুধু বর্তমান নেতাদের দায়ী করলেই চলবে না, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি বিখ্যাত নেতাদেরও সেই দায়িত্বের অংশীদার করতে হবে।

১২

গান্ধীজী যখন কংগ্রেসের চার আনার সদস্যপদ ত্যাগ করলেন তখন অন্যান্য কারণের সংগে একটা কারণ দেখিয়েছিলেন যে কংগ্রেসে ভুয়া সদস্যের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু এই ভুয়া সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য গান্ধীজী সক্রিয়ভাবে কোন দিন কিছুই করেন নি। তাঁরই নির্দেশে তাঁর শিষ্যেরা যখন গাঁও-কা-কংগ্রেসের প্রহসন আরম্ভ করলেন তখন গান্ধীজী লিখেছিলেনঃ

"সাড়ে সাত লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছিল (কংগ্রেস) নগর তৈরি করতে।... যেখানে খাদির আদর্শকে পূর্ণ করবার সচেতন প্রচেষ্টা থাকে সেখানে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা খরচের কোনো অবকাশ থাকে না। আমি বহুবার বলেছি যে একটি গ্রাম্য অধিবেশন সম্পন্ন করবার খরচ সর্বমোট পাঁচ হাজার টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। এই ধারণাটি এখনও মন থেকে চলে যায়নি। ইলেকট্রিক আলোর সাজসজ্জা ও গ্রাম্যজীবনের মানসিকতা একসঙ্গে চলতে পারে না।" (হরিজন ২৬.২.১৯৩৭)

কিন্তু কংগ্রেস অধিবেশনের সাজ সজ্জায় টাকার ছড়াছড়ি দিন দিন বেড়েই গেছে, গান্ধীজী এর জন্য কার্যকরী কিছুই করেন নি।

গান্ধীজী ও তাঁর শিষ্যেরা মদ্যপান-বর্জন আন্দোলনের উদ্যোক্তা। কিন্তু গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ ভারত বিখ্যাত বাঙালী ও অবাঙালী নেতাদের মধ্যে অনেকেই মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন। অর্থাৎ, গান্ধীজী দেশের সাধারণ কংগ্রেস কর্মীর নিকট থেকে যে ধরণের নিষ্ঠা পবিত্রতা ও আদর্শপ্রিয়তা আশা করতেন তাঁর চার পাশের বড় বড় নেতাদের বেলায় ঠিক ততটা কড়াকড়ি ছিল না। চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর সংগে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং কাউন্সিল প্রবেশের আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে গান্ধীজী এই সাদা সত্য কথাটাকেই প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃতি দিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরুর কাউন্সিল প্রবেশের আন্দোলন দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে এতখানি কলুষিত ও বিষাক্ত করে দিয়ে গেছে যে আজ পর্যন্ত আমরা এই কলুষিত ও বিষাক্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারিনি। দেশে যদি সমাজ-

www.pathagar.com

বিপ্লব (রাজনৈতিক বিপ্লব নয়) সংঘটিত না হয় বা আরেক বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দ যদি জন্মগ্রহণ না করেন তাহলে এই কলুষিত রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারে বোধ হয় এমন কেউ আমাদের দেশে বিদ্যমান নেই। গান্ধীজী এই কাউন্সিল প্রবেশ আন্দোলনে পরোক্ষ সমর্থন জানিয়েছিলেন, সেই কারণে দেশে দুর্নীতিপূর্ণ রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টিতে তাঁরও পরোক্ষ দায়িত্ব আছে।

দেশে 'সত্যকার' প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হ'ত তার প্রধান দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করবো সুরেন্দ্র নাথ বানার্জর সংগে বিধান রায়ের নির্বাচন যুদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে বিধান রায় সম্বন্ধে একটু বলে নেওয়া ভালো। ইনি ১৯২৬ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও ছিলেন না। ১৯২৭ সালে কংগ্রেসে যোগদান করে ইনি তিন বছরের মধ্যেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হয়ে পড়লেন। অবশ্য দাশ পরিবার ও নেহরু পরিবারে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে ইনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হবার যোগ্যতা আগেই অর্জন করেছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য থাকা কালে ইনি একবার গ্রেপ্তার হন। সেই ভয়ে ১৯৩৩ সালের কলকাতার বিশেষ কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হতে অনুরোধ করা হলে, ইনি তখন বে-আইনি বলে ঘোষিত কংগ্রেসের সভ্য হতে পারবেন না বলে কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হতে অস্বীকার করেন। তবুও এঁকে ১৯৩৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচন করা হয়। কিন্তু বছর শেষ না হতেই তাঁর চিকিৎসা ব্যবসায়ে ক্ষতি হচ্ছে বলে তিনি বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। ইনি প্রতিভাবান চিকিৎসক ছিলেন বটে কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রে বা বিজ্ঞানে এঁর মৌলিক কোন অবদান নেই—এঁর বেশীর ভাগ সময় কাটতো কর্পোরেশনের নোংরা রাজনীতি নিয়ে।

তবে এঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি—১৯৩২ সালে ইনি যখন মেয়র ছিলেন তখন কলকাতার ইংরেজ পুলিশ কমিশনারের হুকুমে ইনি কলকাতা কর্পোরেশন ভবন থেকে জাতীয় পতাকা টেনে নামিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে বিধান রায়ের প্রিয়বন্ধু জওহরলাল নেহরু লিখেছেনঃ

"প্রথমদিকে এই সময়ের মধ্যে একটা মাস আমি খুব ব্যথা পেয়েছিলাম। কারণটা হচ্ছে যে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি ও পৌরসভার দ্বারা আমাদের জাতীয় পতাকা টেনে নামানো বিশেষ করে কলকাতা কর্পোরেশন থেকে যেখানে কংগ্রেস সদস্যরাই সংখ্যাধিক ছিলেন বলে সকলে জানতো। পুলিস এবং গভর্ণমেণ্টের চাপেই পতাকা এনে নামাতে হয়েছিল যা অমান্য করলে কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছিল...ঐ পতাকা আমাদের নিকট যা কিছু

www.pathagar.com

প্রিয় তারই একটা নিদর্শন হয়ে উঠেছিল এবং এরই ছায়াতলে আমরা অনেক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছি যাতে আমরা এর মর্যাদা রক্ষা করতে পারি। সেই পতাকাকে নিজের হাতে টেনে নামানো বা নিজেরা নির্দেশ দিয়ে টেনে নামানোতে আমরা সেই প্রতিজ্ঞাই ভঙ্গ করেছি তা নয় একটা অপবিত্রতার কাজ করেছি। এটা হয়েছিল আত্মার আত্মসমর্পণ। যেন নিজের সত্তাকেই অস্বীকার করা, এবং বিরাটতর পশুশক্তির চাপে মিথ্যার প্রতিষ্ঠা। যারা এইভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল তারা সমগ্র জাতির নৈতিক শক্তিকে অধঃপতিত করেছিল এবং জাতির আত্মসম্মানকে আহত করেছিল। মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যরা জাতীয় স্বার্থের বিরোধী কিছু করতে আদিষ্ট হবার আগে পদত্যাগ করতে পারতেন।..... কাউকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা এই ন্যায্য পথ থেকে বিচ্যুতিকে হিসাবের মধ্যে আনবো না এবং ভবিষ্যতে যাতে জাতীয় তরণীর পরিচালন-চক্র এমন হাতে না পড়ে সেটা দেখবো না যে সেই অতীব প্রয়োজনের সময়ে কম্পমান ও নিথর হয়ে যায় কিনা। তবে এই ঘটনাকে উপযুক্ত ঘটনা বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা অধিকতর নিকৃষ্ট· অক্ষমতার চেয়েও এই ধরনের প্রচেষ্টা বিরাটতর অপরাধ।" (অটোবায়োগ্রাফি ৩৩৩-৪)

মেয়র হিসাবে জাতীয় পতাকা টেনে নামাবার জন্য জওহরলাল নেহরুর ভাষায় বিধানচন্দ্র রায় "lowered the morale of the nation and injured its self-respect." 'জাতির নৈতিক শক্তিকে অধঃপতিত করেছিল এবং আত্মসম্মান বোধকে করেছিল আহত' কিন্তু জাতি হিসাবে আমরা এতদূর অধঃপতিত যে এই লোকের স্মৃতির জন্য আমাদের দেশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছে অথচ রবীন্দ্রনাথের বসতবাটি যখন দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল তখন দেশের লোক কিছু করতে পারেনি।

জওহরলাল নেহরুর বন্ধু বা মহাত্মা গান্ধীর স্তাবক হতে পারলে যতই জাতীয় পতাকার অপমান করা হোক কিছু যায় আসে না। নেহরু সাহেব একবার পাটনায় বলেছিলেন যারা জাতীয় পতাকার অপমান করে তাদের গুলি করে মারা উচিত। কিন্তু তাঁরই বন্ধু জাতীয় পতাকার অপমানকারী বিধান রায় হয়েছেন 'ভারত-রত্ন'। এই ধরণের আদর্শের ভ্রষ্টাচার আমাদের দেশের সর্বোচ্চ স্তরের নেতারা বার বার করেছেন দেখেই ধীরে ধীরে দেশের ছাত্র ও যুবকদের মনে এক আদর্শহীনতার স্থায়ী লীলাক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। সেই নৈরাজ্যবাদী আদর্শহীনতা থেকে দেশের ছাত্র-যুবকদের কে রক্ষা করতে পারে?

যখন বিধান রায় সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নির্বাচনযুদ্ধে অবতীর্ণ হন তখন অবশ্য এঁর এত গুণাবলীর প্রকাশ হয় নি। এবং তখন তিনি স্বরাজ্য দলের বা কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও নির্বাচনে দাঁড়ান নি—দাঁড়িয়েছিলেন ব্যোমকেশ

www.pathagar.com

চক্রবর্তীর ন্যাশনালিস্ট দলের পক্ষ থেকে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ নিজে গিয়ে বিধান রায়ের নির্বাচনী সভায় তাঁর পক্ষে বক্তৃতা করেছিলেন এবং বিধান রায়কে স্বরাজ্যদলেরই বেনামী প্রার্থী হিসাবে মনে করা হতো। এই নির্বাচন-যুদ্ধে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেয় করবার জন্য একটি পতিতা-শ্রেণীর স্ত্রীলোককে যোগাড় করে সভায় সভায় সুরেন্দ্রনাথের তথাকথিত যৌন বিকৃতির সাক্ষী হিসাবে খাড়া করা হয়। এই জঘন্য উপায়ে 'জনতা মহারাজের' চিত্ত জয় করে বিধানচন্দ্র রায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে নির্বাচনে হারিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হেয় করতে গিয়ে আমাদের কংগ্রেসের নেতারা কতদূর নীচে নামতে পারেন এটা তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আজকাল একটা কথা উঠেছে—চরিত্র-হনন। কিন্তু এই চরিত্র-হননের আদর্শকে রূপায়িত করেছিলেন আমাদের দেশের প্রিয় নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ, বিধানচন্দ্র রায় ও তাঁদের অনুচরবর্গ।

১৩

বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে নাড়াজোলের জমিদার দেবেন্দ্রলাল খানের হাতে নির্বাচনে পরাজিত করানো কংগ্রেস তথা স্বরাজ্য দলের ঘৃণ্য রাজনীতির আর একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। এতে প্রমাণ হয় মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু প্রভৃতি দেশের বড় বড় নেতারা বড়লোক জমিদারদের কতখানি গোলাম ছিলেন।

১৯২৬ সালের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে উত্তর মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মনোনয়ন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত হয়।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ১১.১০.১৯২৬-এ বীরেন্দ্রনাথকে তারযোগে জানানঃ

"আপনার লম্বা টেলিগ্রাম পেয়েছি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বাঙলার প্রার্থীদের তালিকা গত আগষ্টেই চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেছে যাতে আপনি এবং মহেন্দ্র মাইতি আছেন। তারপরে তালিকায় কোনো পরিবর্তন সাধন করা হয়নি। আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির নিকট তার করে বিশদ জেনে নিচ্ছি। শ্রীনিবাসের (শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার) সংগে পরামর্শ করে আবার তার করে জানাবো। মতিলাল নেহরুর ঠিকানা এলাহাবাদ, সরোজিনীর (সরোজিনী নাইডু) প্যালেস, বোম্বাই।"

১২.১০.১৯২৬-এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার আবার তারযোগে জানানঃ

"ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচনের ব্যাপারে পণ্ডিতজী (মতিলাল নেহরু) ও

www.pathagar.com

আমার উপর সকল ভার দিয়েছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির জন্য আগামী-কাল পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে পণ্ডিতজীর নির্দেশের জন্য লিখব মনস্থ করেছি। ইতিমধ্যে আপনার ও মহেন্দ্র মাইতির নাম যে ইতিপূর্বেই অনুমোদিত হয়েছিল তার কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি। পরে আবার তার করব।"

এমন সময়ে নাড়াজোলের জমিদার বাহাদুর চাইলেন যে, উত্তর মেদিনী-পুরের কংগ্রেস-মনোনয়ন তাঁকেই দেওয়া হোক। বঙ্গীয় কংগ্রেস ইলেকশন বোর্ডের সুযোগ্য সম্পাদক বিধান রায় তাই দাবী করলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে উত্তর মেদিনীপুর নাড়াজোলের জমিদারের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। অবশ্য বিধান রায় যুক্তি দেখালেন যে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জিলা কংগ্রেস কমিটির মনোনীত প্রার্থী বটে কিন্তু তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করেন নি তাই তাঁকে কংগ্রেস মনোনয়ন দেওয়া যাবে না।

ঠিক এমনটি একবার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বেলায়ও হয়েছিল। ১৯৩১ সালের কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে তিনি মধ্য কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির মনোনীত প্রার্থী হিসাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করতে অস্বীকার করেন। তখনও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল কিন্তু বীরেন্দ্র নাথ শাসমলের সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করা হয়নি। বোধহয়, সেবারে ভালো জমিদার পাওয়া যায়নি।

যাইহোক্, নাড়াজোলের জমিদার বাহাদুর যখন কাউন্সিলে দাঁড়াতে চেয়েছেন তখন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে সরে দাঁড়াতেই হবে। অবশেষে ১৮.১২.১৯২৬ তারিখে রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার তার করে জানালেন বীরেন্দ্রনাথকেঃ

"পণ্ডিতজী তার করেছেন 'এই পর্যায়ে মেদিনীপুরের বিষয় নিয়ে কোনো হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক।' আমি আবার কিরণকে (কিরণশঙ্কর রায়) তার করেছি আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে মীমাংসা করুক।"

মতিলাল নেহরুর নির্দেশে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বীরেন্দ্রনাথকে চূড়ান্তভাবে দেওয়া মনোনয়ন কেটে দিয়ে অর্দ্ধ-শিক্ষিত কিন্তু জমিদার দেবেন্দ্রলাল খানকেই কংগ্রেসের মনোনয়ন দিলেন। বলা বাহুল এতে নেহরু পরিবারের বিশ্বস্ত বন্ধু বিধান রায়ের হাত ছিল অনেকখানি। তখন নির্বাচন যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সংগে দেবেন্দ্রলাল খানের। এক-দিকে বীরেন্দ্রনাথ, বাংলার প্রথম অসহযোগী ব্যারিষ্টার, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যতম প্রধান সৈনিক হিসাবে তখন তিনি সর্বস্বান্ত, নিঃস্ব। অন্যদিকে প্রতাপশালী ধনী জমিদার, নেহরু পরিবারে বন্ধু বিধান রায়ের পৃষ্ঠপোষক নাড়াজোলের জমিদার বাহাদুর দেবেন্দ্রলাল খান।

www.pathagar.com

বীরেন্দ্রনাথ যখন মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন তখন বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন মেদিনীপুর সফরে গেলে বীরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যে-গভর্নরের শাসন ব্যবস্থায় তিনি ও তাঁর দেশের বহুলোক দেশকে ভালো-বাসার অপরাধে কারাগারে বন্দী হয়েছেন সেই গভর্নরকে তিনি অভ্যর্থনা জানাতে পারবেন না। মেয়র হিসাবে এমন কি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তও বাংলার গভর্নরের অভ্যর্থনা করেছেন। কিন্তু জাতীয় অপমানের প্রত্যুত্তরে মেদিনীপুর জেলা বোর্ড থেকেও গভর্নরের অভ্যর্থনার জন্য বীরেন্দ্রনাথ এক পয়সাও খরচ মঞ্জুর করেন নি। জাতির সম্মানরক্ষার তাগিদে বীরেন্দ্রনাথ যাকে অভ্যর্থনা করতে অস্বীকার করেন জমিদার দেবেন্দ্রলাল খান সেই গভর্নরকে নিজের প্রাসাদে ডেকে নিয়ে গিয়ে রাজোচিত সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন।

মেদিনীপুরের ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গভর্নরের অভ্যর্থনার ব্যাপারে বীরেন্দ্রনাথকে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ করে চিঠি দিলে জবাবে বীরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেনঃ "আপনার প্রয়োজন হলে আমার অফিসে এসে দেখা করবেন।" জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান মাত্র হয়ে তিনি যে বাংলার গভর্নরকে অভ্যর্থনা জানাতে অস্বীকার করেছিলেন সেই অপরাধে পরের বার ১৯২৬ সালে তিনি আবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে বাংলা সরকার তাঁর নির্বাচন অনুমোদন না করে নাকচ করে দেন। বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের গণতান্ত্রিক নির্বাচন নাকচ করে দেবার পর তখনকার বাংলা সরকার নাড়াজোলের জমিদার দেবেন্দ্রলাল খানকে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনীত করেন এবং নাড়াজোলের এই জমিদার বাহাদুর বাংলা সরকারের হুকুমে অবলীলাক্রমে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ অধিকার করেন এবং কার্য পরিচালনা করেন। এ কথা সত্য যে, দেবেন্দ্রলালের পিতা নরেন্দ্রলাল খান দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগে পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার দরুণ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রলাল খান বাংলা কাউন্সিলে নির্বাচিত হবার পর থেকেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করে বহুবার সরকার পক্ষে ভোট দিয়ে কংগ্রেসের বা স্বরাজ্যদলের বহু প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সে সম্বন্ধে বিস্তারিত এর আগে বলেছি। এর মধ্যে সর্বপ্রধান হোল ইংরাজের কারাগারে বন্দী বাংলার সকল বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের মুক্তির দাবীতে কংগ্রেসের (স্বরাজ্য দলের) ও ন্যাশনালিস্ট দলের দুটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তিনি সরকার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এই সময়ের কিছু পরে সুভাষচন্দ্র বসু সুদূর মান্দালয়ে ইংরেজের কারাগারে নির্বাসিত হন। কাজেই ওই দুটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে তিনি কার্যত সুভাষচন্দ্র বসুরও কারামুক্তির প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছিলেন।

www.pathagar.com

অথচ এই জমিদার বাহাদুরের সেবায় আসবার জন্যে কংগ্রেস নেতা ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা দল বেঁধে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বিরুদ্ধে নাড়াজোলের জমিদারের পক্ষে নির্বাচন সমরে অবতীর্ণ হলেন—যে জমিদার বাহাদুর মাত্র দু-বছর আগে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কারামুক্তির দাবীর বিরোধিতা করে সরকার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সংস্থা কংগ্রেস কর্মী সংঘের সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস (সর্বোদয়ের আচার্য) নির্বাচন অভিযানের অধিনায়ক হলেন।

তখন, মহাত্মা গান্ধীর তপঃসিদ্ধ শিষ্যদের সত্য ও অহিংসার আদর্শের পবিত্রতায়, অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যে, বাংলার সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির প্রচার যন্ত্রের যাদু-মন্ত্রে জমিদার দেবেন্দ্রলাল খানের ইংরেজের পদলেহনের ইতিহাস সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যান্য বিপ্লবীদের কারামুক্তির বিরোধিতা করার ইতিহাস মিথ্যা হয়ে গেল। গান্ধী শিষ্যদের তপস্যার প্রভাবে বরং প্রমাণ হয়ে গেল বীরেন্দ্রনাথ শাসমলই সুভাষচন্দ্র বসুকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। দরিদ্রের বন্ধু মহাত্মা গান্ধীর উত্তরাধিকারী জওহরলাল নেহরুদের পরিবারও দেবেন্দ্রলাল খানের মধ্যে এক নতুন বন্ধু খুঁজে পেলেন।

অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের নেতা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুরে প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করলেন যে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলই সুভাষচন্দ্র বসুকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য, এর একটু নোংরা ইতিহাস আছে। বিনা বেতনে পাঁচশ টাকা মাসোহারা নিয়ে বীরেন্দ্রনাথ কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার পদের প্রার্থী ছিলেন। মেয়র চিত্তরঞ্জন দাশ প্রথমে তাঁকেই ঐ পদে নিযুক্ত করবেন বলে স্থির করেন· দাশ সাহেব তাঁকে সমর্থন করবেন না বললে তিনি ঐ পদের প্রার্থী হতেন না। অবশ্য এ সম্বন্ধে শ্রীসাতকড়িপতি রায় 'প্রণব' মাসিক পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বহু মিথ্যা কথা লিখেছেন। কংগ্রেসী ও প্রচ্ছন্ন কংগ্রেসীরা নিজেদের স্বার্থে যে কতদূর হীন ও মিথ্যাবাদী হতে পারেন সাতকড়িবাবুর লেখা তার একটি প্রমাণ।

দাশ সাহেব যে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকেই প্রথমে চিফ একজিকিউটিভ অফিসারের পদে মনোনীত করেছিলেন একথা ছাপার অক্ষরে লেখা আছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তৎকালীন একান্ত সচিব হেমন্তকুমার সরকার দেশবন্ধু স্মৃতি' বইতে লিখেছেনঃ

"সেবার নদীয়া জেলার ভেড়ামারা গ্রামে নদীয়া জেলা প্রজা সম্মেলনের অধিবেশন ছিল। আমি সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলাম। স্বয়ং দেশবন্ধু সে-সভাতে উপস্থিত হওয়াতে বিস্তর জন-সমাগম হইয়াছিল। ভেড়ামারায়

www.pathagar.com

যেখানে দেশবন্ধু ছিলেন, মিঃ এ. সি. ব্যানার্জি'ও (অশ্বিনী ব্যানার্জি) সেই-খানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কথায় কথায় বুঝা গেল, মিঃ ব্যানার্জি কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসারের পদপ্রার্থী হইয়া এই সুযোগে রথ-দেখা কলা-বেচা দুই-ই করিতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে আসি-বার আগে শ্রীযুক্ত বীরেন শাসমল আমাকে বলিয়াছিলেন যে কর্পোরেশনের ঐ পদে দেশবন্ধু যদি তাঁহাকে মনোনীত করেন তাহা হইলে তিনি মাসিক পাঁচশত টাকা মাত্র অ্যালাউয়েন্স্ লইয়া কাজ করিতে রাজী আছেন। মিঃ ব্যানার্জির প্রস্তাবের পর সুযোগ বুঝিয়া আমি শ্রীযুক্ত শাসমলের কথা জানাইলাম। দেশবন্ধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন বীরেন দরখাস্ত করলে আমি বাঁচি। হরিধন দত্ত, অশ্বিনী বাঁড়ুয্যে ও জে. সি. মুখার্জি তিন জনে ধরেছে। বীরেনের নাম প্রস্তাব হলে এদের আমি সাফ জবাব দিতে পারি। ভেড়ামারা হইতে ফিরিয়া আমি শ্রীযুক্ত শাসমলকে দেশবন্ধুর মনো-ভাব জানাইলাম।

"কিন্তু এই কথা প্রচার হইবা মাত্র কলকাতায় দলের মধ্যে ভীষণ ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়া গেল। 'মেদিনীপুরের ক্যাওট' এসে কলকাতায় রাজত্ব করবে?—একথাটাও দলের একজন পান্ডার মুখে শোনা গেল। শাসমলকে হটাইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকে নানা ফিকিরে খাড়া করা হইল। পার্টিতে ভোটের সময়ে শাসমলের নাম টিকিল না।" (পৃঃ ৫০)

১লা আষাঢ়, ১৩৪৬ তারিখের দৈনিক মাতৃভূমি (বিধান পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহরায় তখন এর সম্পাদক ছিলেন) পত্রিকায় হেমন্ত-কুমার সরকার আবার লিখেছেনঃ

"অসহযোগের বন্যায় যখন দেশ ভেসে গেছে, দেশবন্ধুর পর জাতীয় আন্দোলনের তরীর কর্ণধার কে হবে, সে সম্বন্ধে সকলেই নিশ্চিন্ত ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে মনে করে। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের দ্বারা দেশের সে আশা পূর্ণ হয়নি—কয়েকটি কারণে। তিনি যখন কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার হতে চাইলেন মাসিক ৫০০/ টাকা ভাতায়, তখন দলের কয়েকজন 'মেদিনীপুরের কৈবর্ত' এসে কলকাতায় রাজত্ব করবে ভেবে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে সুভাষচন্দ্রকে খাড়া করাতে শাসমলের মনে দারুণ আঘাত লাগে। শাসমল পদের জন্য লোভী ছিলেন না, কিন্তু তিনি যেভাবে মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাজ চালিয়েছিলেন এবং ঐ জেলা থেকে ইউনিয়ন বোর্ড উঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সেই কৃতিত্বের পুরস্কার-স্বরূপ কর্পোরেশনের ভার দেওয়াটা দলের খুবই উচিত ছিল।"

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬-এর দৈনিক মাতৃভূমি পত্রিকায় হেমন্তকুমার সরকার আরও লিখেছেনঃ

www.pathagar.com

"কিন্তু কি কুক্ষণে বিবাদ বাধিল—কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসারের পদ লইয়া। শাসমল মাসিক ৫০০/ টাকা ভাতায় ঐ পদ গ্রহণে রাজি ছিলেন—দেশবন্ধুর তাহাতে সম্মতি ছিল। কিন্তু অভিজাত দলের চক্রান্তে শাসমলের তথা দেশবন্ধুর অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। সে তিক্ত স্মৃতির কথা আজ আলোচনা করিব না। অভিমানী শাসমল সেই হইতেই যেন ক্রমশঃ দূরে সরিয়া গেলেন।"

এ বিষয়ে বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বীরেন্দ্রনাথকে ১৯.৯.১৯২৪ তারিখে লিখেছিলেনঃ

"আপনার Public Life হইতে বিদায় গ্রহণ দেশের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্য। তবে একথাও বলি স্বরাজ্য দল যেরূপ নৈতিক দুর্নীতি ও ব্যভিচার বলে দল পাকাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে কোনও আত্মসম্মান জ্ঞানবিশিষ্ট লোক ইহার মধ্যে থাকিতে পারে না।"

কলকাতার অভিজাত কংগ্রেসীরা ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা 'মেদিনীপুরের ক্যাওট' অর্থাৎ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে কর্পোরেশনের চিফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসারের পদে বসাতে প্রকাশ্যভাবে আপত্তি জানান। এদের দাবীতে দাশ সাহেব নিজের মত পরিবর্তন করে শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে মনোনীত করেন এবং তিনি ঐ পদে নির্বাচিত হন। তাঁর বেতন হয় মাসে ১৫০০ টাকা। তারপর সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হ'লে অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা রটনা করেছিলেন যে, বীরেন শাসমলই চিফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার হতে পারেন নি বলে প্রতিহিংসায় সুভাষ বসুকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সংগঠন 'কংগ্রেসকর্মী সংঘ' একবার ছাপানো ইস্তাহারেও প্রচ্ছন্নভাবে এই ইংগিত করেছিল। (সুধাকৃষ্ণ বাগচির লেখা 'দেশবন্ধু স্মৃতি'তে এই ছাপানো ইস্তাহার ছাপা আছে)।

হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঐ সব প্রবক্তারা যেমন মুসলমানদের তেমনই একজন অনুচ্চ বর্ণের হিন্দুকে উচ্চ পদে বসবার সম্মান দেবার স্বভাবতই বিরোধী ছিলেন। এদের মুখপাত্র ছিলেন, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। ১৯৩০ সালে প্রায় ৩০০ টাকার এক বিতর্কমূলক দাবীতে এই নির্মলচন্দ্র চন্দ্র বীরেন্দ্রনাথের নামে ব্যক্তিগত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার করে তাঁকে সিভিল জেলে পাঠিয়েছিলেন। ভাগ্যবশতঃ তখন কংগ্রেসী সরকার ছিল না, তাই আলিপুরের মুন্সেফ মাত্র তিনশ টাকার জন্য বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের কারাবাসের হুকুম দিতে অস্বীকার করেন। তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু কারাবাস হয়নি। বিধান পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহরায় সম্পাদিত তখনকার দৈনিক নায়ক পত্রিকায় এর পূর্ণ বিবরণ ছাপা আছে।

www.pathagar.com

শ্রীসাতকড়িপতি রায় 'প্রণব' মাসিক পত্রিকায় দেখাতে চেয়েছেন যে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল চিফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসারের পদের লোভে চিত্তরঞ্জন দাশের সংগে ভিড়েছিলেন। সেই পদটি না পাওয়াতে তিনি চিত্তরঞ্জন দাশ ও কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করেন। এই সব প্রচ্ছন্ন কংগ্রেসীরা নিজেদের স্বার্থে মিথ্যা কাহিনী রচনা দ্বারা ইতিহাসকে বিকৃত করতে দ্বিধা করে না। মানুষ হিসাবে এদের সামান্যতম ন্যায়নিষ্ঠা নেই এবং রাজনীতির জন্য এমন কোনও হীন কাজ নেই যা এরা করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল যে, স্বরাজ্য দলের সভায় চিফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসারের পদে সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করেছিলেন রায়বাহাদুর রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নাম প্রস্তাব করেন প্রখ্যাত আইনজীবি সৈয়দ নাসিম আলি (পরে কলকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যার সৈয়দ নাসিম আলি)। হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিজয় ঘোষণার তাগিদে বড়লোক জমিদার, সরকারী তাঁবেদার রায়বাহাদুর এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী ও কংগ্রেসীরা এক সংগে হাত মিলিয়ে এক দুর্ভেদ্য শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। জমিদার, সরকারি তাঁবেদার ও বিপ্লবীদের এই অটুট সংমিশ্রণ আরও একবার দেশের দরিদ্র কৃষকদের স্বার্থকে নির্মমভাবে বলি দিয়েছিল তার খবর পরের অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

যাই হোক্‌, সেবারে এইভাবে জনতা মহারাজের চিত্ত জয় করে কংগ্রেস বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে নাড়াজোলের জমিদারের কাছে ভোটযুদ্ধে হারিয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে তখনকার মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভ্যদের আচরণ উল্লেখ না করলে ঠিক হবে না। সেই নির্বাচনে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির চূড়ান্ত মনোনয়ন লাভ করেছিলেন। কিন্তু জমিদারের 'মাণি ব্যাগের' প্রভাবে শেষ মুহূর্তে কংগ্রেস যখন বীরেন্দ্রনাথের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নাড়াজোলের দেবেন্দ্রলাল খানকে প্রার্থী মনোনীত করেন তখন মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভ্যরাও রাতারাতি বীরেন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ করে নাড়াজোলের জমিদারকে সমর্থন করবার জন্যে নাড়াজোলের জমিদার বাহাদুরের প্রাসাদদুয়ারে গিয়ে জমা হলেন। অবশ্য এইটাই স্বাভাবিক ছিল।

গান্ধী, মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ যখন বড়লোক জমিদার ও মিল-মালিকদের গোলামি করে গেছেন এবং এদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি নিঃশব্দে পরিপাক করেছেন তখন নিঃস্ব, দেশসেবার তাগিদে সর্বস্বান্ত বীরেন শাসমলকে বাসিফুলের মত পরিত্যাগ করে মেদিনীপুর জেলার সাধারণ ও বেশীর ভাগ দরিদ্র কংগ্রেস কর্মীরা যে জমিদারের কৃপানজর থেকে পাছে বঞ্চিত হন সেই দুশ্চিন্তায় নাড়াজোলের জমিদারের প্রাসাদ দুয়ারে গিয়ে

www.pathagar.com

সারি দিয়ে দাঁড়াবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে মেদিনীপুরের কংগ্রেস কর্মীদের এতে লজ্জিত হবার দরকার নেই কারণ, যে প্রাসাদ দুয়ারে একদিন তাঁরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পদ-রজ-স্মৃতি-পূত নাড়াজোল-রাজের সেই গোপ প্রাসাদ বিধান রায়ের সরকার প্রভূত অর্থ দিয়ে কিনে নিয়ে এখন জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেছেন।

আমি জানি, মেদিনীপুরের কংগ্রেস কর্মীরা বলবেনঃ ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠান বড়। খুবই সত্য কথা, সকলেই তা স্বীকার করবেন। কিন্তু মেদিনীপুরের আদি অকৃত্রিম কংগ্রেস কর্মীরা বোধহয় জানতেন না যে তাঁদের অকুণ্ঠ অন্ধ আনুগত্যের ফলে কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানটি একদিন ফ্রাঙ্কেন-স্টাইন দৈত্যে পরিণত হবে। তাঁরা বোধহয় এও ভাবেন নি যে শুধু বীরেন্দ্রনাথ শাসমল নন, তাঁদেরই সৃষ্ট, কংগ্রেস নামক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন দৈত্যটি একদিন মেদিনীপুরের নিষ্ঠাবান কংগ্রেসীদের নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জিকেও অপমান করে বিদায় করে দেবে। মেদিনীপুরের যেসব খাঁটি কংগ্রেস কর্মীরা তখন প্রতিষ্ঠানের সম্মান রক্ষার জন্য বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ব্যক্তিগত লাঞ্ছনাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই অজয়কুমার মুখার্জি যে এতদিন পরে অপমানিত হয়ে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হলেন তা দেখে মনে হয় ন্যায় এবং ধর্ম আজও বিশ্বের সৃষ্টি চরাচর থেকে বিলুপ্ত হয় নি এবং ন্যায় এবং ধর্মবিচ্যুতির অভিশাপ প্রতিশোধের রূপ নিয়ে কখন কিভাবে কার্যকরী হবে আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা তা না বুঝতে পারলেও এই প্রতিশোধ অমোঘ পন্থায় কার্যকরী হয়।

মেদিনীপুরের অজয় মুখার্জিরা তখন এই মহান সত্যকে অস্বীকার করেছিলেন। বহুদিন পরে মেদিনীপুরের কংগ্রেস কর্মীদের হয়ে তাঁদের শীর্ষস্থানীয় শ্রীঅজয় মুখার্জিকে তার মূল্য দিতে হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ এবং তাঁদের প্রিয় শিষ্যরা বেশীর ভাগই ব্যক্তিগতভাবে অসাধু ছিলেন না। শ্রীঅজয় মুখার্জি প্রভৃতি নিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্মীরা কেউই ব্যক্তিগতভাবে অসাধু ছিলেন না। কিন্তু আমার এই লেখাগুলির মূল উদ্দেশ্য এইটা দেখানো যে তাঁরা প্রায় সকলেই আদর্শগত দিক দিয়ে অসাধু ছিলেন। অর্থাৎ যে আদর্শ তাঁরা দেশের অগণিত সাধারণের জন্য প্রচার করেছেন সেই আদর্শেরই তাঁরা নিজেরাই আপোষের দ্বারা অনেক অপহ্নব ঘটিয়েছেন। আমরা সব সময়ে বড় আদর্শে পৌঁছতে পারি না কিম্বা পৌঁছাবার ক্ষমতা রাখি না। কিন্তু আমাদের নিজেদের কাজের দ্বারাই যদি আদর্শের অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিষ্ঠা করে যাই তাহলে সে আদর্শ কোনদিন মানুষের মনে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারে না। এই রকমটি হয়েছিল এদেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থায়। মহামতি

www.pathagar.com

বুদ্ধের মহান যুক্তিভিত্তিক ধর্মকে আমাদের দেশের অগণিত অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের কাছে প্রিয় করে তোলবার জন্য যখন নানারকম তন্ত্র-মন্ত্রের দ্বারা আকর্ষণীয় করে তোলা হোল তখন দেশের সাধারণ লোক তা গ্রহণ করলো বটে, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মই এ দেশ থেকে চিরদিনের জন্যে বিলুপ্ত হয়ে গেল। এবং ঠিক এই কারণেই মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত সকল মতবাদ আমাদের দেশে সম্পূর্ণরূপে বিফল হয়েছে। এমনকি তাঁর মৃত্যুর বিশ বছরের মধ্যে গান্ধীবাদ বলে যা কিছু ছিল সমস্তই এদেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। ক্রমশঃ আপোষ করে করে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর শিষ্যেরা তাঁর প্রায় সকল আদর্শকেই এমনভাবে গোঁজামিলে দাঁড় করিয়েছিলেন যে সেই গোঁজামিল দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক যুক্তিপ্রবণতাকে বেশীদিন অন্ধ করে রাখা যায়নি। গান্ধীজীর আদর্শকে যাঁরা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁরা যেন সময় ও যুক্তির বৃথা অপচয় করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করবার প্রচেষ্টাকে পরিত্যাগ করেন।

১৯৪৭-এ ইংরেজরা যখন ভারত পরিত্যাগ করে তখন গান্ধীজী লিখেছিলেন, যে-Constituent Assemblyকে রক্ষা করবার জন্য ব্রিটিশ সৈন্য ভারতে থেকে যাবে। সেই Constituent Assembly কখনও সত্যকার স্বাধীনতা এনে দিতে পারে না। তিনি লিখেছিলেন, ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি করা হবে একজন Bhangi Woman-কে। তিনি লিখেছিলেন, স্বাধীন হবার পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিলাসবহুল গভর্নরের প্রাসাদগুলিকে কোনো জনহিতকারী প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র করে তুলতে হবে। কিন্তু সকলেই জানেন এর একটা আদর্শও গান্ধীজীর জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর সফল হতে পারেনি। যাঁরা নিজেদের প্রচারিত আদর্শকে সফল করা দূরে থাকুক, এমন কি সেই আদর্শ নষ্ট হতে দেখলেও চুপ করে থাকেন, জনগণের নেতৃত্ব তাঁরা হয়ত করেন, কিন্তু সে-নেতৃত্বের তাঁরা অধিকারী নন।

১৪

নাড়াজোলের জমিদারের কাছে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের পরাজয়ের কয়েক বছর বাদে বাংলার আর একজন নিঃস্বার্থ দেশসেবক অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কাউন্সিল নির্বাচনে বীরভূমের হেতমপুরের জমিদারের কাছে হারতে হয়েছিল কারণ জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেস মনোনয়ন দিয়েছিল হেতমপুরের জমিদারকে।

জিতেনবাবুর 'অপরাধ' হয়েছিল ১৯২৮ সালে বাংলা কাউন্সিলে যখন

www.pathagar.com

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন পাশ হয় তখন তিনি জমিদারদের স্তাবক কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করেছিলেন।

এই আইনে বাংলার প্রজাসাধারণের সামান্যতম অধিকারটুকুও কেড়ে নেবার ব্যবস্থা হয়। দরিদ্র কৃষকের জমি, বিক্রয়, হস্তান্তর, দান বা উপঢৌকনের সময়ে জমিদারকে উচ্চ হারে সেলামি দেবার ব্যবস্থা হয় এই আইনে। এমনকি এই সেলামির টাকা জমিদারের ঘরে পেঁাছে দেবার খরচ দিতেও প্রজাকে বাধ্য করা হয়। কংগ্রেস নেতারা প্রথমে শতকরা ২৫ ভাগ সেলামিতে রাজি ছিলেন কিন্তু মুসলমান ও ইংরেজ সদস্যদের চাপে পড়ে তাঁরা শেষে শতকরা ২০ ভাগ সেলামিতে রাজি হন। এই আইনের বলে বর্গাদারকে দিন-মজুরে পরিণত করে তাকে উচ্ছেদের পন্থা সহজতর করে দেওয়া হয়। প্রজাদের দখলি জমিতে পাকাবাড়ী তৈরির অধিকার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়—এমনকি স্বাধীনভাবে একটা গাছ কাটবার অধিকার থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়। সর্বোপরি প্রজার জমি হস্তান্তর বা বিক্রয়ের বেলায় জমিদারকে অগ্রাধিকার (right of pre-emption) দেওয়া হয় যাতে প্রজা ইচ্ছামত তার জমি বিক্রয় না করতে পারে। বাংলার জমিদারদের স্বার্থে এই আইন পাশ করবার সময়ে বাংলার কংগ্রেস নেতারা ইংরেজ পরিচালিত সরকারের পক্ষে ভোট দিয়ে এই আইন পাশে সাহায্য করেছিলেন। বাংলার কংগ্রেস নেতারা, সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এই কালা আইন পাশ করবার জন্য বাংলা সরকারের মন্ত্রী (এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলর) স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, আলেকজাণ্ডার মার্, উইলিয়ম প্রেণ্টিস্ ও বি ই জে বার্জ (ইনি পরে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন) প্রভৃতি ঝানু ইংরেজ আই সি এস-দের সংগে এক দরজায় ভোট দিতে যাচ্ছেন—এ ছবি মনে রাখবার মত। যে-কয়েক ক্ষেত্রে স্বরাজ্য দল সরকারের বিপক্ষে ভোট দেন সে-সব ক্ষেত্রেও দেবেন্দ্রলাল খানের মত স্বরাজ্য দলের জমিদার সদস্যরা স্বরাজ্য দলের বিপক্ষে ও সরকার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

এই আইন পাশের সময়ে জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেনঃ

"আমি জানি এই ব্যাপারে আমি একটি অতীব কঠিন প্রকল্পের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছি। স্বরাজসেবকরা, গভর্ণমেণ্ট ও জমিদার দলের কি অপরূপ সম্মিলন, কি জোটবদ্ধতা! এই সম্মিলন আমার পক্ষে একেবারে অসহনীয় প্রতিভাত হয়েছে। আমি অনুভব করছি, উঠন্ত ঢেউগুলির উপরে উঠবার চেষ্টা করা একেবারেই নিরর্থক। আমি কিন্তু আমার নিজের মুখের একটি কথা দিয়েও স্বরাজ দলের নিন্দা করব না। কিন্তু তাঁদের নিজেদের কার্যাবলীই তাঁদের নিন্দা করবে। তাঁরাও তাঁদের অতীতকে বিলুপ্ত ক'রে দিতে পারবেন না, তাঁরা যা করেছেন তাকে আর উল্টে দিতে পারবেন না। আমি

www.pathagar.com

কাউকে দোষ দেব না কিন্তু তাঁদের অতীত, তাঁদের ইতিহাস, তাঁদের ঐতিহ্য, তাঁদের কর্ম, তাঁদের কৃতিত্বই তাঁদের নিন্দা করবে অনেক বেশি আমার নিজের ক্ষীণ ভাষায় যা পারি তার চেয়ে।" (ব্যবস্থাপক সভার কার্যবিররণী থেকে অনুবাদ)

নাড়াজোলের জমিদারের নিকট নির্বাচনে পরাজিত হয়ে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ঐ সময়ে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন না।

এই আইন পাশ হতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত হয়েছিল পূর্ব বাংলার মুসলমান চাষীরা। পূর্ববঙ্গে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা চিরদিনই বেশী। তাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন। কিন্তু কৃষকশ্রেণী সাধারণত মুসলমান বা রাজবংশী ও নমঃশূদ্র। পূর্ব বাংলার এই নিপীড়িত বিপন্ন মুসলমান চাষীদের জন্যে স্যার আবদুর রহিম, খান বাহাদুর আজিজুল হক, ফজলুল হক প্রভৃতি অতুল বিক্রমে সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু গভর্নমেণ্টের তাঁবেদার দল ও স্বরাজ্য দলের মিলিত শক্তির কাছে তাঁরা পরাভূত হন। এঁদের কেউ স্যার বা খান বাহাদুর ছিলেন বলে তাঁদের সংগ্রামের গুরুত্ব কমতে পারে না কারণ প্রজাসাধারণের বাঁচবার দাবী নিয়ে তাঁরা যে সংগ্রাম করেছিলেন সে-রকম সংগ্রাম খদ্দরধারী কংগ্রেসীরা কখনও করেছেন বলে আমার জানা নেই।

স্যার আবদুর রহিম বলেছিলেনঃ

"আমরা কয়েকবারই আইন রচনার কতকগুলি মূল্যবান ও মূলনীতি লঙ্ঘন করে চলেছি। এই যে বর্গাদারেরা রয়েছে আমরা তাদের পথে সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি রচনা করে দিয়েছি আমরা এভিডেন্স আইনের সকল সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করেছি। আমরা তাদের কতকগুলি সহজাত অধিকার কেড়ে নিয়েছি। এই কাউন্সিল—এই কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জোটটি অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট তার সমর্থক দল এবং বিপ্লবাকার স্বরাজ দল সকলে মিলে বর্গাদারদের একেবারে খতম করে দিয়েছে যদিও তারাই হচ্ছে জমির প্রকৃত কৃষক। এবার এই ক্ষমতাশালী জোট, যাদের সঙ্গে প্রজার পক্ষ নিয়ে যাঁরা দাঁড়িয়েছেন তাঁদের সংগ্রাম চালিয়ে সফল হওয়া অসম্ভব—সেই জোট এবার রায়তদের সকল অধিকার ধীরে ধীরে কেড়ে নিচ্ছে। এই আইনের প্রস্তাবনা সম্পূর্ণভাবে ন্যায্যতা বিরোধী। এই আইনে একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষের অনেক মূল্যবান অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে যার কিছুমাত্র কারণ ছিল না। কি করেছে এরা? এরা কি রাজদ্রোহ করেছে? কোনো মানুষের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেবার কি অধিকার আছে এই কাউন্সিলের?" (ব্যবস্থাপক সভার কার্যবিবরণী থেকে অনুবাদ)

www.pathagar.com

ফজলুল হক বলেছিলেনঃ

"ভোটের ফলাফলে.....দেখা যাবে এদিকের আমরা একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জোটের সম্পূর্ণরূপে দয়ার পাত্রে পরিণত হয়েছি। আমরা মনে করি, মুসলমান আইনের একটি নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে এবং আমরা আর এই অধিবেশনের সামিল হয়ে থাকতে রাজি হতে পারি না। এই বিলের সম্বন্ধে আলোচনার ব্যাপারে আমরা এমন একটি নিরতিশয় প্রাধান্যপূর্ণ বিন্দুতে এসে পৌঁচেছি এবং আমি বোধ হয় অত্যুক্তি করছি না যদি বলি আজকের কাউন্সিলে এই বিতর্কের ফলাফল এবং বিতর্কের শেষে এই আইনটি যে রূপ পরিগ্রহ করবে তার প্রভাব ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপর সুদূরপ্রসারী হবে। গত অর্ধ শতাব্দীতে এই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল আইন প্রস্তাবিত হয়েছে তার মধ্যে এই আইন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনাগুলির অন্যতম। আমরা এমন সব লোকের ভোটে নির্বাচিত হয়ে কাউন্সিলে এসেছি যাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই রায়ত এবং অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে হয় আমরা তাদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াবো বা এই কাউন্সিলের সভ্যপদ ত্যাগ করে চলে যাবো। এই কাউন্সিলে আমাদের থাকার কোনোই প্রয়োজনীয়তা থাকে না যদি আমরা সেই অগণিত লক্ষ লক্ষ মানুষের পক্ষ নিয়ে না দাঁড়াই যারা আমাদের ভোট দিয়েছিল এই বিশ্বাসে এবং এই আশা নিয়ে যে আমরা কাউন্সিলে তাদের বক্তব্যই তুলে ধরবো।" (বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্যাবলী থেকে অনুবাদ)

খান বাহাদুর আজিজুল হক বলেছিলেনঃ

"আপনারা যদি এই আইন পাশ করেন তাহলে আমার নিকট থেকে জেনে রাখুন এবং আমি গভর্ণমেণ্ট সদস্যদের উদ্দেশ্যেও এই কথা বলছি যে এতে বাঙলার জনসাধারণের ক্ষোভের সূচনা করা হবে। জনসাধারণ এখনও ব্রিটিশ শাসনের পক্ষপাতী এবং তারা চায় যে ব্রিটিশ শাসন এদেশে থাকুক। কিন্তু আপনারা যদি এই আইন পাশ করেন তাহলে আমি বিনীত ভাষায় জানিয়ে রাখছি যে স্বরাজদল যেমন দেশের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের ক্ষোভের প্রতিনিধিত্ব করে তেমনি এই আইনটি পাশ হ'লে বাঙলার জনসাধারণের ক্ষোভের কারণ হবে। আমার বন্ধুরা আমার কথায় আপত্তি করছেন কিন্তু আমার কথা সত্য কি না জানবার জন্যে আমি তাঁদের নির্বাচন কেন্দ্রেও যেতে প্রস্তুত আছি এবং আমি আবার দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছি যে এই আইনেই জনসাধারণের ক্ষোভের সূচনা করবে এবং তার প্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছে যে আজ হোক কাল হোক এর কুফল জনসাধারণকেই ভোগ করতে হবে। আমি একজন অসহযোগী হিসাবে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করছি না বরং এমন একজন হিসাবে যে সকল সময়ে সকল ব্যবস্থায় সকল মন্দ, ভাল নিরপেক্ষ ব্যবস্থায়

www.pathagar.com

গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা না করেই তাকে সমর্থন করেছে ("শেম" "শেম" ধ্বনি) কিন্তু আমার যে সকল বন্ধুরা "শেম" "শেম" বলে চিৎকার করছেন তাঁরা অপরিসীম লজ্জা ও লাঞ্ছনার পট-ভূমিকায় সেই গভর্ণমেণ্টের সঙ্গেই গাঁটছড়া বেঁধে তার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন যে গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করবার জন্যে তাঁরা এখানে এসেছিলেন· বলশেভিজিম বা কমিউ-নিজমের নামে আমাদের অভিযোগ করা তাঁদের পক্ষে শোভা পায় না।" (ব্যবস্থপক সভার কার্যাবলী থেকে অনুবাদ)

বাংলার মুসলমান চাষীরা সেদিন বুঝেছিলেন যে আর কোনো দিন তাঁরা কংগ্রেস বা স্বরাজ্যদলের উপর ভরসা করতে পারবেন না। তাঁদের আত্মরক্ষার পথ নিজেদের বেছে নিতে হবে। স্বরাজ্য দল ও বাংলা সরকারের তাঁবেদার-দের ভোটে সেদিন পূর্ব বাংলার মুসলমান প্রজাদের বাঁচার দাবী অগ্রাহ্য করা হয়েছিল বটে কিন্তু তাদের সেই উপায়হীন আক্ষেপ পরে তীব্র বিদ্বেষের আকারে বিস্ফোরিত হয়ে সমস্ত দেশকে ছারখার করে দিয়েছে।

ঠিক একই সময়ে বড় বাড়ীওয়ালাদের স্বার্থে সরকারী তাঁবেদার ও কংগ্রেস দলের যুক্ত প্রচেষ্টায় ১৯২০ সালের বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ বা অনুরূপ একটি আইন পুনঃ প্রচলনের প্রয়াস বানচাল হয়ে যায়। এতেও জিতেনবাবু কংগ্রেস নেতাদের বিরোধিতা করেন।

কিন্তু তাঁর অপরাধ কংগ্রেস ভোলেনি। পরেরবারে নির্বাচনে তাঁকে হেতমপুরের জমিদারের কাছে নির্বাচনযুদ্ধে হারাবার ব্যবস্থা করা হয়। যখন সমগ্র ভারতবর্ষ স্যার জন সাইমনের বিরুদ্ধে কাল পতাকা দেখিয়ে সাইমন কমিশন বর্জনের দাবী তুলেছিল তখন এই হেতমপুরের জমিদার স্যার জন সাইমনকে অভিনন্দন পত্র দিয়ে প্রকাশ্য অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে একদিন চলন্ত ট্রেনে জিতেনবাবু কংগ্রেসী দলের আক্রমণে সাংঘাতিক-ভাবে আহত হন এবং বৃদ্ধ বয়সে তাঁর স্বাস্থ্য প্রায় ভেঙে পড়ে। তাঁকে যে কংগ্রেসী 'গুণ্ডারা' মেরেছিল একথা তিনি নিজে আহত অবস্থায় বীরভূমের ভূতপূর্ব কংগ্রেস নেতা শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়কে ইঙ্গিতে জানিয়েছিলেন। আহত অবস্থায় এই সত্যাশ্রয়ী অধ্যাপকের সেই ইঙ্গিত মিথ্যা হতে পারে বলে আমি মনে করি না।

গান্ধীজীর শিষ্যরা কংগ্রেসের শেষকালে এমন অবস্থা করে তুললেন যে নিঃস্বার্থ দেশসেবকরা—বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হতে লাগলেন এবং দেশসেবার ক্ষেত্র থেকে তাঁদের দূরে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হোল। পরিবর্তে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠলেন নাড়াজোল ও হেতমপুরের জমিদারেরা।

চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে কংগ্রেসের সংগঠন

www.pathagar.com

ভার বীরেন শাসমলদের হাত থেকে নলিনী সরকারদের হাতে চলে গেল। আমি বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে তাঁদেরই প্রতীক ধরছি যাঁরা দেশকে প্রাণপণে সেবা করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, বিনিময়ে কিছু চাননি—পানও নি। নলিনীরঞ্জন সরকারকে তাঁদের প্রতীক ধরছি যাঁরা দেশকে কি দিয়েছেন জানিনা কিন্তু দেশসেবার সকল পুরস্কার দু-হাতে লুটেছেন। সম্মান বলুন, পদমর্যাদা বলুন এমন কি অর্থাগমের সুযোগও এঁরা পুরোমাত্রায় আদায় করে নিয়েছেন। স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠার সংগে সংগেই নলিনী সরকার দলের হুইপ নির্বাচিত হন এবং কয়েক বছরেই চিফ হুইপ হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ নিজের মৃত্যুর পর এঁকে তাঁর সম্পত্তির ট্রাস্টী করে গিয়েছিলেন। দাশ সাহেবের মৃত্যুর পর ইনি বাংলার 'বিগ ফাইভের' একজন হয়ে পড়লেন। দাশ সাহেবের মৃত্যুর পর 'দেশবন্ধু পল্লী সংগঠন ভাণ্ডার' নামে কয়েক লক্ষ টাকার এক তহবিল খোলা হয়েছিল, দেশবাসীর দানে। অন্যান্যদের সংগে নলিনী সরকার ও বিধান রায় তার অন্যতম প্রধান ট্রাস্টী ছিলেন। সেই ধন-ভাণ্ডারের যে কি হোল আজ পর্যন্ত কেউ তার হিসাব জানেনা বা দেখেনি। ১৯৩৪ সালে ইনি কলকাতার মেয়র হতে চাইলেন। কিন্তু কংগ্রেস সদস্যরা অধিকাংশ ফজলুল হককে মেয়র করতে চাইলেন। তখন ইনি সরকার মনোনীত কাউন্সিলারদের ভোটের সাহায্যে ও সতীশ ঘোষ (ইউনিভার্সিটির) প্রভৃতিদের ভোটে মেয়র হলেন। মেয়র নির্বাচনী সভার সভাপতি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। তিনি সরকার মনোনীত সদস্যদের কার্যকাল শেষ হয়েছে বলে তাঁদের ভোট বাতিল করে দিয়ে অধিকাংশ কংগ্রেসীর ভোটে ফজলুল হককেই মেয়র ঘোষণা করলেন। কিন্তু নলিনী সরকার বাংলা সরকারকে ধরে আইন সংশোধন করিয়ে সরকার মনোনীত সদস্যদের ভোট সংগ্রহ করে ফজলুল হকের মেয়র নির্বাচন বাতিল করালেন। সরকার মনোনীত সদস্যদের সংগে যোগসাজসে অধিকাংশ কংগ্রেসী কাউন্সিলারেরর মনোনীত প্রার্থীর পরাজয় ঘটান নামান্তরে কংগ্রেসেরই পরাজয় ঘটান। তাই বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাত্মা গান্ধীকে অনুরোধ করলেন তিনি হস্তক্ষেপ করে যেন এই অবাঞ্ছনীয় ঘটনার অবসান ঘটান। তিনি গান্ধীজীকে লিখেছিলেনঃ

কিন্তু মহাত্মা গান্ধীও নলিনী সরকারকে ভয় করতেন। তিনি জবাব দিয়েছিলেনঃ

"I dare not interfere without bebing approached by both parties."

অথচ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মেয়র হওয়ার বিরোধিতা করে কিছু সংখ্যক কংগ্রেসী যখন তাঁদের বিরোধিতার কথা ব্যক্ত করেন তখন যতীন্দ্র-

www.pathagar.com

মোহনকে মেয়র করা কেন উচিত সে-নিয়ে তিনি ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে লম্বা ওকালতি করেছিলেন।

১৯৩৭ সালে ফজলুল হক যখন কৃষক-প্রজা দলকে নিয়ে কংগ্রেসের সংগে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করতে চান তখন শরৎচন্দ্র বসুর বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি। অবশ্য, কেউ কেউ বলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশেই তিনি এর বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু হক সাহেব যখন বাধ্য হয়ে মুসলিম লীগের সংগে মন্ত্রীত্ব গঠন করলেন তখন নলিনীরঞ্জন সরকার তার অর্থমন্ত্রী হলেন। তার ফলে নলিনী সরকারকে কংগ্রেস থেকে ছ-বছরের জন্য বহিষ্কৃত করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সমগ্র দেশ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচারে জর্জরিত তাদের কারাগারে শৃংখলিত তখন নলিনী সরকার দিল্লীতে বড়লাটের মন্ত্রিসভার সদস্য হয়ে কাজ করছেন। আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী গান্ধীজীর অনশনের শেষের দিকে যখন বড়লাট লর্ড লিনলিথগো গান্ধীজীর মৃত্যুর জন প্রস্তুত হয়ে পুণায় চন্দন কাঠ জমা করে রাখবার হুকুম দিলেন তখন নেহাৎ চক্ষুলজ্জায় ইনি পদত্যাগ করেন। আবার ভারত স্বাধীন হলে এই নলিনী সরকারকেই ডেকে এনে কংগ্রেসীরা বাংলার অর্থমন্ত্রী করেছিলেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষ বিধান রায়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তুলেছেন কিন্তু নলিনী সরকারের স্মৃতি রক্ষার ভার নেবার যোগ্যতা তিনি ছাড়া বাংলায় আর কার আছে?

ওদিকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বাংলার প্রথম অসহযোগী যিনি ব্যারিস্টারী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি যখন ব্যারিস্টারী ছাড়েন তখন তিনি বড় ব্যারিস্টার ছিলেন না। কিন্তু তখন তাঁর মাত্র ৩৯ বছর বয়েস এবং তাঁর পেশায় উন্নতির মুখেই তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নিজ দায়িত্বে অহিংস কর-বন্ধ আন্দোলন করে তিনি মেদিনীপুর থেকে ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নিতে বাংলা সরকারকে বাধ্য করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, ইউনিয়ন ট্যাক্সের উপর ইউ-নিয়ন বোর্ডের কর্তৃত্ব না থাকায় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রচলন অগণতান্ত্রিক। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনগুলিতে তিনি সাধারণত শেষকালে সরকারের সংগে আপোষ করে মিটমাট করে নিতেন। মেদিনীপুরের ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলনই বোধ হয় ভারতের সর্বপ্রথম অহিংস গণআন্দোলন যেখানে দেশের সরকারকে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত তিনিই একমাত্র ব্যক্তি জিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হিসাবে কোনদিন রাহা খরচ বা পাথেয় বাবদ ইংরাজ পরিচালিত সরকারী তহবিল থেকে একটি কপর্দকও নেননি। বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসাবে মাসিক ১০০ টাকার মাসোহারা তিনি গ্রহণ করতেন না।

www.pathagar.com

বিপ্লববাদীরা অহিংসায় বিশ্বাস করেন না অতএব তাঁদের কংগ্রেসে থাকা উচিত নয় কারণ কংগ্রেসের পন্থা অহিংস, এই মন্তব্য করার অপরাধে কৃষ্ণনগরের সম্মেলনেই একবার ও পরে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে আর একবার তাঁর উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়। 'মেদিনীপুরের ক্যাওট' হওয়ার অপরাধে তাঁকে কংগ্রেসের সম্পাদক পদ, ফরোয়ার্ড পত্রিকার প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ ও তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদ থেকে কৌশলে অপসারিত করা হয়। কৃষ্ণনগরের কংগ্রেস সম্মেলন উপলক্ষ্যে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সরোজিনী নাইডুকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে কিন্তু কৃষ্ণনগর কংগ্রেস সম্মেলনের সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে অভিনন্দন জানাতে অস্বীকার করে।

অবশ্য কৃষ্ণনগর কংগ্রেস সম্মেলনের সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাশের আরও অনেকগুলি কারণ ছিল। এই কৃষ্ণনগর সম্মেলনেই চিত্তরঞ্জন দাশ প্রবর্তিত হিন্দু-মুসলিম চুক্তি সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত নেবার কথা হয়। অবশ্য উভয় সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তির পরিবর্তন না ঘটলে শুধু পারস্পরিক চুক্তির কোন মূল্য নেই। তবু বাংলার মুসলমানদের মনে হিন্দুদের সদিচ্ছা সম্বন্ধে সংশয় অপনোদনের জন্য এর একটা সাময়িক গুরুত্ব ছিল। স্বাধীনতা অর্জন করবার পর সংখ্যাধিক হিন্দুরা যে সংখ্যাল্প মুসলমানদের ন্যায্য দাবীর কথা ভুলে যাবেন না সেই সম্বন্ধেই এই চুক্তিতে একটা প্রকাশ্য অঙ্গীকার করা ছিল। কিন্তু বাংলার বিপ্লববাদীরা একযোগে ওই হিন্দু-মুসলিম চুক্তির বিরোধিতা করেন। তাঁরা চেয়েছিলেন কৃষ্ণনগর সম্মেলনে যেন ওই চুক্তি কিছুতেই পাশ না হতে পারে। মুসলমানদের কাছে কোনরূপ অঙ্গীকার করতে তাঁরা রাজি ছিলেন না। ওদিকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ঠিক করেছিলেন যে করেই হোক্ হিন্দু-মুসলমান চুক্তি পাশ করাবেন। চুক্তি প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটিতে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমান সমান ভোট হয়। তখন সভাপতি হিসাবে বীরেন্দ্রনাথ চুক্তির পক্ষে কাস্টিং ভোট দিয়ে চুক্তি পাশ করিয়েছিলেন। তাই অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের রাগ গিয়ে পড়ল তাঁর উপর এবং বিপ্লবীরা তাঁর উপর অনাস্থা আনে এবং মাত্র দু-ভোটে তা পাশ হয়। তখন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সভাপতির আসন ত্যাগ করে কৃষ্ণনগর ছেড়ে চলে যান।

অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের এই মুসলিম-বিরোধী ভূমিকা নিয়ে কমিউনিস্ট নেতা ও প্রাচীন বিপ্লবী নায়ক শ্রীমুজফফর আহমেদ লিখেছেনঃ 'কংগ্রেস কর্মী-সংঘ' হতেও সাম্প্রদায়িকতার কম ইন্ধন জোগানো হচ্ছিল না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এই সংঘ গড়েছিলেন। এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁরা

www.pathagar.com

সি. আর. দাশের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টকে বাতিল করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন যা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারেরই সহায়ক হয়েছিল।...কংগ্রেসের ভিতরে গঠিত স্বরাজ পার্টি চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে তিন বৎসর আগে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মেলনে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করেছিল। এই প্রস্তাবে মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যা খুশী হয়েছিলেন...প্যাক্টে মুসলমানদের বেশী চাকরী পাওয়া ও আরও কি কি অধিকার পাওয়ার কথা ছিল। এই জিনিসটা হিন্দুদের খুব বেশীর ভাগ লোক গ্রহণ করতে পারেন নি। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা 'কংগ্রেস কর্মী সংঘ' নাম দিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। প্যাক্টের বিরুদ্ধে তাঁরা যে প্রচার করেছিলেন সেটা যে সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়েছিল সেকথা আগে বলেছি।... সম্মেলনে প্যাক্ট নাকচ করবার জন্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি দৈনিক "ফরওয়ার্ডের" এ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর ছিলেন বলে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অভিভাষণের কপি আগেই পেয়েছিলেন। কাজেই, তিনি কলকাতা হতে তৈয়ার হয়েই গিয়েছিলেন যে, দরকার হলে কৃষ্ণনগরের সম্মেলন ভেঙে দেবেন। সি. আর. দাশের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট নাকচ করে দেওয়ার জন্যে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা বদ্ধপরিকর তো ছিলেনই, তার উপরে বীরেন শাসমল তাঁর অভিভাষণে লিখে বসলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য।" (কাজী নজরুল ইসলাম, স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩৫৯—৩৬৪)।

নাড়াজোলের জমিদারের কাছে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে পরাজিত করানোর প্রচেষ্টার পিছনে কংগ্রেস নেতা ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মুসলমান-বিরোধী মনোভাবও অনেক পরিমাণে কাজ করেছিল। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল যে মুসলমানের পক্ষ নিয়ে কথা বলতেন এটা তাঁরা কেউ সহ্য করতে পারতেন না। মুসলমানদের পক্ষ হয়ে কথা বলতেন বলে নাড়াজোলের জমিদারের সংগে নির্বাচন যুদ্ধে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নামে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে-সকল মিথ্যা অপবাদ রটনা করা হয় তার একটা ফিরিস্তি তিনি নিজেই দি বেঙ্গলী কাগজে প্রকাশ করেছিলেন ১৪. ১২. ১৯২৬ তারিখেঃ

"এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক প্রতিনিধির সংগে সাক্ষাৎকারে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁর প্রদেশের কয়েকজন সফল অকংগ্রেসী গত ইলেকশানে যে দুর্নীতির সূচনা করেছিল তার বিরুদ্ধে খুব তিক্ততার সংগে অভিযোগ করেছেন। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত, যে বাঙলায় তাঁর কয়েকজন বিজয়ী কংগ্রেস প্রার্থী বাঙলায় যে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছুই অবগত নন। বাঙলায় হিন্দুপ্রধান জেলাগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ আমার জেলায় গত নির্বাচনে "হিন্দু সাবধান" এই শিরোনামে একটি বাঙলা ইস্তাহার

www.pathagar.com

চতুর্দিকে বিতরণ করা হয়েছিল যাতে ছাপাখানা বা মুদ্রক ও প্রকাশকের নাম ছিল না এবং যাতে এই মূল্যবান ঘোষণাটি করা হয়েছিল যে আমি একজন প্রতারক, আমি মসজিদের সামনে গান বাজনা বন্ধের সমর্থক, আমি মুসলমানদের শতকরা ৮০ ভাগ চাকরি দেবার পক্ষে ভোট দিয়েছিলাম এবং যাতে ঘাটালের হিন্দু নির্বাচকদের সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছিল যে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের নিরাপত্তার জন্য যেন আমাকে ভোট না দেওয়া হয়। আর একটি বাঙলা ইস্তাহারে যাতে মেদিনীপুরের গণ্যমান্য অধিবাসী শ্রী উপেন্দ্রনাথ মাইতি ও শ্রী শচীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী বলেছেন যে আমি নাকি সরস্বতী পূজার চাঁদা দিতে অস্বীকার করেছি, আমার নাকি মুসলমান হয়ে যেতে কোনো আপত্তি নেই, আমি সেই সকল মুসলমানের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছি যারা বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে এবং বহু হিন্দু রমনীর সতীত্ব নষ্ট করেছে; এবং আমি ১৭ জন মুসলমান সদস্যের সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য নির্বাহক সমিতি থেকে পদত্যাগ করে চলে এসেছি। সেইহেতু হিন্দু নির্বাচকদের বিবেচনা করতে বলা হয়েছে যে, আমি তাদের ভোট পাবার যোগ্য কী না।

"পণ্ডিতজীর দ্বিতীয় অভিযোগ হচ্ছে যে তাঁর প্রদেশের নির্বাচনে অকংগ্রেসীদের মিথ্যা প্রচারের অন্ত ছিল না। আমি আশা করি, পণ্ডিতজী হয়ত শুনলে কষ্ট পাবেন যে "ফরোয়ার্ড" পত্রিকার একজন সহ সম্পাদক শ্রী উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মেদেনীপুরের একটি কংগ্রেসী নির্বাচনী সভায়, যে সভায় শ্রীমতি উর্মিলা দেবী, শ্রী বসন্ত মজুমদার এবং অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন যে, আমিই শ্রী সুভাষচন্দ্র বসুকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছি এবং আমি বাঙলার মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য স্যার আব্দুর রহিমের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছি। পণ্ডিতজী কি জানেন যে, "ফরোয়ার্ড" পত্রিকার পাতাগুলি আমার সম্বন্ধে কুৎসিত ভাষা ঘোষণায় ঘন ঘন বিকৃত করা হোতো এবং অজ্ঞাত সূত্র থেকে প্রকাশিত নানা মিথ্যা ঘটনা দিয়ে ভর্তি করা হতো কিন্তু যখন একবার আমি এক বন্ধু মারফৎ এইসব মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম এবং টেলিফোনে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে (শরৎচন্দ্র বসু) আমার প্রতিবাদগুলি ছাপাবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম তখন তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করতে একেবারেই রাজি হন নি।

"পণ্ডিতজী হয়ত এতদিনে খবর পেয়েছেন যে কংগ্রেস প্রার্থীর স্বপক্ষে শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর মহৎ "আবেদন" যেটি আমার নির্বাচন কেন্দ্রের দূরতম গ্রামে গ্রামেও কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থকদের দ্বারা বিতরণ হয়েছিল এতদিন বাদে তিনি সেটি তাঁর নয় ব'লে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। এই আবেদনে যা বলা হয়েছে সে কথা বলতে গেলে শুধু ভাবটুকু নয় পরন্তু যে ভাষা

www.pathagar.com

ব্যবহার করা হয়েছে তা অতীব আপত্তিজনক তো বটেই তাছাড়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শ্রদ্ধেয়া বিধবা পত্নীর পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত। এবং শ্রীযুক্তা উর্মিলা দেবী ও শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের আমার নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখার সময়ে কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থকরা তাঁদের প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন সে সম্বন্ধে কালির লেখা লিখতেও আমি গভীরভাবে লজ্জাবোধ করছি।

"পণ্ডিতজীর শেষ অভিযোগ হচ্ছে যে উত্তর প্রদেশের অকংগ্রেসী প্রার্থীরা নির্বাচনে জয়লাভের জন্য মণ মণ সোনার ধারা ঢেলে দিয়েছিল। আমি প্রতিবাদের ভয় না রেখেই বলছি এখানকার কংগ্রেস প্রার্থীও একই কাজ করেছিলেন। বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোজন শিবিরগুলি এবং এমনকি কাঁচা রাস্তাতেও অসংখ্য মোটর লরিগুলি সোনা ঢালবার কলস্বরের প্রভূত সাক্ষ্য হিসাবে দাঁড়িয়েছিল।"

এখানে বলে রাখা ভাল, বীরেন্দ্রনাথ যদিও সারা জীবন মুসলমানদের অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন তেমনি যখন ইংরেজ সরকার Communal Award চালু করেন তখন কংগ্রেস নেতাদের মত ক্লীবের রাজনীতি গ্রহণ না করে তিনি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করেন ও ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচিত হন। বাইরের রাজনৈতিক শক্তি এসে হিন্দুকে মুসলমানের থেকে পৃথক করে দেবে এটা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

কংগ্রেস নেতারা ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যদিও এই ধরণের বহু জঘন্য ও মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাঁকে নির্বাচনে নাড়াজোলের জমিদারের কাছে হারিয়েছিলেন তবু ১৯২৭ সালেই বাংলার সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে মনোনীত করেন। কিন্তু তিনি অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে নিজে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। (১. ১২. ১৯৩৪-এর 'দেশ' সাপ্তাহিক দেখুন)। কংগ্রেস নেতারা ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা তখন তাঁর উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনেন ১৯২৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারীর বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভায়। একদিকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল অন্যদিকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র বসু, বিধান রায়, নলিনী সরকার, কিরণশঙ্কর রায়, তুলসী গোস্বামী, নির্মল চন্দ্র, উপেন ব্যানার্জি, মাখন সেন, অমর চ্যাটার্জি প্রভৃতি। তবুও অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হয়েছিল মাত্র ৪ ভোটে। প্রাচীন বিপ্লবী নায়ক শ্রীমুজফফর আহমেদ বীরেন্দ্রনাথের পক্ষে ভোট দেওয়ায় বিপ্লবী মহলে অপ্রিয় হয়ে পড়েন। অবশ্য এই অনাস্থা প্রস্তাব আনবার প্রধান কারণ ছিল, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক

www.pathagar.com

হয়েই দেশবন্ধু পল্লী-সংগঠন ভাণ্ডারের হিসাব পরীক্ষার হুকুম দেন—যে ভাণ্ডারে প্রধান ট্রাস্টীদের মধ্যে ছিলেন বিধান রায় ও নলিনী সরকার। অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হওয়াতে বীরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের সম্পাদক পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তারপর দেশবন্ধু পল্লী সংগঠন ভাণ্ডারের হিসাব তৈরিও হয়নি এবং তার হিসাব কেউ আজ পর্যন্ত দেখেওনি।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে সে সময়ে ভোট গ্রহণ কেমন ভাবে হ'ত সেটাও জেনে রাখা ভাল। ১৯২৬ সালের ১৩ই জুন বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির যে সাধারণ সভা হয় তাতে ডাঃ সুন্দরীমোহন দাশ প্রস্তাব করেন যে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সভাপতিত্বে যে অধিবেশন হয় তা ভেঙে যাবার পর ব্যারিস্টার যোগেশ চৌধুরীর সভাপতিত্বে যে সম্মেলনের সভাপতি বীরেন্দ্রনাথের উপর অনাস্থা প্রস্তাব ও হিন্দু মুসলিম প্যাক্টের নাকচ প্রস্তাব পাশ হয় সে-সম্মেলনের সংগে কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক নেই। এই অধিবেশন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ হিন্দু মুসলিম প্যাক্টের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবার কথা ছিল এই সভায়। কংগ্রেস সভানেত্রী সরোজিনী নাইডু ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু বিপ্লববাদীরা ডাঃ সুন্দরীমোহন দাশের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে নিজেরাই এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে ব্যারিষ্টার যোগেশ চৌধুরীর সভাপতিত্বে যে সম্মেলন হয় সেইটাই প্রকৃত সম্মেলন। বিপ্লববাদীদের এই প্রস্তাব পক্ষে ১২৮ ও বিপক্ষে ১১৮ ভোটে গৃহীত হয়।

অর্থাৎ বিপ্লববাদীদের পক্ষে ছিলেন ১২৮ জন কংগ্রেস সদস্য এবং বিপক্ষে ছিলেন ১১৮ জন। তাহলে স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ মিলিয়ে ২৪৬ জন কংগ্রেস সদস্য উপস্থিত ছিলেন সেইদিনকার অধিবেশনে। কিন্তু (আশ্চর্য হবেন কি?) তখন সেদিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য তালিকায় সভ্য সংখ্যা ছিল ২৩০। কাজেই ২৪৬ জন কংগ্রেস সদস্যের সেই অধিবেশনে উপস্থিত হওয়া সম্ভবই ছিল না। তার মানে বিপ্লববাদীরা সেদিন ১৬ জন ভাড়াটে লোককে কংগ্রেস সদস্য বলে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শেষে ধরা পড়ে যান এবং তাঁদের প্রস্তাব সেই কারণে বাতিল হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে কৃষ্ণনগরে সম্মেলন করিয়ে হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট নাকচের গোপন রহস্যও জেনে রাখা দরকার। যোগেশ চৌধুরী (Calcutta Weekly Notes-এর প্রতিষ্ঠাতা) কৃষ্ণনগরের কংগ্রেস সম্মেলনের ডেলিগেট বা প্রতিনিধি ছিলেন না। এমন কি তিনি সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতিরও সভ্য ছিলেন না। তিনি ছিলেন সম্মেলনের

www.pathagar.com

দর্শক মাত্র। এই ধরণের একজন দর্শককে পাকড়াও করে তাঁকে দিয়ে সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিয়ে যদি প্রস্তাব পাশ করান হয় তাহলে সেটা কি ধরণের গণতন্ত্র তারও ব্যাখ্যা দরকার। শ্রীমুজফফর আহমেদ 'কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি কথায়' লিখেছেন যে বিপ্লবী নেতা উপেন ব্যানার্জি কৃষ্ণনগর সম্মেলন ভেঙে দেবার জন্যে তৈরি হয়েই গিয়েছিলেন। বিপ্লববাদীরা এই রকম কত ভাড়াটে লোকের ভোটের সাহায্যে কৃষ্ণনগর কংগ্রেস সম্মেলন ভেঙে দিয়েছিলেন তার হিসাব এখন পাওয়া সম্ভব নয় বটে, কিন্তু যোগেশ চৌধুরীর মত একজন দর্শক যদি সম্মেলনের সভাপতি হতে পারেন তাহলে আরও কত ভাড়াটে লোক যে সম্মেলনে ঢুকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ও হিন্দু মুসলিম প্যাক্টের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। অবশ্য ক্ষুব্ধ হবার কিছু নেই—এর নাম ভারতীয় গণতন্ত্র!

১৯২৬-এর ১৩ই জুনের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এই সভায় বিপ্লববাদীরা হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টের বিরোধিতা করে অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা করেন এবং যাতে এই প্যাক্ট পাশ না হয় সেই কারণে নিজেদের ভোটের সংখ্যা বাড়াবার জন্যে তাঁরা ১৬ জন ভাড়াটে লোক মিটিংএ নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের হয়ে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের বিরুদ্ধে ভোট দেবার জন্যে। হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের বিরুদ্ধে তাঁদের এই প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা দেখে সেই সভায় উপস্থিত সে বছরের কংগ্রেস সভানেত্রী সরোজিনী নাইডু বলেছিলেনঃ

"By opposing this pact, you are in fact, re-enacting a greater partition of Bengal." (Indian Quarterly Register, 1926 Vol. 1 pp. 85-6).

"এই হিন্দু মুসলিম চুক্তির বিরোধিতা করে আপনারা দ্বিতীয় বঙ্গ বিভাগের সূচনা করেছেন।" (ইণ্ডিয়ান কোয়াটারলী রেজিস্টার ১৯২৬, ভলিয়ুম ১ পৃঃ ৮৫-৬)

সরোজিনী নাইডু সেদিন ঠিকই বলেছিলেন। মানুষের ভবিষ্যদ্বাণী এমন নিখুঁতভাবে ফলে যাওয়া মানব-ইতিহাসে বোধহয় খুব কমই ঘটে। হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টের বিরুদ্ধতা করে বাংলার বিপ্লববাদীরা সেই ১৯২৬এর ১৩ই জুনের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাতেই বাংলা ও ভারত-বিভাগের গোড়া পত্তন করে দিয়েছিলেন। তাঁদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিই ধীরে ধীরে যে সকল অ-সাম্প্রদায়িক-মনোবৃত্তিসম্পন্ন মুসলমান বাংলার নেতৃত্ব পদে আসীন ছিলেন সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কাছে তাঁদের ক্রমশঃ দুর্বল ও অক্ষম করে তোলে। এই সভায় অবশ্য ভোটের জোরে শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট পাশ করানো হয়। কিন্তু ওই প্যাক্ট পাশ করিয়েছিলেন বলে তখনকার বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি যতীন্দ্রমোহন

www.pathagar.com

সেনগুপ্ত বিপ্লববাদীদের নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে উঠেন এবং এর পরে সুভাষচন্দ্র বসুর মুক্তির পর বিপ্লববাদীদের একটা বড় অংশ সুভাষচন্দ্রকে যতীন্দ্রমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে খাড়া করেন।

নাড়াজোলের জমিদারের কাছে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে হীন চক্রান্ত করে পরাজিত করানোর কয়েকমাস আগে বিধান রায় তাঁকে এক চিঠিতে লিখেছিলেনঃ

৩৬, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট
১২-১-২৬

"প্রিয় মিঃ শাসমল,

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার চিঠির শেষের লাইনটি আমার পক্ষে অতীব উৎসাহজনক।

আমি এবং তুলসি (গোস্বামী) সেনগুপ্তের (যতীন্দ্রমোহন) নিকট এই নামগুলির তালিকা দিয়েছি; সর্বশ্রী সেনগুপ্ত, সাতকড়ি, শরৎচন্দ্র বসু, বি. এন. শাসমল, নির্মল চন্দ্র, তুলসি গোস্বামী, নলিনী সরকার, হরেন চৌধুরী, অখিল দত্ত, আমি এবং আবুল কালাম আজাদ, আক্‌রাম খাঁ, হাজি আব্দুর রসিদ, আর ইয়াসীন। আমরা তাঁকে বলেছিলাম যে তিনি একজন হিন্দু ও তিন চারজন মুসলমানের নাম যোগ করতে পারেন কিন্তু কোনো কারণেই তিনি এই নামগুলিকে পরিবর্তন করতে বা বাদ দিতে পারবেন না এবং হিন্দুর নাম আর একজনের বেশি করতে পারবেন না। তিনি এবং তাঁর দল যদি এই কমিটিকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক না হ'ন তাহ'লে আমরা যা ভালো বুঝবো তাই করতে পারবো। আমরা যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের নাম ইচ্ছা করেই ঢোকাইনি কারণ আমরা যখন কমিটি গঠনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলাম তখন অনুভব করেছিলাম যে আপনি, আমি, হরেন চৌধুরী ও অখিল দত্ত প্রভৃতির নাম ওদের পক্ষে গলাধঃকরণ খুবই কঠিন ছিল। এর মধ্যে কোনো দ্বৈত ভাষণের ব্যাপার নেই—আমাদের সমগ্র দলটি (যতদিন সেদিন এখানে থাকবে) বি, পি, সি, সির ২৪ তারিখের সভায় যাবে এবং তুলসি সভার সামনে বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরবে।

আমি এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত যে প্রার্থী বাছাইয়ের আগে ভিত্তি প্রস্তুতের কিছু কাজ করে রাখা দরকার—যেমন অর্থ সংগ্রহ, ভোটার তালিকা পরীক্ষা করা এবং তাতে নতুন নামগুলি সংযোজনের ব্যবস্থা করা। প্রার্থীর নাম সবার শেষে আসবে কারণ এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে করতে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলের আসল ছবিটা জানতে পারবো এবং তখন ঠিক করবো কাকে নেওয়া হবে কাকে বাদ দেওয়া হবে।

www.pathagar.com

আপনি কবে কলকাতা আসতে পারবেন? আগামী মঙ্গলবার কি এক-দিনের জন্য আসতে পারেন?

আমার মনে হয় আপনি যদি মঙ্গলবার আসতে পারেন তো খুব ভাল হয়। তুলসিও আপনাকে চিঠি দিচ্ছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এক-সংগে পরামর্শ করি। আমি বলতে ভুলে গেছি, কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা তৈরীর সময়ে ওদের সকলেই উপস্থিত ছিলেন।"

আপনার একান্ত
বি. সি. রায়

৬.২.২৬ তারিখে বিধান রায় আবার লিখছেনঃ

"প্রিয় মিঃ শাসমল,

অনেক আলোচনা ও তর্কাতর্কির পর (যার জন্য আমাকেই দায়ী করা হয়েছে) যে (ইলেকশন) বোর্ড-এ ওরা রাজি হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১। তুলসি গোস্বামী; ২। অখিলচন্দ্র দত্ত; ৩। বি, এন, শাসমল; ৪। নির্মল চন্দ্র; ৫। শরৎচন্দ্র বসু; ৬। জে, এম, সেনগুপ্ত; ৭। বি, সি, রায়; ৮/৯/১০ কর্মীদের তিনজন প্রতিনিধি; ১১। জে, এম, সেনগুপ্ত; ১২। কে, এস, রায়; ১৩। সাতকড়ি রায়; ১৪। উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী; ১৫। মোঃ আকরাম খান; ১৬। মোঃ ওয়াহেদ হোসেন; ১৭। মোঃ রসিদ খান; ১৮। মোঃ ইয়াসিন; ১৯। আবুল কালাম আজাদ; ২০। মিসেস্ সি, আর, দাশ।

আমি গুণে দেখলাম মিসেস্ দাশকে বাদ দিয়ে আমরা ১০ জনকে আমাদের দিকে পেতে পারি। আবুল কালাম আজাদকে নিয়ে ওদের ৯ জন আছে।

জে, এম, দাশগুপ্ত মনে করে আব্দুর রসিদ খান আমাদের দিকে থাকবে। আমিও তাই মনে করি। ওয়াহেদ হোসেন আমাদের বিরুদ্ধে যেতে পারবে না।

এই সংগঠন দেখে আপনার কি মনে হয়? আমার মনে হয় উপেনবাবু খোলাখুলি ওদের পক্ষে যাবেন না এবং হয়ত যতীন দাশগুপ্ত যেমন মনে করে, তিন জন কর্মীর উপর অনেকটা সংযত হবার জন্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আপনারও কি সেই অভিমত? আমার সম্মতির জন্য ওরা আমার উপর গত রাত্রেই পীড়াপীড়ি করছিল কিন্তু আপনার অভিমত না নিয়ে ওদের কোনো উত্তর দিতে আমি অস্বীকার করেছি...।"

মতিলাল নেহরু বলুন, বিধান রায় বলুন—এঁরা মাত্র কয়েকমাস আগে যাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সংগে অভিবাদন জানিয়েছেন, সাহচর্য চেয়েছেন, উপদেশ চেয়েছেন, জমিদারের কৃপা-পাত্র হয়ে মাত্র কয়েক হাজার টাকার লোভে তাঁরা যে সেই বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বিরুদ্ধতা করতে পারেন এবং তাঁদেরই

www.pathagar.com

সাঙ্গপাঙ্গদের দ্বারা নিতান্ত জঘন্য মিথ্যা অপবাদে তাঁর ব্যক্তিগত লাঞ্ছনা নীরবে অবলোকন করে উপভোগ করতে পারেন এতে মনে হয় যে মানুষ হিসাবেও আমাদের দেশের এইসব কংগ্রেস নেতারা কত নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন। রাজনৈতিক বা দলের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সব সময়েই যে-কোন ধরণের কাজ করতে এঁদের বিবেকে বাধত না। সত্য ও অহিংসার এইসব তথাকথিত পূজারীদের হাতেই—এইসব ঝুটা গান্ধীবাদীদের হাতেই মহাত্মা গান্ধী নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করেছিলেন। এবং শুধু সেই কারণেই ভারতবর্ষে গান্ধীবাদ সৃষ্টি হতে না হতেই ধ্বংস হয়ে যায়। অবশ্য, গান্ধীজী এই সত্যটুকু শেষ জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেসের বিলুপ্তি হোক। কিন্তু ঝুটা গান্ধীবাদীদের হাতে ক্ষমতা পড়বার সংগে সংগে তারা নিজরূপ ধারণ করে এবং তাঁর জীবিতকালেই গান্ধীজীকে পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপে সায় দিতে বাধ্য করেছিল। গান্ধীজী এঁদের মেনে-নেওয়া ভারত-বিভাগের প্রস্তাব নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভায় নিরুপায় হয়ে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এতবড় ব্যক্তিত্বের কি করুণ পরিণতি। কিন্তু সেই পরিণতির জন্য গান্ধীজী নিজেই সর্বতোভাবে দায়ী।

য়েরোড়া জেল থেকে মহাত্মা গান্ধী বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন (১৮.২.১৯৩৩)

২৮-২-১৯৩৩

প্রিয় শাসমল,

আমি আপনার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। আমি মনে করি সারা ভারতে এই কবিরাজের বহুতর সংস্করণ আছে। আমি আশা করি আপনি আপনার "হরিজনের" (HORIZON) সংখ্যাটি ঠিকমত পাচ্ছেন এবং যদি আপনি দারিদ্র্যের চরম সীমায় না পৌঁছে থাকেন, আমার মনে হয় যা হয়নি, তাহ'লে আপনি সোজাসুজি আপনার চাঁদা ও অন্যান্য গ্রাহকের নাম এবং চাঁদা পাঠিয়ে দেবেন।

আপনার একান্ত

মো. ক. গান্ধী

গান্ধীজী জানতেন বাংলার কংগ্রেস নেতাদের কূট-চক্রান্তের যে ঘূর্ণাবর্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের রাজনৈতিক জীবনকে প্রায় নির্মূল করে দিয়েছিল তারই স্রোতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও দারিদ্র্যের নির্মম নিষ্পেষণে বিচূর্ণ হতে পারতো। কারণ, বীরেন্দ্রনাথ ভারতের সেই অত্যল্প সংখ্যক দেশসেবক-দের মধ্যে একজন যাঁরা দেশের জন্যে কেবল দিয়েই গেছেন—পরিবর্তে কিছু চাননি। এবং পুরস্কার হিসাবে নিজের অকৃতজ্ঞ দেশবাসীর নিকট থেকে

www.pathagar.com

পেয়েছিলেন মিথ্যা অপবাদের লাঞ্ছনা। কিন্তু গান্ধীজীর কাছে সেসব প্রশ্ন খুব বড় ছিল না। তাঁর সাপ্তাহিক 'হরিজন' কাগজের চাঁদা ঠিকমত উঠলেই হ'ল এবং বেশী সংখ্যক লোক তাঁর 'হরিজন' কাগজ পড়লেই হ'ল। কিন্তু আমি বলতে বাধ্যঃ যে রাজনৈতিক পটভূমিকায় একটি মাত্র সৎ লোকও মিথ্যা অপবাদে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হন এবং তা নিয়ে যখন সারা দেশে একটি লোকের মনেও বিবেকের প্রশ্ন জেগে ওঠে না তখন সেই রাজনৈতিক পটভূমিকার নেতা মহাত্মা গান্ধীই থাকুন বা জওহরলাল নেহরুই থাকুন, সেই পটভূমিকা মৃত ও কবরস্থ রাজনীতির পটভূমিকা। জানি, অনেকেই বলবেন, আমি অনেক ব্যক্তিগত প্রশ্নের অবতারণা করেছি যা দিয়ে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ সত্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যক্তি নিয়েই সমাজ এবং ব্যক্তির প্রতি সমাজের ব্যবহারের বিশ্লেষণ দিয়েই সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিরূপণ হওয়া সম্ভবপর।

দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার মূল যখন অত্যন্ত গভীর প্রত্যন্তপ্রদেশে বিস্তৃত তখন শুধু 'হরিজন' পড়লে বা জোরসে রামধুন করতে পারলে বা চরকায় ভালো সুতো কাটতে পারলেই দেশের সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবে এই ধরণের একটা মনোভাব মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যেরা দেশময় পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই বিশ্বাস যে কতদূর ভ্রান্ত মহাত্মা গান্ধীর জীবদ্দশাতেই তা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

রাজনীতির সংস্রব পরিত্যাগ করে যখন তিনি পুনরায় ব্যারিস্টারী ব্যবসায়ে যোগদান করেন তখন অবশ্য অগ্নিযুগের বহু বিপ্লবী নেতা বিনা পারিশ্রমিকে তাদের মামলা পরিচালনা করবার জন্যে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের কাছে আসতেন। এইভাবে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার তিনজন প্রধান আসামী অনন্ত সিং, লোকনাথ বল ও গণেশ ঘোষকে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে মাসাধিক কাল অমানুষিক পরিশ্রম করে ও হাজার হাজার টাকার মামলার কাজ ফেরত দিয়ে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। অনন্ত সিংয়ের দাদা গোলাব সিং তখন বীরেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন (২০.২.৩২)ঃ

"এই মামলা গ্রহণ করে যে ত্যাগ, পরিশ্রম ও কষ্ট আপনি করেছেন তার জন্য আপনার মক্কেলরা আপনার উপর কৃতজ্ঞ।"

কিন্তু এই কৃতজ্ঞ হওয়ার নমুনা হিসাবে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও তার মামলার যতগুলি ইতিহাস আজ পর্যন্ত বেরিয়েছে তাতে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নাম কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। 'মেদিনীপুরের ক্যাওট' যে বিনা পারিশ্রমিকে বহু ত্যাগ স্বীকার করে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন ইতিহাসে সেটা উল্লেখ থাকুক এটা বোধহয় তাঁদের পক্ষে খুবই লজ্জার বিষয়।

www.pathagar.com

১৯৩৫ সালের ২৪শে নভেম্বর কলকাতার মেয়র ফজলুল হক বলেছিলেনঃ "দুর্ভাগ্যবশত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল পরাধীন দেশে জন্মেছিলেন তাই এদেশে তিনি সমাদর পাননি। স্বাধীন দেশে জন্মালে তিনি হিটলার বা মুসোলিনীর মত সম্মান পেতেন।" (এঁরা তখন যেমন পেতেন)।

জাতীয় আন্দোলনে কংগ্রেসের ভেতর ও বিপ্লববাদীদের ভেতর বীরেন্দ্রনাথের মত নিঃস্বার্থ সেবক আরও অনেকে ছিলেন। কিন্তু নলিনী সরকারদের দাপটে তাঁরা আস্তে আস্তে সকলেই রাজনীতি থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিতে বাধ্য হন। সমগ্র ভারতবর্ষে এইভাবে ধীরে ধীরে নলিনী সরকাররাই কংগ্রেসের কর্তা হয়ে উঠলেন এবং কংগ্রেসের ঘোষিত আদর্শ যা-কিছু ছিল তার সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি হলো।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ও স্বাধীনতায় কতখানি ফাঁকি থেকে গেছে সেটা পরিষ্কার করে বোঝবার এখন সময় এসেছে। আমাদের দেশের আধুনিক কালের যে রাজনৈতিক ইতিহাস আমি আলোচনা করেছি তা থেকে কতকগুলি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে। প্রথমত, দেশের শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক নেতারা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অংশীদার হিসাবে থাকবার আদর্শকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলে দেশের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পরিকল্পনায় আমাদের নেতারা বড়লোক, জমিদার ও মিলমালিকের সুখ সুবিধার যাতে কোনোরকম ক্ষতি না হয় তার জন্য সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। তৃতীয়ত, মহাত্মা গান্ধী থেকে আরম্ভ করে আমাদের দেশের প্রধান নেতারা অনেক সময়ে স্বাধীনতার খুব উচ্চ আদর্শের ফাঁকা বুলি আউড়িয়ে দেশবাসী ও জগৎবাসীকে মুগ্ধ রাখতেন, কিন্তু কাজের সময়ে তাঁদের আদর্শের সেই মহত্ব বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের বিশ্বস্ত সহ-যোগীদের দ্বারাই পদদলিত হতো এবং তখন এঁরা কেউই মুখ খুলে প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে সাহস করেন নি। চতুর্থত, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি এবং বিশেষ বিশেষ উপদলের রাজনৈতিক প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্য সামান্যতম নৈতিক আদর্শের বালাই দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক কর্মীরাও রাখতেন না। এবং নেতারা এইসব তিক্ত প্রশ্নের সমাধানের দায়িত্ব চিরদিন এড়িয়ে গিয়েছেন। পঞ্চমত, দেশ স্বাধীন হলে দেশকে কিভাবে গড়ে তুলতে হবে সে বিষয়ে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাদের মনে পরস্পর বিরোধী পরিকল্পনা ছিল। ষষ্ঠত, স্বাধীনতার নামে আমাদের দেশে বহু চিন্তাধারার প্রচলন হয়েছিল যা স্বাধীনতার পরিপন্থী। সপ্তমত, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমাদের দেশে যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল তা অনেকটা ইংরেজের অনুকরণে

www.pathagar.com

এবং ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই ধার করা বিজাতীয় জাতীয়তাবাদ কোনদিনই ভারতবর্ষের মাটিতে গভীর-ভাবে গেড়ে বসতে পারেনি এবং সেইজন্য আমাদের দেশে কোনোদিনই সত্যকার ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠেনি। আমাদের নব-দীক্ষিত জাতীয়তাবাদীরা তা সব সময়ে চানওনি পাছে তাদের জাতীয়তাবাদের 'মনোপলি' নষ্ট হয়ে যায়।

বলা হয়ে থাকে, ভারতের হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সমন্বয়বাদী। অর্থাৎ ভারতের অধিবাসীরা পরস্পরবিরোধী মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করে মানবজাতির মূলগত ঐক্যের উপাসনা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সমন্বয়বাদ আমাদের দেশে এতদূর গভীরভাবে বিস্তৃত হয়েছে যে সত্য এবং মিথ্যা, ন্যায় এবং অন্যায়, ধর্ম এবং অধর্ম, যুক্তি এবং অন্ধবিশ্বাস, রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং বিধান রায় এসবের মধ্যেকার সকল পার্থক্য আমরা দূর করে দিয়েছি।

বর্তমানের কংগ্রেসকে অনেকে দুর্নীতিপরায়ণ বলছেন। অনেকে বলছেন, কংগ্রেসের মধ্যে অনেক বাজেলোক ঢুকে গিয়েছে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের সময়ে বা মহাত্মা গান্ধীর সময়েও কংগ্রেসে বহু দুর্নীতি ছিল। এমন কি তাঁদের নেতৃত্বের সময়েও কংগ্রেসে বহু লোক ঢুকে পড়েছিলেন যাঁরা রাজনীতিকে একটা অর্থাগমের উপায় বলে মনে করতেন। এই দুরবস্থার জন্য শুধু বর্তমান নেতৃত্বকে দায়ী করলে অন্যায় হবে। কংগ্রেসে যে সকল 'আচার্য' শ্রেণীর সাত্ত্বিক ভক্তেরা চিত্তরঞ্জন দাশের সময় থেকে কংগ্রেসের দুর্নীতির কথা ও কংগ্রেসের দুর্নীতির সংগে মহাত্মা গান্ধীর আপোষের কথা চোখ বন্ধ রেখে এড়িয়ে গেছেন তাঁরাও এই অবস্থার জন্য কম দায়ী নন।

আসলে ভারতের সমস্যা কোনদিনই রাজনৈতিক নয়। ভারতের সমস্যা সামাজিক। যতদিন এ-দেশে সমাজ বিপ্লব সংঘটিত করে সমাজের পচা পুরাতন অচলায়তনগুলিকে আমরা ভেঙে গুঁড়ো না করে দিতে পারছি ততদিন দেশে সৎ রাজনীতিক পাওয়া অসম্ভব হবে এবং সৎ রাজনীতিক কর্মীরা ক্রমশই অকার্যকরী হয়ে পড়বেন।

বিপ্লব মানে মারামারি কাটাকাটি নয়। বিপ্লবের অর্থ হলো পুরাতন মূল্যবোধের জায়গায় নূতন ও মহত্তর মূল্যবোধের ভিত্তিস্থাপন। বিপ্লব করেও যদি নূতন ও মহত্তর মূল্যবোধের ভিত্তিস্থাপন না করা যায় তাহলে বিপ্লবও ব্যর্থ হয়। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি বটে কিন্তু গতানুগতিক সামাজিক মূল্যবোধের কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারিনি। সেইহেতু, আমাদের স্বাধীনতা লাভ ব্যর্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেনঃ

"Political freedom does not give us freedom when our mind is not free....We must never forget in the present day that those who have got their political freedom are not necessarily free, they are merely powerful. The passions which are unbridled in them are creating huge organizations of slavery in the disguise of freedom....In the so-called free countries the majority of the people are not free, they are driven by the minority to a goal which is not even known to them. This becomes possible only because people do not acknowledge moral and spiritual freedom as their object. They create huge eddies with their passions, and they feel dizzily inebriated with the mere velocity of their whirling movement taking that to be freedom. But the doom which is waiting to overtake them is as certain as death for man's truth is moral truth and his emancipation is in the spiritual life." (Nationalism, pp. 120-22).

"যদি আমরা মনে মনে স্বাধীন না হয়ে থাকি তাহ'লে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের স্বাধীন ক'রে দিতে পারবে না। আমাদের এটা কিছুতেই ভোলা উচিৎ নয় যে যারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে তারা প্রকৃত-পক্ষে স্বাধীন নয়, তারা ক্ষমতাবান হয়েছে মাত্র। যে প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে বল্গাহীন হয়ে উঠেছে সেটি স্বাধীনতার মুখোশ পরে দাসত্বের বিরাট আয়োজন সৃষ্টি করছে। তথাকথিত স্বাধীন দেশগুলিতে অধিকাংশ লোকই স্বাধীন নয়—তারা একটি সংখ্যাল্প গোষ্ঠীর দ্বারা এমন একটা লক্ষ্যের দিকে তাড়িত হচ্ছে যার কথা তারা নিজেরাও জানে না। এটা সম্ভব হচ্ছে মাত্র এই কারণেই যে মানুষ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাকে নিজেদের লক্ষ্য বলে স্বীকার করে না। তারা নিজের প্রবৃত্তির বশে বিরাট বিরাট ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করে এবং সেই ঘূর্ণায়মান গতির বেগ বলে অস্থিরতার সঙ্গে মত্ত হয়ে উঠে তাকেই স্বাধীনতা ব'লে গ্রহণ করছে। কিন্তু যে ধ্বংস তার সম্মুখে অপেক্ষা করছে তা মৃত্যুর মতই অমোঘ কারণ মানুষের পক্ষে সকল সত্যই নৈতিক সত্য এবং আধ্যাত্মিক জীবনেই তার মুক্তি।" (ন্যাশন্যালিজ্‌ম, পৃঃ ১২০-২২)

www.pathagar.com

আমার লেখাগুলির মধ্য দিয়ে দেশের সম্মানিত নেতাদের লোকচক্ষে হেয় করা আমার উদ্দেশ্য বলে যদি কেউ মনে করেন তিনি ভুল করবেন। যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদান করেন কোনো দেশই তাঁদের ভুলতে পারে না। কিন্তু দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন আর নেই; তার চেয়েও বড় প্রশ্ন এখন দাঁড়িয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার। একথা দেশের এখন প্রায় সকলেই বলছেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমরা এখনও অর্জন করতে পারিনি। অদূর ভবিষ্যতে জনগণের সামাজিক স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কথাও কেউ কেউ বলছেন। ধনী-দরিদ্রের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যও জনগণের সামাজিক স্বাধীনতাকে বহুলাংশে ব্যাহত করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি দেখাতে চেয়েছি যে প্রায় শুরু থেকেই রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা চিত্র আমাদের দেশের নেতাদের মনে ছিল না। আজও পর্যন্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা-চিত্র দেশের কোন রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মীরা তুলে ধরতে পারেন নি। শুধু সেই কারণেই আমাদের দেশের সকল শুভ প্রচেষ্টা বহু আড়ম্বর সত্ত্বেও বার বার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

১৯২১ সালে গান্ধীজী লিখেছিলেনঃ

"The system of English education is an unmitigated evil. I put my best energy to destroy that system...Tilak and Rammohan would have been far greater men if they had not had the contagion of English learning. Rammohan Tilak were so many pigmies who had no hold upon the people compared to Chaitanya, Shankar, Kabir and Nanak. Rammohan and Tilak were pigmies before these giants. We want to bask in the sun-shine of freedom, but the enslaving system emasculates our nation. Pre-British period was not a period of slavery. We had some sort of swaraj under Moghul Rule. In Akbar's time the birth of Pratap was possible and in Aurangzeb's time a Sivaji could flourish. Has 150 years of British Rule produced any Pratap or Sivaji? What can be nobler than to die as free men of India? It is a satanic system. I have dedicated my life to destroy this system." (Young India, 13.4.1921).

"ইংরেজিতে শিক্ষাব্যবস্থা এক অপরিসীম অমঙ্গল। আমি আমার সকল

www.pathagar.com

শক্তি দিয়ে এই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চাই। ইংরেজির সংক্রমণ থেকে মুক্ত হতে পারলে তিলক এবং রামমোহন আরও মহত্তর মানুষ হতে পারতেন। রামমোহন এবং তিলক কয়েকজন বামন মাত্র ছিলেন এবং চৈতন্য, শঙ্কর, কবীর এবং নানকের মত সাধারণ মানুষের উপর তাদের কোনো প্রভাব ছিল না। এই বিরাট পুরুষদের কাছে রামমোহন ও তিলক বামনমাত্র ছিলেন। আমরা স্বাধীনতার সূর্যালোকে স্নান করতে চাই কিন্তু এই দাসসুলভ শিক্ষাব্যবস্থা সমগ্র জাতিকে জীর্ণ ক'রে দিচ্ছে। প্রাক-ব্রিটিশ যুগ দাসত্বের যুগ ছিল না। মোগল রাজত্বে আমরা একপ্রকার স্বরাজের অধিকারী ছিলাম। আকবরের কালে প্রতাপের জন্মগ্রহণ সম্ভব হয়েছিল এবং আউরঙ্গজেবের সময়ে শিবাজীর বেড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। ১৫০ বছরের ব্রিটিশ শাসন কি কোনো প্রতাপ বা শিবাজীর সৃষ্টি করতে পেরেছে? স্বাধীন মানুষ হিসাবে মৃত্যুকে বরণ করার চেয়ে ভারতে মহত্তর আর কী থাকতে পারে? এটি একটি শয়তানি শাসন ব্যবস্থা। আমি এই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করবার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করেছি।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৩৪, ১৯২১)

যে ভ্রান্ত ধারণা গান্ধীজীর এই চিন্তাধারার ভেতর দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে। এ কথা মনে রাখতে হবে শঙ্কর, চৈতন্য, কবীর, নানক এবং এমন-কি প্রতাপ ও শিবাজী যে-সমাজে জন্মাতে পেরেছিলেন ১৫০ বছর ধরে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে থেকে আমাদের দেশ থেকেই সেই সমাজ মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যে-সমাজে শঙ্কর, নানক, কবীর, চৈতন্য এমন-কি প্রতাপ ও শিবাজী জন্মাতে পারতেন তার ভিত্তি ছিল অ-রাজনৈতিক।

অষ্টিন যেমন বলেছেন, প্রত্যেক রাজনৈতিক সমাজের বা রাজ্যের একজন রাজা বা শাসক থাকে। সেই রাজা বা শাসকই তার আদেশগুলি সেই রাজ্যবাসীদের দিয়ে পালন করিয়ে নেয়, না পালন করলে রাজা বা শাসকের হাতে শাস্তি পেতে হয়। রাজার অবাধ্য হওয়ার এই শাস্তির ভয়ই রাজনৈতিক সমাজকে সমাজ বন্ধনে বেঁধে রাখে। রাজা বা শাসকের সেই আদেশগুলিই হলো সেই রাজ্য বা রাজনৈতিক সমাজের আইন এবং এই আইনই হচ্ছে ওই রাজনৈতিক সমাজের ভিত্তি।

কিন্তু হিন্দু সমাজের সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও হিন্দু মনীষার প্রধান অবদান হলো এক অ-রাজনৈতিক সমাজের ভিত্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা। অবশ্য আমার নিজের ধারণা হিন্দু মনীষার এই অবদান তথাকথিত আর্য-জাতির দ্বারা সম্পন্ন হয়নি বরং এই অবদান আর্য-পূর্ব ভারতের আদিম সভ্যতার অবদান এবং তথাকথিত আর্যরা এই অবদানের কাছে অবশেষে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যদিও প্রথম দিকে তারা এই চিন্তাধারা

www.pathagar.com

ধ্বংস করবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে ত্রুটি করেনি। এই অ-রাজনৈতিক সমাজে আইনের বিধানকে সফল করবার জন্যে রাজা বা শাসক উদ্যত দণ্ড নিয়ে বসে থাকবে না। এমন-কি রাজা বা শাসক আইনের প্রবর্তনও করতে পারবে না। অস্টিনের দল যাকে বলেছে আইন, হিন্দু মনীষা তাকেই বলেছে ধর্ম। হিন্দুর কাছে আইনশাস্ত্র তাই ধর্মশাস্ত্র। এ সমাজে রাজা বা শাসক নয় পরন্তু দার্শনিক, চিন্তাবিদ, মনস্বী বা জ্ঞানী ব্যক্তি যে-নির্দেশ দেবেন দেশের লোক তাকেই আইন বলে স্বীকার করবে ও মেনে চলবে। রাজার রক্ষীদল দণ্ড প্রয়োগ ক'রে এই আইন পালন করতে লোককে বাধ্য করবে না—সমাজের আপামর সাধারণ স্বেচ্ছায় দার্শনিক মনস্বীদের প্রবর্তিত এই আইনকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিনা দ্বিধায় মেনে চলবে। আধুনিক যুগের আইনবিদ কেলসেন যেমন বলেছেন, আইনের অস্তিত্ব নির্ভর করবে রাজার শাসনদণ্ডের প্রযুক্তির উপর নয়, করবে মানুষের স্বচ্ছ বিবেকবুদ্ধি-প্রসূত Grundnorm-এর উপর, তেমনি বহু সহস্র বছর আগে হিন্দু মনীষা সমাজের অস্তিত্বের এই অ-রাজনৈতিক ভিত্তিকেই স্বীকার করে নেবার চেষ্টা করেছিল। সে সমাজে কোন্ আইন গ্রহণীয় তার নির্দেশ রাজা বা শাসক দেবেন না—সে নির্দেশ দেবেন দার্শনিক, মনস্বী, চিন্তাবিদ এবং জ্ঞানী আর জনসাধারণ স্বেচ্ছায় তাই স্বীকার করবে। বৌদ্ধ-সম্রাটেরা যেমন সৈন্য পাঠিয়ে নয়, সন্ন্যাসী পাঠিয়ে অন্য দেশ 'ধর্ম-বিজয়' করতেন তেমনি এই অ-রাজনৈতিক সমাজে রাজা থাকতো কিন্তু সমাজ-মানসকে পরিচালনা করতো রাজার শাসন-দণ্ড নয়, পরন্তু মনস্বী চিন্তাবিদের স্বচ্ছ বিবেকবুদ্ধির শান্ত সংযত সূক্ষ্ম বিচার। হিন্দু মনীষার এই অপূর্ব অবদানে—

"হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শক হূন দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন।"

রাজা বা শাসকের শাসন-দণ্ড নিয়োজিত হয় দেশে অরাজকতা, অব্যবস্থা ও অশান্তি নিবারণের জন্য। সমাজের প্রাণের সংগে যোগ থাকে না রাজার শাসনদণ্ডের, সমাজের শরীর রক্ষার ভার থাকে তার উপর। কিন্তু সমাজের শরীরটা বাহ্যিক, প্রাণই মূল। সেই প্রাণের বিকাশের পথকে অবহেলা করে শুধু শরীরকে সুস্থ রাখবার চেষ্টা করলে তা সমাজকে নিরাপদ হয়তো রাখে কিন্তু পূর্ণ করতে পারে না। কিন্তু প্রাণই যদি পূর্ণ না হলো তাহলে শুধু নিরাপত্তার মূল্য কতটুকু? এই জন্যেই এই ভারতের মাটিতে বহু জাতির বহু দেশের মিলন-যজ্ঞে গড়ে উঠেছিল এক অ-রাজনৈতিক সমাজের ভিত্তি-ভূমি।

সেই কারণেই বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনে, বহু বিদেশী জাতির অগণিত আক্রমণে, বহু বাধা-বিপত্তি, দুর্ভিক্ষ মহামারীর আঘাতে, দেশীয় প্রতিক্রিয়া-

www.pathagar.com

শীলদের হীন চক্রান্তে ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েনি। বহু শতাব্দীর রাজনৈতিক পরাধীনতা পারেনি এদেশের সমাজের ভিত্তিকে বিচূর্ণ করতে। রাজার বদলে রাজা এসেছে, সৈন্যদলের বদলে এসেছে সৈন্যদল, হয়েছে মহামারী দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্ধ অনুশাসন দেশকে করেছে পঙ্গু, তবুও এদেশে বন্ধ হয়নি দর্শনের দর্শনের সৌম্য আলাপন, থেমে যায়নি ভাবগম্ভীর ধর্মকীর্তন, রুদ্ধ হয়ে যায়নি সীমার মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করার আকুল আহ্বান। সেইজন্যেই শঙ্কর গেছেন নানক এসেছেন, নানক গেছেন চৈতন্য এসেছেন—অসীমের যাত্রীরা এসেছেন একে একে চলে গেছেন উত্তরসূরীর পথ করে দিয়ে। প্রতাপ-শিবাজীরাও রামানন্দদের চরণতলে বসে রণ-দামামার মধ্যেও শুনেছেন সেই অসীমের কল-কাকলি।

যুগে যুগে বহু বিদেশী জাতি শক হূণ দল পাঠান মোগল ভারতের এই অপূর্ব অ-রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে অভিনন্দিত করেছে, ভারতের এই প্রাণ-স্পন্দিত অপরূপ সমাজের মধ্যে তারাও মিশে যেতে দ্বিধা করেনি। ভাষার পার্থক্য আচারের পার্থক্য ধর্মের পার্থক্য পারেনি এই অপরূপ সমাজ-বন্ধনকে চূর্ণ করতে। কারণ মূলে ছিল প্রাণের ঐক্য। সেই তো আসল—ধর্ম, ভাষা, আচার, বিশ্বাস সবই বাহ্যিক।

কিন্তু ইতিহাসে প্রথম ইংরেজরা এসেই ঘা দিল ভারতীয় মনীষার এই অপূর্ব অবদানের বিরুদ্ধে। মেকলেরই জয় হলো। ভারতের ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজের আত্মা বাঁধা পড়লো ইংরেজ বণিকের সওদাগরী আড়তে। ইংরেজের দম্ভময় হুংকারের কম্পনে ভারতের প্রাণবন্ত আদি সমাজ ভেঙেচুরে গড়ে উঠলো এক আধুনিক রাজনৈতিক সমাজ যার প্রধান লক্ষ্য হলো প্রাণকে পূর্ণ করা নয় শুধুমাত্র সমাজদেহের বাহ্যিক নিরাপত্তাকে দৃঢ় করে তোলা। আমাদের প্রাণ ছিল কিন্তু আইনের শাসন (Law and Order) ছিল না। ইংরেজ আমাদের Law and Order এনে দিল কিন্তু আমাদের প্রাণকে আমরা হারালুম।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ

"এই আমাদের ভারতবর্ষ যা অন্ততঃ পঞ্চাশ শতাব্দী তো হবেই, শান্তির জীবন যাপন করতে চেয়েছিল এবং চিন্তার গভীরতায় মগ্ন ছিলো। এই সেই ভারত, সকল প্রকার রাজনীতিবর্জিত এবং নেশন-বাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন, যার একমাত্র আকাঙ্খা ছিলো এই জগতকে আত্মার জগত বলে উপলব্ধি করা, তার সঙ্গে এক অনন্ত এবং অন্তরতম যোগসূত্রের উৎফুল্ল চেতনায় জীবনকে অতিবাহিত করা। ব্যবহারে শিশুসুলভ এবং অতীতের জ্ঞানে বৃদ্ধ মনুষ্য জাতির এই একান্ত অংশটির উপরে পশ্চিমের নেশন-বাদ বিস্ফোরিত হলো। অতীত ইতিহাসের সকল দ্বন্দ্ব, সকল ষড়যন্ত্র ও বঞ্চনা থেকে ভারত পৃথক

www.pathagar.com

হয়েই ছিলো। কারণ তার কুটির, তার শস্যক্ষেত্র, তার পূজার মন্দির, তার শিক্ষালয় যেখানে আচার্য ও ছাত্রেরা একত্রে এক অনাড়ম্বর শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের বাতাবরণে বাস করতো—তার সরল বিধিনিয়মের ও শান্তিময় ব্যবস্থাপনার গ্রাম্য স্বায়ত্ব-শাসন—এ কলই ছিলো তবে তার একমাত্র নিজস্ব। কিন্তু রাজ-সিংহাসনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। এ সকলই তার মাথার উপর দিয়ে কখনও রক্তিম বর্ণচ্ছটায়, কখনও বজ্রাঘাতের গতিতে মসীবর্ণ মেঘমালার মত উড়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে এসব বয়ে নিয়ে আসতো ধ্বংসের বোঝা কিন্তু সাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত সেগুলিও শীঘ্রই স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেত।")

("আমরা মোগল এবং পাঠানকে দলে দলে আসতে দেখেছিলাম কিন্তু তাদের আমরা মনুষ্যজাতির অংশ হিসাবেই চিনে নিয়েছি—চিনেছি তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক প্রথাগুলিকে এবং তাদের আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণাকে। কিন্তু তাদের আমরা কখনও নেশন হিসাবে চিনতে শিখিনি। ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাদের ভালবেসেছি অথবা ঘৃণাও করেছি। আমরা তাদের পক্ষে অথবা তাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেছি। যে ভাষায় তাদের সাথে কথা বলেছি তা একদিকে তাদেরও ছিল, অন্যদিকে আমাদেরও এবং এইভাবে এই সাম্রাজ্যের ভাগ্যকে পরিচালিত করেছি যাতে আমরা কার্যকরী-ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এবারে আমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধ হচ্ছে কোনো বস্তুর সঙ্গে নয়, কোনো মনুষ্যজাতির সঙ্গে নয় পরন্তু একক নেশনের সঙ্গে—সেই আমাদের যারা নেশনবাদের বাইরে।" (ন্যাশন্যালিজ্‌ম)

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংগে ভারতের আদর্শের এই মূল পার্থক্য ছিল যে, অন্যান্য দেশ প্রত্যেকেই নিজেদের এক একটি নেশন বলে ভাবত। এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতি এক আচার ব্যবহারের ভেতর দিয়ে তারা নিজেদের নেশনত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করতো। ভারতবর্ষের আদর্শ ছিল ভিন্ন। বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন আচার ব্যবহারের এক সম্মিলিত মানব-গোষ্ঠীকে নিয়ে এক স্বয়ং শাসিত সমাজ গঠনের পরি-কল্পনা হয়েছিল এই ভারতবর্ষের বুকে। এই পরিকল্পনায় তথাকথিত আর্যদের দান ছিল সামান্যই। এ পরিকল্পনা মূলত ছিল ভারতের আদিম অধিবাসীদের, এর স্রষ্টাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন তথাকথিত অনার্য। আর্য আক্রমণে আদিম ভারতের প্রায় সব কিছুই ধ্বংস হয়নি ভারতের এই অনাদি অবিনশ্বর আদর্শ। আর্যদের লেখা বেদের স্থানে স্থানে গভীরতম হিংসা দ্বেষের মন্ত্র প্রচার করা সত্ত্বেও ভারতের এই চিরন্তন আদর্শকে আর্যরা ধ্বংস করতে পারেনি। মহামতি বুদ্ধ আর্যদের লেখা বেদের প্রাধান্য অস্বীকার করে ভারতের আত্মিক আদর্শের জয়পতাকা আবার তুলে ধরেছিলেন

www.pathagar.com

বিশ্বের বুকে। তাঁর ভক্ত বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্রাটের আমলে সৈন্য দিয়ে নয় সন্ন্যাসী দিয়ে ধর্ম বিজয় করা হতো। শঙ্করের অভ্যুত্থানে বৌদ্ধ ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিন্তু বুদ্ধের আদর্শ বা ভারতের আদিম আদর্শের অপহ্নব তিনি ঘটাতে পারেননি। এমন কি মুসলমান আক্রমণকারীদের তীব্র আক্রমণও ভারতের এই অমর আদর্শকে হিন্দু মানস থেকে নির্মূল করতে পারেনি।

শক হূণ পাঠান মোগল যা পারেনি ইংরেজ তাই পারলো। ইংরেজরাই প্রথম আমাদের নেশনত্ব তৈরী করে দিল। ইংরেজের কাছ থেকেই আমরা নিলাম নেশনত্বের শিক্ষা। বৌদ্ধ হিন্দু এমনকি মুসলমান সম্রাটেরা ভারতের গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনে কখনও হস্তক্ষেপ করেনি। ভারতের গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন বহু সহস্র বছর ধরে স্বয়ং-চালিত ছিল। কিন্তু ইংরেজরা সেই গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনেও রাজনীতির বিষ ঢুকিয়ে দিতে ছাড়েনি। এই কারণেই বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন করে মেদিনীপুর থেকে ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নিতে তখনকার বাংলা সরকারকে বাধ্য করেছিলেন।

এ ব্যাপারে শুধু ইংরেজের দোষ দেওয়াও বোধহয় ঠিক হবে না। কারণ যুগ-পরিবর্তনে নেশনত্বের বিষ-বহ্নি ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই। যদি ইংরেজরা ভারতে না আসতেন তাহলে যুগধর্মের তাগিদে হয়তো অন্য কোন জাতির কাছ থেকে এই নেশন-বাদের পাঠ নিতে হতো ভারতবর্ষকে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জাপান পরিভ্রমণকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জাপানকে ইয়োরোপীয় সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ থেকে বিরত হবার জন্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেনঃ

("জাপানের পক্ষে যা বিপদজনক তা পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক অবয়বের অনুকরণ নয় পরন্তু পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের গতিশক্তিকে নিজেদের ব'লে গ্রহণ করা। তার সামাজিক আদর্শগুলিতে রাজনীতির নিকট পরাস্ত হবার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি তার আপ্তবাক্য হচ্ছে বিজ্ঞান থেকে ধার করা, 'যোগ্যতমই বিদ্যমান থাকবে', যে আপ্তবাক্যের আসল অর্থ হচ্ছে 'নিজেরটা গুছিয়ে নাও এবং তাতে অপরের কোনো ক্ষতি হ'লে গ্রাহ্য কোরো না।'—যে আপ্তবাক্য শুধু অন্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সাজে যে স্পর্শের দ্বারা যা কিছু জানতে পারে শুধু তাতেই বিশ্বাস করে কারণ সে চোখ দিয়ে কিছু দেখতে পায় না। কিন্তু যারা দেখতে পায় তারা জানে যে মনুষ্যজাতি এত ঘন সন্নিবন্ধ যে একজনকে আঘাত করলে সে আঘাত আঘাতকারীর কাছেই ফিরে আসে।) নৈতিক বিধি যা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার সেটা শুধু এই অপরূপ সত্যেরই আবিষ্কার যে মানুষ যতই অপরের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে ততই সে সত্যতর হ'য়ে ওঠে। সত্য শুধু উপলব্ধির দিক থেকে মূল্যবান নয় বরং তা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিকশিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

যে সকল জাতি নৈতিক অন্ধত্বকে গোপনে গোপনে উৎকর্ষতা দান ক'রে দেশপ্রেমের সাধনা করে অকস্মাৎ ও বিধ্বংসী মৃত্যুর মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করবে। অতীতের যুগে আমাদের বিদেশী আক্রমণ হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি মানুষের অন্তরাত্মাকে গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারে নি। সেগুলি ছিল ব্যক্তিবিশেষের উচ্চাকাঙ্খার ফলশ্রুতি। এই সকল আক্রমণের হীন এবং ঘৃণ্য প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষ মুক্ত ছিল বলে তারা এসবের মধ্যে থেকে বীরোচিত এবং মনুষ্যোচিত শিক্ষাটুকুর সকল সুবিধা গ্রহণ করতো। এর ফলে তাদের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল তাদের দুরতিক্রম্য অনুরক্তি মর্যাদার দায়িত্বগুলির প্রতি তাদের একাগ্রচিত্ত নিষ্ঠা, তাদের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের শক্তি এবং তাদের মৃত্যু ও বিপদের ভয়হীন অধিগ্রহণ।

"সেইজন্য নৃপতি বা সেনাধ্যক্ষরা কি নীতি গ্রহণ করতো সেগুলি সাধারণ মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আদর্শগুলির সবিশেষ পরিবর্তন সাধন করতে পারতো না। কিন্তু এখন যখন পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের আদর্শের প্রাধান্য রয়েছে সমগ্র মানবসমাজকে তখন শিশুকাল থেকে সকল রকম উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে তারা ঘৃণা ও লোভকে পোষণ করতে পারে এবং তা করা হয় ইতিহাসের অর্দ্ধসত্য ও অসত্য প্রচার মাধ্যমে, করা হয় অপর জাতিগুলি সম্বন্ধে অন্তহীন তথ্যবিকৃতির দ্বারা, করা হয় সেই সকল ঘটনার স্মৃতিস্তম্ভ রচনা ক'রে যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মিথ্যা, শুধুমাত্র অন্য জাতি সম্বন্ধে অপ্রীতিকর মানসিকতা তৈরী করার জন্যে যেগুলি মনুষ্যজাতির মঙ্গলের জন্যে যতশীঘ্র সম্ভব বিস্মৃত হওয়া উচিৎ এইভাবে প্রতিবেশী জাতি ও দেশগুলির প্রতি এক দুষ্ট অসহিষ্ণুতাকে নিয়ত উৎপন্ন করে। এইভাবে সমগ্র মানবজাতির উৎসসূত্রটিকে বিভক্ত করে তোলা হচ্ছে।" (ন্যাশন্যালিজম, ম্যাক্‌মিলান, পৃঃ ৭৭-৭৯)

বিশ্বকবির এই সাবধানবাণী সম্বন্ধে জাপানী সংবাদপত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের বাণীর প্রশংসা করে বলেছিলঃ

"...these utterances are full of poetical qualities but it is the poetry of a defeated people."

"এই বক্তৃতাগুলি কবিসুলভ গুণাবলীর দ্বারা পূর্ণ কিন্তু এসবই হচ্ছে একটি পরাজিত জাতির কাব্য।"

জাপানী সংবাদপত্রগুলির এই সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেনঃ

"ক্ষত-বিক্ষত মনুষ্যত্বের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ বহুদিন ধরে পুষ্টিলাভ করেছে। মনুষ্যজাতি যা ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে সুন্দরতম, তাদের যান্ত্রিকতার করুণাকর অমোঘত্ব সম্বন্ধে হাস্যকর অহমিকা নিয়ে যুদ্ধবাজ ও অর্থকরী ক্রীড়নক রূপে জাতীয়তাবাদের উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে বেরিয়েছে। সমগ্র মনুষ্য

www.pathagar.com

সমাজ ধীরে ধীরে রাজনীতিক, সেনাদল, যন্ত্রশিল্পী ও আমলাদের নিয়ে এক পুতুল নাচের খেলায় মেতে উঠেছে যার দড়ি টানবার ব্যবস্থা করা আছে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে।

"কিন্তু স্বার্থপরতাকে ধর্মে রূপান্তরিত ক'রে এর ঘৃণা ও লোভ, ভীতি ও কপটতা, সন্দেহ ও অত্যাচারের অন্তহীন প্রজন্মকে কোনোদিনই চরম লক্ষ্য বলে নির্দিষ্ট করা যাবে না। এই দৈত্যগুলি বিরাট আকারে বেড়ে ওঠে কিন্তু কখনও ঐক্যরূপে নয়। এবং এই জাতীয়তাবাদ হয়ত একদিন এক অকল্পনীয় স্ফীতির রূপ পরিগ্রহণ করতে থাকবে কিন্তু সেটা কোনো প্রাণবন্ত বস্তুর হবে না, হবে লৌহ-বাষ্প ব্যবসা কেন্দ্রের অট্টালিকার, যতক্ষণ না এই বিকৃতি তার কুৎসিত বৃহত্বকে ধারণ করতে অক্ষম হবে, যতক্ষণ এর ফাটল এবং ব্যাদান শুরু না হবে এর নিশ্বাসে নিশ্বাসে থেকে থেকে বাষ্প ও বহ্নি নির্গত না হবে, এর মৃত্যুযন্ত্রণা কামানের গর্জনের মধ্যে ধ্বনিত না হবে।" (ন্যাশন্যালিজম, ম্যাকমিলান, পৃঃ ৪৪)

ইংরেজরা যখন আমাদের নেশনত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে শিক্ষা দিলেন তখন জাপানের মত আমরা যা করলাম তাও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় imitation of the outer features of the West. ভারতের অনাদি অবিনশ্বর অ-রাজনৈতিক সমাজের আদর্শ আমাদের দেশ থেকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ১৫০ বছরের ইংরেজী শিক্ষা ও প্রভাবে আমাদের দেশে নেশনত্বের আদর্শে সংগঠিত যে রাজনৈতিক সমাজ ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো তাতে শঙ্কর, চৈতন্য, নানক কবীরের জন্ম ত অসম্ভব হলোই এমন-কি স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সে সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে উঠলেন। তাঁর বিরুদ্ধে দেশবাসীর এই মনোভাবের কথা জেনেই প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ১৯২১-এর ৮ই ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রনাথ দীনবন্ধু এণ্ড্রুজকে লিখেছিলেনঃ

"I am afraid I shall be rejected by my own people when I go back to India. My solitary cell is awaiting me in my motherland."

"আমি আশংকা করি আমি যখন ভারতে ফিরে যাবো তখন আমার দেশের লোক আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে। আমার দেশে আমার জনহীন প্রকোষ্ঠটি আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।"

ভারতের অবিনশ্বর আত্মিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ চিরদিন সত্যের জন্যে, ন্যায় বিচারের জন্যে লড়াই করেছেন কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শের যূপ-কাষ্ঠে তাঁর মানব-মৈত্রীর মহান আদর্শকে বিসর্জন দিতে কখনও স্বীকৃত হন নি। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস নরমেধ যজ্ঞের প্রতিবাদে তিনি ইংরেজ সরকারের দেওয়া নাইট পদবী ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালা-

www.pathagar.com

বাগ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিস্তম্ভ রচনার বিরোধিতা করে তিনি বলেছিলেন যে এর দ্বারা উন্মত্ত হিংসার ও বিদ্বেষের স্মৃতিকে চিরজাগরূক করে রাখা হবে যার কোনো সার্থকতা নেই।

ভারতের এই শাশ্বত আদর্শকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের যেমন আকুলতা ছিল ঠিক তেমনই ছিল বিবেকানন্দের। তিনিও বার বার বলেছেন যদি ভারতীয় সমাজ মানসের অ-রাজনৈতিক ভিত্তিকে পরিবর্তিত করে রাজনৈতিক ভিত্তিতে দাঁড় করানো যায় তার অনিবার্য ফল হবে ধ্বংস।

জাপানীরা রবীন্দ্রনাথের যে বাণীকে "poetry of a defeated people" বলে ব্যংগ করেছিল তাকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ

"আমরা যারা বিশ্বের মধ্যে নেশনত্বহীন, যাদের মাথা ধূলায় লুণ্ঠিত করা হয়েছে, তারা জানবো, যে ইষ্টকখণ্ডের দ্বারা ক্ষমতাদম্ভের ভিত্তি গড়ে ওঠে তার তুলনায় এই ধূলা অধিকতর পবিত্র। কারণ এই ধূলা জীবনের দ্বারা, সুন্দরতার দ্বারা ও অর্চনার দ্বারা সঞ্জীবিত। আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবো যে হতাশাময় রাত্রির মধ্যে আমরা নীরবে প্রতীক্ষা করে থেকেছি, দাম্ভিকের লাঞ্ছনা ও ক্ষমতাবানের বোঝা আমাদের বহন করতে হয়েছে এবং সকল অবস্থাতেই যদিও আমাদের হৃদয় দ্বিধা ও ভীতির ভারে কম্পিত হয়েছে তথাপি আমরা যন্ত্রদানব নীতি মানব মুক্তির সম্ভাবনাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে পারিনি এবং আমরা ঈশ্বর-নির্ভরতা ও মানবাত্মার নিহিত সত্যকে আঁকড়ে ধরে থেকেছিলাম, এবং এখনও সেই আশা পোষণ করতে পারি ক্ষমতার দম্ভ যখন তার আসনে অধিষ্ঠিত থাকতে লজ্জিত হ'য়ে উঠবে এবং মানবপ্রেমের আবাহনের জন্যে পথ ছেড়ে দেবে এবং প্রত্যুষে যখন মানবজাতির গতিপথে নেশনবাদের দ্বারা রক্তসিঞ্চিত সিঁড়ির ধাপগুলি কলুষমুক্ত করে দেবার সময় আসবে তখন আমাদের পবিত্র বারিপূর্ণ কলস নিয়ে আসবার জন্যে আমাদেরই ডাক পড়বে। মনুষ্য ইতিহাসকে অর্চনা-বারি সিঞ্চনে পবিত্রতায় মধুর ক'রে তোলবার জন্যে যে বারি-সিঞ্চনে বহু শতাব্দীর পরিত্যক্ত ধূলি সম্ভাবনাময় আশীর্বাদে পূর্ণ হয়ে উঠবে।"

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীরা ভারতের এই চিরন্তন আদর্শেরই প্রচার করেছিলেন যে, শত দুর্বলতা শত অক্ষমতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক পরাধীনতা কোনদিনই ভারতের আত্মাকে পরাধীন করতে পারেনি। আত্মার স্বাধীনতাকে ভারতবর্ষের প্রাণ চিরদিন অনির্বাণ দীপশিখার মত উজ্জ্বল করে রেখেছিল তার কারণ রাজনীতির বিষ তার প্রাণকে কখনও সম্পূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত করতে পারেনি। যুগে যুগে বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, কবীর, চৈতন্য, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ভারত-আত্মার এই অমর বাণীই প্রচার

www.pathagar.com

করে গেছেন যে, আত্মার স্বাধীনতাই মুখ্য, সে স্বাধীনতার আলো প্রজ্বলিত থাকলে রাজনৈতিক পরাধীনতা তাকে খর্ব করতে পারে না। আত্মিক স্বাধীনতার আদর্শই রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শকে রূপায়িত করে। আত্মিক স্বাধীনতায় বিশ্বাস না থাকলে ছাপানো সংবিধান, সৈন্যবল, নৌবল কোনো কিছুই সত্যকার স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারে না।

নিজেদের বহু দুর্বলতা ও অক্ষমতায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা হারিয়েলিাম বহুদিন আগে। ব্যাবিলন, মিশর, রোম প্রভৃতি প্রাচীন সাম্রাজ্য রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হারাবার পরই ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু শত দুর্বলতা ও অক্ষমতা সত্বেও ভারত যে ধ্বংস হলো না তার কারণ আত্মার স্বাধীনতার যে দীপশিখা জ্বলেছিল এ-দেশে তা নিবে যায়নি দেশবাসীর মন থেকে। আত্মার স্বাধীনতার সেই পরম মহিমময় সূত্র দিয়ে বিশ্বজীবনের সংগে একীভূত হয়ে গিয়েছিল ভারতবাসীর মন।

গান্ধীজীও ভারতের এই শাশ্বত অবিনশ্বর আদর্শকেই প্রচার করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই জন্যই গান্ধীজী বলতে পেরেছিলেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শ সংকীর্ণ এবং নিকৃষ্ট। কিন্তু ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অংশীদারত্বের মধ্যে অনেক গৌরব আছে এই ঘোষণা করে তিনি ভারতের নবজাগ্রত রাজনৈতিক সমাজের বাণীকেই স্বীকৃতি দিলেন। তিনি ভারতের নব-জাগ্রত রাজনৈতিক সমাজের তাগিদে ভারতের চিরন্তন বিশ্বজনীন আদর্শকে বলি দিলেন। ভারত স্বাধীন হলে পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির সংগে অংশীদারী করবে এই কথা বললেই সেটা ভারতীয় আদর্শের পরিপূরক হোত। শুধু ব্রিটেনের সংগেই বিশেষ সূত্রে বাঁধা থাকবার আদর্শ কোনো ক্রমেই ভারতের চিরন্তন বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ বলে স্বীকৃত হতে পারে না।

গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শ আত্মার স্বাধীনতার আদর্শ থেকেই উদ্ভুত। আত্মা যেখানে স্বাধীন সেখানে সকল দৈহিক নির্যাতনকে উপেক্ষা করে আত্মার স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। কিন্তু এই অরাজনৈতিক পন্থা দিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টা গান্ধীজীর আদর্শকে প্রথম থেকেই একটা গোঁজামিলের আদর্শে পরিণত করলো। যে নিজেকে স্বাধীন মনে করে অহিংস অসহযোগ দ্বারা নিজের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে তার কিছুমাত্র বিঘ্নিত হবার কথা নয়। সেত স্বাধীন হয়েই আছে তার আবার স্বাধীনতা কি? কিন্তু স্বাধীন রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য যে-লড়াই তার জন্য এই ধরণের অরাজনৈতিক পদ্ধতি কখনও সমীচীন হতে পারে না। যে স্বাধীন হয়েই আছে যার আত্মার স্বাধীনতা কেউ ক্ষুণ্ণ করতে পারে না তার স্বাধীন রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজনই বা কি? কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম রাজনৈতিক ক্ষমতা

www.pathagar.com

অর্জনের জন্যই চালানো হয়েছিল। সে সংগ্রামে আত্মিক স্বাধীনতার আদর্শকে গান্ধীজী রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। পৃথিবীর কেউ যা পারে নি গান্ধী তা পারবেন কি করে? তাঁর আদর্শের আন্দোলন তাই শুরুতেই ব্যর্থ হলো।

গান্ধীজীর আদর্শ ছিল আত্মার স্বাধীনতাকে জাগ্রত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু দেশের ইংরেজী শিক্ষায় ও আদর্শে শিক্ষিত এবং এদেরই অনুসরণকারী অশিক্ষিত গ্রামবাসীরাও রাজনৈতিক ক্ষমতালাভকেই চরম এবং পরম আদর্শ বলে গ্রহণ করলেন। বস্তুতঃ, দেশের স্বাধীনতা লাভ মানে রাজনৈতিক শাসন-ক্ষমতা লাভ ছাড়া অন্য কিছুর কথা আমরা কেউ ভাবতেও পারি না। ধীরে ধীরে গান্ধীজী এই রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের আদর্শের কাছেই নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন। তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর অপরূপ অরাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করা প্রায় অসম্ভব। স্বরাজ্য দলের সংগে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর ভারতের নবজাগ্রত রাজনৈতিক সমাজের কাছে গান্ধীজীর আত্মসমর্পণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৯২৬ সালেই জওহরলাল নেহরু রোম্যাঁ রোলাঁর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন যে ভারতের শিক্ষিত সমাজের, ভারতের elite-এর উপর গান্ধীজীর প্রভাব একদম মুছে গেছে যদিও দেশের সাধারণ মানুষের উপর তাঁর প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়নি (Inde. পৃঃ ১৫৭)। কিন্তু ভারতের সাধারণ মানুষও যে ধীরে ধীরে গান্ধীপথ পরিত্যাগ করে ভারতের elite-এর পথই অনুসরণ করেছিল সেকথা সবিনয়ে স্বীকার করলে সত্যকেই স্বীকার করা হবে। ধীরে ধীরে গান্ধী এবং তাঁর আদর্শ যে দেশের জনসাধারণ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিল সেটা গান্ধীজী নিজেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র গান্ধীশিষ্য পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন ১৯৩৯ সালে। তখন গান্ধীজীকে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করতে হয়েছিলঃ এটা আমারই পরাজয় (This is my defeat).

বস্তুতঃ, গান্ধীজীর অর্দ্ধনগ্ন উপবাস ক্লিষ্ট মূর্তির কথা চিন্তা করলে আমাদের দেশের লোক মনে ক'রে থাকে তিনি যেন বহু সহস্রযুগের পুরাতন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন যে ভারত বহুযুগ আগেই হ'য়ে গেছে নির্মূল, নিশ্চিহ্ন। এখনকার ভারতে গান্ধীর অর্দ্ধ নগ্ন উপবাস ক্লিষ্ট মূর্তি যেন একটা বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন; আমাদের সংগে যেন এর কোনো যোগ নেই, নেই কোনো মিলনের সূত্র। তিনি যেন সংগ্রহশালার এক মহৎ নিদর্শন। এই অর্দ্ধ নগ্ন বেশে গান্ধীজী যে এক বিরাট জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন সেটা যেন আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়। মনে হয় গান্ধীজী যা বলতে চেয়েছিলেন কোথায় যেন তার সংগে আমাদের মিল নেই।

www.pathagar.com

কিন্তু সামরিক পোষাকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তিকে আমরা সহজেই আমাদের নিজেদের প্রতিনিধিত্বমূলক বলে মনে করি। তিনি যেন আমাদের নিজেদের একান্ত হৃদয়ের বাণীকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। ইংরেজের শেখানো বিদ্যা দিয়েই তিনি ইংরেজকে জব্দ করেছিলেন। ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক সমাজের সবই ছিল। ছিল না শুধু একজন মিলিটারী হিরো, যার ছবি পশ্চিমের জাতিগুলির উদ্দেশে তুলে ধ'রে আমরা বলতে পারিঃ "আমাদের সমাজও অপূর্ণ নয়—এই যে আমাদের মিলিটারী হিরো (military hero)"। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সামরিক পোষাকের মূর্তি আমাদের সমাজের সেই অপূর্ণতাকে দূর করেছে। পশ্চিমের নেশনগুলির সংগে এখন আমরা নিজেদের তাদের সমকক্ষ বলেই বিশ্বাস করতে পেরেছি। কারণ আমরা জানি আর যাই থাকুক সৈন্যদল নিয়ে অন্য রাজ্য আক্রমণ করবার ক্ষমতা না থাকলে নেশন হওয়া যায় না।

ভারতের অ-রাজনৈতিক জনসমাজ যে রাজনৈতিক সমাজে পরিণত হলো এটা অবশ্য যুগপ্রবর্তনের তাড়নায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে পৃথিবীর সব দেশে নগ্ন নৃশংস নেশনবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল যার ফলে ক্রমশ সব দেশই সামরিক বলের সাহায্যে দেশের প্রয়োজনকে নিরবচ্ছিন্ন করে রাখার নির্লজ্জ আদর্শ নির্বিবাদে গ্রহণ করেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে প্রথমে চীনা বিপ্লব ও পরে রুশ বিপ্লব নতুন মতবাদের আলোকসম্পাত করলো বটে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী অন্যান্য দেশের শত্রুতার জন্য এইসব বিপ্লবী দেশেও নেশনবাদের নখর প্রবেশ করলো গভীরভাবে। স্বীকার করতেই হবে, পৃথিবীময় নেশনবাদের এই-যে নগ্ন অভিযান এর থেকে ভারতকে রক্ষা করবার শক্তি হয়ত কারোরই, এমন-কি গান্ধীজীরও ছিল না।

কিন্তু গান্ধীজী ভুল করলেন তখন যখন তিনি নেশনবাদকেই এদেশে গড়ে উঠতে দিলেন এবং সকল প্রকারে নেশনবাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করলেন। অথচ ধারণা করে রাখলেন যে এদেশের জনসমাজ যেন আধুনিক নেশনবাদকে গ্রহণ করেনি; যেন বিশ্বাস করলেন, যে নেশনবাদ কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতালাভকেই চরম ও পরম আদর্শ বলে মনে করে আমাদের নেশনবাদ সে ধরণের নেশনবাদ নয়। শুধু এই কারণেই গান্ধীজী নিজের ঘোষিত আদর্শ থেকে বার বার স'রে গিয়ে নিজের আদর্শের সমাধি রচনা করে গেছেন।

তিনি বার বার বলেছেনঃ

"এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকা উচিৎ নয় যে অহিংসার পথে প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বরাজের থেকে ভিন্ন হবে। সেই রকম স্বরাজে পুলিশ কিম্বা শাস্তিবিধান থাকবে। কিন্তু সেখানে পাশবিকতার

www.pathagar.com

কোনো স্থান থাকবে না যা আমরা বর্তমানে গভর্নমেণ্টের দিক থেকে অথবা জনসাধারণের দিক থেকেও প্রত্যক্ষ করছি।

"আমার দিক থেকে বলতে গেলে, আমি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত যে কোরআনে কিম্বা মহাভারতে কোথাও হিংসার সাফল্যের পক্ষে সমর্থন বা অনুমতি নেই। যদিও প্রাকৃতিক জগতে যথেষ্ট বৈপরিত্য আছে তথাপি আকর্ষণেই জীবন বয়ে চলে। পরস্পরের প্রতি প্রেমই প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখে। ধ্বংসের মাধ্যমে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। আত্ম-প্রেমই অন্যকে ভালবাসতে বাধ্য করে। বিভিন্ন জাতি একতাবদ্ধ হয় কারণ সেগুলির ব্যক্তিসাধারণ পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন। ভবিষ্যতে কোনো দিন আমরা জাতিগুলির মধ্যে পরিগণিত আইন সমগ্র ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত ক'রে দেবো যেমন আমরা পারিবারিক আইনের ব্যাপারে করেছি যাতে সমগ্র দেশগুলি নিয়ে এক বিরাট পরিবার রচিত হয়। ঈশ্বরের আদেশে ভারতবর্ষকেই সেই দেশ হিসাবে কাজ করতে হবে। কারণ যুক্তির বিচারে যতদূর লক্ষ্য করা যায় বহু যুগ যাবত ভারতবর্ষ সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা নিজেকে স্বাধীন করতে পারবে না। জাতীয়তার নামে হিংসা হতে বিরত থেকেই ভারত স্বাধীন হতে পারে।" (হরিজন, ২.২.১৯২২)

ওদিকে গান্ধীজী একথাও বলেছেন,

"এক সময় ছিল যখন আমি ডোমিনিয়ন স্টেটাসের প্রতি অনুরক্ত ছিলাম। কিন্তু পরে দেখলাম ডোমিনিয়ন স্টেটাস একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে একটি সাধারণ নিয়ামক—অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজীল্যান্ড ইত্যাদি। এরা সকলেই কন্যাতুল্য দেশ যা ভারত কোনোদিনই হতে পারে না। এই সব দেশের বেশিরভাগ লোক ইংরেজী ভাষাভাষী এবং তাদের সত্ত্বা ব্রিটেনের সঙ্গে কোনো না কোনো সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত। লাহোর কংগ্রেস ভারতবাসীদের মন থেকে সাম্রাজ্য সম্বন্ধে সকল প্রকার চিন্তা মুছে দিয়েছে এবং স্বাধীনতার আদর্শ তাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে। করাচি কংগ্রেস এর ব্যাখ্যা দিয়েছে যে এমন-কি একটি স্বাধীন জাতি হিসেবেও আমরা গ্রেট-ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগী হয়ে থাকতে পারি, অবশ্য যদি সে তাই চায়.....।"

"যুদ্ধ ও রক্তপাতক্লিষ্ট এই পৃথিবীতে স্বাধীন সহযোগী হিসাবে ভারতবর্ষের বিশেষ অবদান দেবার আছে। হঠাৎ যদি যুদ্ধ বেধে যায় তাহলে ভারত ও গ্রেট ব্রিটেন যৌথ প্রচেষ্টায় যুদ্ধ বন্ধ করবার চেষ্টা করবে কিন্তু তা অস্ত্রের সামর্থ্য দিয়ে নয় পরন্তু ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দুরতিক্রম্য শক্তি দিয়ে।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৫-১০-১৯১১)

কিন্তু ব্রিটেন প্রভৃতি পশ্চিমের দেশগুলি প্রধানত organised violence-

www.pathagar.com

এর দ্বারা পরিচালিত ও শাসিত। পশ্চিমের দেশগুলিতে অহিংসার সমর্থকদের দেশবাসী ঘৃণার চোখে দেখে। Conscientious objector হিসাবে যাঁরা দেশের যুদ্ধোদ্যমে সহায়তা না করে পশ্চিমের দেশগুলিতে অহিংসার সেই সেবকদের দীর্ঘদিন এমন কি সারাজীবন কারাগারে বন্দী করে রাখা হয় এবং জনগণ তাঁদের দেশের শত্রু মনে করে ঘৃণার চোখে দেখে। তাঁর অহিংসাভিত্তিক সমাজ নিয়ে গান্ধীজী কি করে পশ্চিমের হিংসাভিত্তিক সমাজের partner হয়ে থাকতে পারতেন সেও একটা রহস্য।

পুঁজিবাদী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে চিরদিন প্রেমের সম্পর্ক রাখতে হবে গান্ধীজীর এই আদর্শও বর্তমান যুগের উন্মাদনাময় পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকরীভাবে অনুসরণ করা একেবারেই অসম্ভব। এখানেও গান্ধীজী হাজার বছর আগেকার মনুষ্যসমাজের গতিপ্রকৃতিকে অনুসরণ করে এই আদর্শের কথা প্রচার করেছেন। যখন মানুষের জীবনযাত্রা সরল ও অনাড়ম্বর ছিল, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় উপচারের বাহুল্য ছিল না বলে এই উপচার বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষাও উদগ্র ছিল না, যখন খাদ্যপানীয়ের সহজলভ্যতার দরুণ পরিবারে রেষারেষির অবকাশ কম ছিল, যখন মনুষ্য-সৃষ্ট কৃত্রিম উপকরণের মধ্যে নয় প্রকৃতির স্বয়ংপূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে মানুষ নিজেকে পূর্ণতররূপে উপলব্ধি করতে পারত, যখন জীবনযাত্রার আয়োজন পূর্ণ করতে উদয়াস্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন না থাকায় জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলির উন্মেষের যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যেত, শত দ্বন্দ্ব-বিবাদের মধ্যেও সেই পুরাতন যুগের মানুষের পক্ষেই প্রেমের কথা, অহিংসার কথা, মানব-মৈত্রীর কথা প্রচার করা অস্বাভাবিক ছিল না।

কিন্তু বিশ্বময় এই দ্রুত শিল্পায়নের যুগে, যখন মানুষ শুধু উৎপাদন রাক্ষসের হাতে এক নগণ্য ক্রীড়নক মাত্র, যখন ধনভাণ্ডার সৃষ্টির পথে মানুষ একটি সোপান ছাড়া আর কিছু নয়, যখন অপরিসীম জনস্ফীতির ফলে খাদ্যপানীয়ের প্রচণ্ড অকুলানে মানুষে মানুষে আজ স্বার্থদ্বেষের প্রচণ্ড কোলাহল, যখন জীবনযাত্রার সাধারণতম আয়োজনটুকু মেটাতেই বেশীর ভাগ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষণ পরিপূর্ণভাবে পরিব্যাপ্ত, যখন জীবনযাত্রার সাধারণতম আয়োজনটুকু মেটাতেই বেশীর ভাগ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষণ পরিপূর্ণভাবে পরিব্যাপ্ত, যখন জীবনযাত্রার উপকরণকে স্ফীত করে তোলবার উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা মানুষকে পাগল করে তুলেছে তার প্রয়োজনীয় মুনাফার নেশায়, যখন লাভের নেশা মুষ্টিমেয় মানুষকে পাগল করে তুলেছে বৃহত্তর জনসমাজকে শোষণ করবার পৈশাচিকতায়, তখন শুধু রামনাম জপ করলেই মানুষের এই দুর্নিবার অর্থলোভ, উপকরণের নেশা, স্বার্থসাধনের অপরিহার্য পিপাসা দূর হয়ে গিয়ে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে নিরঙ্কুশ প্রেম-প্রীতি গজিয়ে উঠবে এটা ভাবা ছেলেমানুষি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

www.pathagar.com

শুধু ধর্মের কথা শোনালেই মানুষের মনে ধর্মের বা শুধু প্রেমের কথা শোনালেই বিশ্বপ্রেমের উদয় হয় না। এমন কি, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যাঁরা, তাঁরাও নিজের প্রাণ পর্যন্ত দান করেও সব সময়ে মানুষকে ধর্মপথে আনতে পারেননি। মানবপ্রেমের অতুলনীয় পূজারী মহামতি খৃষ্ট বুকের রক্ত দান করেছিলেন সেই প্রেমের স্বাক্ষরে। কিন্তু তাঁরই লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান শিষ্যের দল যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে, এশিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়ায় নিরীহ শান্তি-প্রিয় মানুষদের মধ্যে ধ্বংসের আগুন জ্বালিয়ে হত্যালীলার রক্তবন্যা প্রবাহিত করে নিষ্ঠুর বীভৎসতাকে পরিব্যাপ্ত করে খৃষ্টের মহান আত্মত্যাগকে ব্যঙ্গ করেই এসেছে। যে-বুদ্ধদেব ভারতবর্ষের অগণিত মানুষকে প্রথম মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার পথ দেখালেন, তাঁর জন্মভূমি, তাঁর লীলাভূমি ভারতবর্ষ থেকেই তাঁর ধর্মবাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তাঁর মৃত্যুর হাজার বছরের মধ্যেই। বুদ্ধ খৃষ্টের মত অদ্বিতীয় মহাপুরুষেরাও ইতিহাসের নিষ্ঠুর নিয়তিকে রুদ্ধ করতে পারেন নি।

কাজেই গান্ধীজীর আদর্শও যদি ইতিহাসের নিয়তির স্রোতের কাছে পরাজিত হয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু দেখতে হবে, গান্ধীজী ও তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্যেরা গান্ধীবাদের আদর্শকে সফল করবার জন্যে কতখানি নিষ্ঠার সংগে নিজেদের নিযুক্ত করতে পেরেছিলেন। কারণ ইতিহাসের যুগচক্রের পরিবর্তনে সাময়িকভাবে ম্লান হয়ে গেলেও বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতি বিশ্বমানবেরা যে-দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন তা নির্বাপিত হতে পারে না, কখনও হবে না। কিন্তু গান্ধীজীর আদর্শের জ্যোতি কি পারবে ইতিহাসের অবজ্ঞাকে অস্বীকার করে বেঁচে থাকতে?

গান্ধীজীকে পশ্চিমের লোক, বিশ্বের লোক জানে, সম্মান করে বিশ্ব-শান্তির দূত বলে, মানব মৈত্রীর পূজারী বলে। কিন্তু আমাদের কাছে ভারত-বাসীর কাছে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান পুরোধা, ভরতীয় জাতীয়তা-বাদের স্রষ্টা জাতির জনক। মনে রাখতে হবে শান্তির দূত বা মানব মৈত্রীর পূজারী হওয়া আর কোন বিশেষ জাতির জনক হওয়া এক জিনিস নয়। মানব-মৈত্রীর পূজারী হতে গেলে যে বিশ্বমানবতার অনুভূতি প্রয়োজন হয় কোন বিশেষ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা হতে গেলে স্বভাবতই তার অপহ্নব ঘটে।

অর্থাৎ, কোন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করতে হলে সেই স্বাধীনতার বিরোধী যারা, সেই স্বাধীনতাকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের সংগে ঘোরতর শত্রুতার সংঘর্ষ ছাড়া অন্য কোন পথ থাকে না। অথচ যাঁরা শান্তির দূত তাঁরা সকল প্রকার সংঘর্ষকে এমন কি স্বাধীনতার রক্ষার অতি আবশ্যকীয় সংঘর্ষকেও পরিহার করতে চান। কাজেই আমাদের দেশের

www.pathagar.com

স্বাধীনতাকে যারা খর্ব করেছে তাদের সংগে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে স্বয়ংস্বীকৃত দুঃখের মধ্যে দিয়ে তাদের হৃদয় জয় করে তাদের নিকট থেকে আমাদের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় গান্ধীজী এক অভিনব পন্থার সৃষ্টি করলেন। একদিকে তিনি শান্তির দূত এবং মানব-মৈত্রীর পূজারী থেকে গেলেন অপরদিকে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসম্বাদী সেনাপতি হয়ে রইলেন। তাঁর আয়োজিত স্বাধীনতা সংগ্রামে শত্রু কেউ রইল না—প্রতিপক্ষের কিছু মাত্র ক্ষতি করতেও তিনি চাইলেন না। নিজের ক্ষতির বেদনা দিয়ে তিনি প্রতিপক্ষের হৃদয় জয় করে দেশের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন।

১৯২২ সালেই চৌরিচৌরায় থানা পোড়ানোর দরুণ তিনি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। কারণ ওই হিংসামূলক পন্থা দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করা যায় কিন্তু জয় করা যায় না। গান্ধীজী শত্রুকে ঘায়েল করতে চাননি, চেয়েছিলেন জয় করতে।

কিন্তু ১৯২২-এর গান্ধী আর ১৯৪২-এ সেই গান্ধী রইলেন না। চৌরিচৌরায় একটা থানা পোড়ানোতেই গান্ধীজী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কিন্তু ১৯৪২-এ যখন শত শত থানা পোড়ানো হলো গান্ধীজী তার ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন সিংহের সামনে মূষিকশিশুর আত্মরক্ষার প্রেরণায় হিংসামূলক ব্যবহারকে হিংসা বলা চলে না।

তিনি বার বার বলেছিলেনঃ

"Non-violent Swaraj cannot be won except by non-violence". (Harijan, 22.9.1940).

"If the Congress non-violence is merely confined to abstention from causing physical hurt to the British officials and their dependents such non-violence can never bring us independence. It is bound to be worsted at the final heat. Indeed we shall find it to be worthless, if not positively harmful, long before the final heat is reached." (Harijan, 23.4.1938)

"অহিংসার স্বরাজ কেবলমাত্র অহিংসার দ্বারাই অর্জিত হতে পারে।" (হরিজন, ২২-৯-১৯৪০)

"যদি কংগ্রেসী অহিংসা শুধু ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের প্রতি দৈহিক আঘাত দেওয়া থেকে বিরত থাকার মধ্যেই সীমা-বদ্ধ থাকে তাহলে সে অহিংসা আমাদের স্বাধীনতা এনে দিতে পারবে না। শেষের উত্তাপেই তা গলে যেতে বাধ্য। বস্তুতঃ শেষের উত্তাপে পৌঁছানোর আগেই আমরা এই অহিংসাকে একেবারে মূল্যহীন এমন-কি নিশ্চিত ভাবে

www.pathagar.com

ক্ষতিকারক হিসাবে দেখতে পাবো।" (হরিজন, ২৩-৪-১৯৩৮)

কিন্তু ১৯২২-এ চৌরিচৌরার একটা থানা পোড়ানো হলো হিংসামূলক অথচ ১৯৪২-এ শত শত থানা পোড়ানো হিংসামূলক হ'ল না। আসলে, ১৯৪২-এ মানবমৈত্রীর পূজারী বিশ্বশান্তির দূত গান্ধীর চেয়ে বড় হয়ে উঠলেন জাতীয়তাবাদের এবং নেশনবাদের প্রবক্তা গান্ধী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ইংরেজ জাতি যখন জীবনমরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত, যখন পৃথিবীতে স্বাধীন জাতি হিসাবে তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন, যখন নিজেদের দুর্দশার চরম সীমায় দাঁড়িয়ে তারা প্রাণপণে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করছে তখনই গান্ধীজী ইংরেজের বিরুদ্ধে আরম্ভ করলেন তাঁর open rebellion। তাঁদের বিরুদ্ধে তিনিও আরম্ভ করলেন তাঁর এবং ভারতের জীবন-মরণ সংগ্রাম। নিঃসন্দেহে তাঁর মানবমৈত্রীর আদর্শকে এখানে ছাপিয়ে উঠলো তাঁর জাতীয়তাবাদের স্বার্থ। শত্রু যখন জীবন-সংকটের তাড়নায় কাতর তখনই তিনি সেই শত্রুর বিরুদ্ধে আরম্ভ করলেন তাঁর জীবনের শেষ লড়াই (the last battle of my life). রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "...to me God is higher than my country." 'আমার নিকট জন্মভূমি অপেক্ষা ঈশ্বর মহত্তর'। কিন্তু জাতীয়তাবাদের স্বার্থে মরিয়া হয়ে গান্ধী শত্রুর বিপদের সুযোগ নিয়ে তাকে করলেন চরম আঘাত। জওহরলাল এই প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, ইংরেজের বিপদের সময়ে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে ইংরেজের শত্রুদের হাত, জার্মানী ও জাপানের মিলিটারীতন্ত্রের হাত শক্ত করে তোলা হবে। কিন্তু গান্ধী তখন নির্মম—ক্ষমা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। জওহরলালকে তিনি স্তব্ধ করে দিলেন কারণ, তাঁর জীবনের শেষ লড়াই (last battle of life) এর জন্যে তখন তিনি মরিয়া।

গান্ধী একথাও বার বার বলেছেনঃ

"My belief is unshaken that without communal unity Swaraj cannot be attained." (Harijan 27.1.1940)

"আমার এই বিশ্বাস এখনও অটল যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য না হ'লে স্বরাজলাভ অসম্ভব।" (হরিজন, ২৭-১-১৯৪০)

অথবা বলেছেনঃ

"As a man of non-violence I cannot forcibly resent the proposed partition if the Muslims of India really insist upon it. But I can never be a willing party to the vivisection. I would employ every non-violent means to prevent it. For it means the undoing of centuries of work done by numbers of Hindus and Muslims to live together as one nation. Partition

www.pathagar.com

means a patent untruth. My whole soul rebels against the idea that Hinduism and Islam represent two antagonistic cultures and doctrines. To assent to such a doctrine is for me denial of God." (Harijan 13.4.1940).

"অহিংসার সেবক হিসাবে প্রস্তাবিত দেশ বিভাগের বিরোধিতা তেমন জোরের সঙ্গে করতে পারি না যদি মুসলমানরা সত্য সত্যই তার জন্য জিদ করে। কিন্তু আমি স্ব-ইচ্ছায় কখনও এই দেশবিভাগের সমর্থক হতে পারি না। আমি প্রতিটি অহিংস পন্থায় একে রোধ করতে চাইবো। কারণ এর অর্থ হবে বহু শতাব্দীর অসংখ্য হিন্দু-মুসলমানের এক জাতি হিসাবে একত্রে বাস করার প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেওয়া। দেশ বিভাগ মানে একটি স্বীকৃত অসত্য। আমার সমস্ত হৃদয় হিন্দুত্ব ও ইসলামকে দুটি পরস্পর বিরোধী সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাস হিসাবে মেনে নেবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই বিশ্বাসকে সমর্থন করলে আমার মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়।" (হরিজন, ১৩-৪-১৯৪০)

কিন্তু তাঁর last battle of life-কে সফল করবার জন্যে তাঁর প্রিয় ভক্ত-শিষ্যেরা যাতে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে বসতে পারে তার জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি এই denial of God-এও সম্মতি দিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে গান্ধীজী একবার দাবী করেছিলেন যে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে গেলে তিনি জাপানী সৈন্যদের ভারতে আগমনে বাধা দেবেন না। তবে জাপানী সৈন্যরা ভারতে এলে তিনি অহিংস অসহ-যোগের দ্বারা তাদের হৃদয় জয় করবেন। কিন্তু তাঁর নিজের প্রিয় শিষ্য কংগ্রেস নেতারা প্রায় এক বাক্যে তাঁর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণই এক মাত্র সমীচীন পন্থা বলে ঘোষণা করেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই সময়ে গান্ধীজী তাঁর নিজের প্রিয়তম শিষ্যদের দিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগের আদর্শকে গ্রহণ করাতে পারেননি। অথচ তিনি আশা করেছিলেন, পশুশক্তিতে উন্মত্ত রণোন্মাদ জাপানী সৈনিকদের অহিংসার আদর্শ দিয়ে বশ করে ফেলবেন।

গান্ধীজী যদি সত্য সত্যই জাপানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে অহিংসা মন্ত্র প্রয়োগের কথা চিন্তা করতেন তাহলে তাঁর উচিত ছিল সেই আদর্শকে পূর্ণ করবার জন্যে জীবন পণ করা। তাতে তিনি ব্যর্থ হতেন, কিন্তু সে ব্যর্থতা গৌরবের হতো। গান্ধীজী অনেক বড় বড় আদর্শের কথা বলতেন কিন্তু সেই আদর্শের অনুসরণে কখনও শেষ সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হতে চেষ্টা করতেন না। ঘটনা-সংঘাতের চাপে পড়ে তিনি প্রতি পদক্ষেপে তাঁর মহান আদর্শের সংজ্ঞাকে আপোষের দ্বারা বহু প্রকারে অকিঞ্চিৎকর করে তুলতেন।

www.pathagar.com

এক বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিলঃ

"Do you envisage the possibility of doing away with a national Army when "Purna Swaraj" is obtained?"

"যখন "পূর্ণ স্ব-রাজ" প্রতিষ্ঠিত হবে তখন কি দেশের জন্য সৈন্যদল বিলোপ করে দেবার সম্ভাবনার কথা আপনি চিন্তা করেন?

তার উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেনঃ

"As a visionary, yes. I do not think it is possible for me to see it during my lifetime. It may take ages before the Indian nation may accommodate itself to having no army at all. It is possible my want of faith may account for this pessimism on my part. But I do not exclude such possibility. No one was prepared for the present mass awakening and the strict adherence to non-violence—aberrations notwithstanding, on the part of the people and that certainly fills me with some hope that Indian leaders will be able to say that they do not need to have any army. For civil purposes, the police may be considered sufficient."

(Out of Dust, D. F. Karaka, P.-236).

"একজন আদর্শবাদী হিসাবে, হ্যাঁ—তবে আমার জীবদ্দশায় আমার তা দেখে যেতে পারার সম্ভবানা আছে ব'লে আমি মনে করি না। এমন কি কোনো সৈন্যদল না রাখার অবস্থায় পেঁছাতে ভারতবর্ষের বহু যুগ কেটে যেতে পারে। এটা হতে পারে যে আমারই বিশ্বাসের অভাব আমার এই নৈরাশ্যের কারণ। আমি এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছি না। অল্প বিস্তর বিচ্যুতি সত্বেও বর্তমানের এই জনজাগরণের এবং অহিংসার প্রতি নৈষ্ঠিক অনুরক্তির কথা এর আগে কেউ ভাবতে পারে নি। এবং তাতেই আমার মনে কিছুটা আশা জাগায় যে ভারতের নেতনারা একদিন বলতে পারবেন যে আমাদের সৈন্যদলের কোনো প্রয়োজন নেই। সাধারণ ব্যাপারে, পুলিশকেই যথেষ্ট বলে মনে করা যেতে পারে।" (আউট অব ডাষ্ট, ডি, এফ, কারাকা, পৃঃ ২৩৬)

এই প্রশ্নের জবাবে একটি সরল উত্তর গান্ধীজী দিতে পারতেন, তা হলো এইঃ "আমি যতদিন জীবিত থাকব, আমি সৈন্যদল তুলে দেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। যদিও দেশের লোক আমার কথা শুনবে না তবুও আমি এ-চেষ্টা ছাড়ব না।" কিন্তু গান্ধীজী তা কোথাও বলেননি—বরং নানারকম কথার ধূম্রজাল দিয়ে আসল প্রশ্নকে এড়িয়ে গেছেন।

নানারকম কথার ইন্দ্রজালে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর প্রিয় শিষ্যেরা প্রায় সব

www.pathagar.com

ক্ষেত্রেই এইভাবে আসল প্রশ্নকে ধামা চাপা দিয়ে গেছেন। সেই জন্যই ভবিষ্যতের জন্যে তাঁদের সঞ্চয় বলে কিছু আর রইল না।

১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণের সময়ে আচার্য বিনোবা ভাবেও একবার বলেছিলেন যে, চীনা সৈন্যদের ভারতে আসতে দেওয়া হোক। কিন্তু দেশ-ব্যাপী কঠোর সমালোচনার ভয়ে তিনি দ্বিতীয়বার ওকথা উচ্চারণ করেননি।

মহাত্মা গান্ধী বা আচার্য ভাবে যদি নিজেদের মহান আদর্শের সম্মান রক্ষায় আদর্শের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছাতে গিয়ে দেশবাসীর নিকট লাঞ্ছিত হতেন, যেমন হয়েছিলেন বহু শত বছর আগে যিশুখৃষ্ট তাহলেই তাঁরা যে-মহান্ আদর্শের কণ্টকমুকুট মাথায় বহন করে বেড়াচ্ছেন বলে দাবী করেছেন সে-আদর্শ দেশবাসীর মনে এবং মনুষ্যজাতির মনে স্থায়ী আসন করে নিতে পারতো। কিন্তু দেশবাসীর অপ্রিয় সমালোচনার ভয়ে, দেশবাসীর মনে নেতৃত্বের গৌরবময় আসন হারিয়ে ফেলবার ভয়ে এঁরা নিজেদের আদর্শের ভিত্তিকে এমনভাবে শিথিল করে দিয়ে গেছেন যে এঁদের চেয়ে অল্পপ্রাণ ব্যক্তিদের পক্ষে এখন আর সেই মহান্ আদর্শকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করা অসম্ভব।

১৬

আমাদের জাতীয় চরিত্রের গলদের কথা এই প্রসঙ্গে না তুলে ধরলে অন্যায় হবে। আমাদের দেশের যাঁরা পূজনীয় ও নমস্য তাঁদের মধ্যে যাঁরা সর্বপ্রধান তাঁরা নিজেদের জীবিতকালে দেশবাসীর নিকট হতে অনেক মর্মপীড়া পেয়ে গেছেন। আমাদের দেশে সত্যের জন্য, আদর্শের জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, প্রাণপাত করেছেন দেশবাসী তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া দূরে থাকুক বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রতি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা দেখিয়েছেন। অবশ্য, যাঁরা জনসাধারণের খেয়ালখুশির সংগে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন না সব দেশেই জনসাধারণ তাঁদের অবজ্ঞা করে। কিন্তু আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য এই যে আমরা শুধু অবজ্ঞা দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকি না, আমরা মহাপুরুষদের অপমান করতেও ছাড়ি না। যারা ধর্মাধর্ম বিচার করে না, ন্যায়-অন্যায়ের পরোয়া করে না, চালাকির দ্বারা কোনো রকমে কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে পারে এদেশে তারাই সমাজের নেতারূপে পরিগণিত হয়—কিন্তু সমাজকে সৎপথে যাঁরা চালাতে চান সমাজ তাঁদেরই অবজ্ঞা করে। এই আমাদের জাতীয় চরিত্র।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছিলেনঃ "হে ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য। তুমি তোমার পূর্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অব-

www.pathagar.com

লম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে সর্বশরীরে শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কতকালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া ভাবিয়া স্থির করা যায় না।....." (বিদ্যাসাগর চরিত, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩০৯-১০)।

"এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবে এদেশের ভাল হয়।...

"তোমাদের মত ভদ্র বেশধারী আর্য সন্তান অপেক্ষা আমার অসভ্য সাঁওতাল ভাল লোক।" (বিদ্যাসাগর-চরিত, পৃঃ ৫১৮-২০)।

স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেনঃ "এদেশে এখনও গুণের আদর নাই, অর্থবল নাই এবং সর্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে, practicality আদৌ নাই।

"উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্তমত আছে, কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহা সাম্যবাদ আছে, কার্যে মহা ভেদ-বুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু কার্যে আমরা অতি নির্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে পারি না। .....এদেশে লোকবল কোথায়? অর্থবল কোথায়? অনেক পাশ্চাত্য নরনারী ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতীয় ভাবে ভারতীয় ধর্মের মধ্য দিয়া অতি নীচ চণ্ডালাদিরও সেবা করিতে প্রস্তুত আছেন। দেশে কয় জন? আর অর্থ-বল!! আমাকে অভ্যর্থনা করিবার ব্যয় নির্বাহের জন্য কলিকাতাবাসীরা টিকিট বিক্রয় করিয়া লেক্‌চার দেওয়াইলেন এবং তাহাতেও সংকুলান না হওয়ায় ৩০০৲ টাকার এক বিল আমার নিকট প্রেরণ করেন।.....

"ভারতীয় জনমানবের আত্মনির্ভরতা দূরে থাকুক, আত্মপ্রত্যয় পর্যন্ত এখনও অণুমাত্র হয় নাই...।

একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সাধারণ আন্দোলনের দ্বারা কোনো মহৎ কার্য সাধন করার চেষ্টা বৃথা। 'মাথা নেই তার মাথা ব্যথা'—সাধারণ কোথা? তাহার উপর আমরা এতই বীর্যহীন যে, কোন বিষয়ের আন্দোলন করিতে গেলে তাহাতেই আমাদের বল নিঃশেষিত হয়, কার্যের জন্য কিছুমাত্রও বাকি থাকে না; এজন্যই বোধ হয় আমরা বঙ্গভূমে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' সতত প্রত্যক্ষ করি।.....প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে-জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারত-বর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে তাহার মূল কারণ ঐটি—দেশীয় সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজ্যশাসন ও দম্ভবলে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ

www.pathagar.com

জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজ সংস্কারের ধূম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজসংস্কার সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধির শোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন এবং রহিতেছেন তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না। মুসলমান কয়জন সিপাহী আনিয়াছিল? ইংরেজ কয়জন আছে? ছ-টাকার জন্য পিতা ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে, এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়া কোথায় পাওয়া যায়? সাতশ বৎসর মুসলমান রাজত্বে ছ-কোটি মুসলমান, একশ বৎসর ক্রীশ্চান রাজত্বে কুড়ি লক্ষ ক্রীশ্চান কেন এমন হয়? Originality কেন দেশকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে।"..... (পত্রাবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৮৯-৯৪)

২৯২৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে রোম্যাঁ রোলাঁকে লিখছেনঃ

"প্রিয় বন্ধু,

আমি ভগ্ন হৃদয়ে ও ক্লান্ত হয়ে (ভারতে) ফিরে এলাম। আমি এমন এক দেশে এলাম যা বহুতর বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত আছে এবং যার এমন কি, আমার আদর্শের কথা চিন্তা করবার অবকাশটুকুও নেই। অন্তত' এই ক্ষণে আমি যেন অনুভব করছি এদেশ আমাকে চায় না। আমার ভয় হয় যে আমার দেশ-বাসী আমার আন্তর্জাতিক মিত্রতার আদর্শকে অসময়োচিত এমন কি কবি-সুলভ বিলাসের প্রকাশ বলেই ধারণা করে চলবেন, যে-আদর্শের প্রতি আনুগত্য বর্তমান যুগের পক্ষে উপযোগী নয়।

"কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে মনে হয় আমার নিজের যেন একটা দেশ আছে, আছেন আমার বন্ধু, সহকর্মী ও সহকর্মীর দল আমার আদর্শে এক হয়ে। আমি তাঁদের সকলকে খুঁজে পাই একক মানুষ হিসাবে আপনার মধ্যে, পাই আপনার সুগভীর প্রীতি-বন্ধনে। এই খুঁজে পাওয়াই আমাকে বল দেয়, আমার জীবন-ক্ষয়ের এই ভাঁটার ক্ষণের শেষের দিনগুলোয় দেয় আমাকে বিশ্বাস এবং আনন্দ।

"যদি আর কিছুদিন বাঁচি, যদি চিকিৎসকেরা অনুমতি দেন তাহলে আমার প্রথম কাজ হিসাবে আপনার কাছে গিয়ে নিয়ে আসব আপনাকে শান্তি-নিকেতনের জন্যে যেখানে আপনার প্রকৃত স্থান আপনি খুঁজে পাবেন। চিকিৎসকেরা বলেন গ্রীষ্মের দুরন্ত দিনগুলো আমার ইয়োরোপে কাটানো উচিত। তাই যদি হয়, আমি আমার গ্রীষ্মাবাস তৈরি করবো সুইজারল্যান্ডে আপনার আবাসেরই পাশে, যাতে আমার জীবনের শেষের কটা দিন কাটাতে পারি শুধু আপনার বন্ধু হয়েই নয় পরন্তু আমাদের মহা সংগ্রামের সহযোদ্ধা হয়ে।

www.pathagar.com

আপনার ও আপনাদের সকলের শারীরিক কুশল ও মানসিক মঙ্গল কামনা করি।

আপনারই—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

(Inde. পৃঃ ১০৯। মূল ফরাসী থেকে অনূদিত)

এমন কি ১৯২১ এর ফেব্রুয়ারী মাসেও রবীন্দ্রনাথ দীনবন্ধু চার্লস এণ্ড্রুজকে লিখেছিলেনঃ

"I am afraid I shall be rejected by my own people when I go back to India. My solitary cell is awaiting me in my motherland. In their present state of mind my countrymen will have no patience with me, who believe God to be higher than my country." (Letters to a Friend—দেখন)

"আমার আশংকা হয় যে আমি ভারতে ফিরে গেলে আমার দেশবাসী আমাকে পরিত্যাগ করবে। দেশে আমার নির্জন প্রকোষ্ঠ আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে। তাদের বর্তমান মানসিক অবস্থায় আমার দেশের লোক আমার কথা ধৈর্য্য ধরে শুনবে না কারণ জন্মভূমির চেয়েও ঈশ্বর আমার নিকট মহত্তর।" (লেটার্স টু এ ফ্রেন্ড—দেখুন)

অর্থাৎ, আমাদের দেশে যাঁরা সত্যকার মহাপুরুষ তাঁরা দেশের সামগ্রিক মনুষ্যত্বহীনতার জন্য ক্ষোভ করে গেছেন এবং তা শুধু এক বিশেষ যুগেই সীমাবদ্ধ ছিল না—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ এই ক্ষোভের ভাষায় ধিক্কৃত। সমগ্র দেশেই যখন এই রকম এক গ্লানির ছায়া বিদ্যমান সেই সময়ে আমরা দেশবাসীর জন্য একটা বিরাট ধাপ্পার ছবি এঁকেছিলাম। সেটা হচ্ছে এই যে, একবার ইংরেজকে তাড়াতে পারলেই একবার পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই দেশের সকল গ্লানি, সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে। ইংরেজরা স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগ করায় এই ধাপ্পার কাজটি আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন হলো। অর্থাৎ আমরা গর্ব করে বলতে লাগলাম যে আমরা কতখানি শক্তি অর্জন করেছি যার ভয়ে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলো। সেইদিন থেকে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনেও একটা বিরাট ধাপ্পাবাজী আছে।

কিন্তু ধাপ্পাবাজী করে মহৎ জাতি সৃষ্টি করা যায় না। আমাদের দেশের লুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করবার জন্যে যাঁরা সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিলেন যেমন বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, রাম-মোহন, বিদ্যাসাগর—তাঁদের বিদ্রোহ সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলতার চাপে বার বার

www.pathagar.com

ম্লান হয়ে গেছে। এমন কি মহাত্মা গান্ধীও যেটুকু সমাজ বিপ্লবের সীমিত পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরই শিষ্য-প্রশিষ্যেরা মিলে তাঁরই জীবদ্দশায় তা ব্যর্থ করে দিয়েছে। সবাই এখন ভাবছি পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকার যখন পাওয়া গেছে তখন আমরা সামাজিক উন্নতির চরম শিখরে। এই আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করতে পারে এমন কেউ আছেন কি?

www.pathagar.com

কেন এমন হোলো

এই বইটি আমি লিখেছিলাম গত ষাট দশকের শেষের দিকে। তারপরে দেশে অনেক পট পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন দেখা যাচ্ছে সমগ্র দেশ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রচণ্ড তাণ্ডব, সারা দেশে সমাজ-জীবন হয় সন্ত্রাসবাদীদের নয়তো সমাজবিরোধীদের অত্যাচারে পর্যুদস্ত। তার উপরে আছে গভীর এবং জটিল অর্থনৈতিক সংকট। দেশের এই যে সামগ্রিক দুর্দশা তার অজুহাত দিতে গিয়ে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই কোনো অজ্ঞাতনামা বিদেশী শক্তির চক্রান্তের জন্যই দেশের এই দুর্দশার সৃষ্টি বলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ নিজেদের অক্ষমতা এবং ত্রুটিকে ঢেকে রাখবার এক অন্ধ প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা এটা স্বীকার করতে চাইব না বটে কিন্তু দেশের এই সামগ্রিক দুর্দশার জন্য আমাদের বহু শতাব্দী-লালিত সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি, বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের একদেশ-দর্শিতা এবং এমন-কি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু বিচ্যুতি যে দায়ী সেই সত্যটাই থেকে যাবে। আজ দেশে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, আজ যে সমাজে একটা অন্তহীন অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছে, আজ যে আমরা ন্যায়-নীতি, সত্যনিষ্ঠা, মানবিকতার শাশ্বত আদর্শগুলির কথা ভুলে গিয়ে একটা মেকি রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি তার পিছনে যে-মানসিকতা গত শত শত বছর ধরে আমাদের সমাজকে পরিচালিত করেছে সেইগুলি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার।

দেশে আজ সবচেয়ে বিপজ্জনক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সন্ত্রাসবাদ। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আসাম বা ঝাড়খণ্ডিদের আন্দোলনে যে সন্ত্রাসবাদের প্রকাশ তার চেয়ে সন্ত্রাসবাদের পরিধি অনেক ব্যাপকতর, অনেক বেশি বিপজ্জনক। আজ সমগ্র সমাজের প্রতিটি স্তর কোনো না কোনো প্রকারে সন্ত্রাসবাদের দ্বারা নিপীড়িত পর্যুদস্ত। দেশের প্রতিটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল মস্তান পোষণ করে এবং এই মস্তানদের প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়ে সন্ত্রাসবাদের পথে বিপক্ষের মতামত রুদ্ধ করে দিতে ও স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতা এই সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়ে যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর কবলে পড়তে পারেন এবং সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতি এড়াবার জন্য প্রত্যেকেই এত ভীত সন্ত্রস্ত

www.pathagar.com

যে সরকারি নিরাপত্তা-রক্ষী ছাড়াও অনেকে ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনীও পোষণ করেন। তবে এই নিরাপত্তা-বাহিনীর হাত ধরেই মৃত্যু এগিয়ে আসতে পারে বা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা-ব্যবস্থাও ব্যর্থ হতে পারে সন্ত্রাসবাদীদের কলা-কৌশলের কাছে যেমনটি হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর বেলা।

এব্রাহাম লিঙ্কনকে গুলি করা হয়েছিল, লেনিনকেও গুলি করা হয়েছিল। কয়েক বছর আগে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি রহস্যজনক ভাবে খুন হয়েছিলেন। কিন্তু সমগ্র দেশ সমগ্র সমাজ সন্ত্রাসবাদীদের মারণাস্ত্রের ভয়ে শঙ্কিত বিনিদ্র রজনী যাপন করছে এমনটি অন্যান্য সভ্যদেশে খুবই কম দেখা যায় কিন্তু আজকের ভারতে যা দৈনন্দিন ঘটনা। কী রাজনৈতিক দল-গুলির সভাসমিতিতে, কী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনী সভায় এমন-কি স্কুল-কলেজের ছাত্র-সংসদের নির্বাচনেও আজ মার-দাঙ্গা, খুনোখুনি, রক্তপাত নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এবং এই সব মার-দাঙ্গা, খুনোখুনির ব্যাপারে যাদের নিকট থেকে সাহায্য নিতে হয় তারা সব সময়েই সমাজ-বিরোধী। অতএব এই পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সমাজ-বিরোধীরাই আজ সমাজের সর্ব স্তরে গায়ের জোরে প্রভাব খাটিয়ে সমগ্র সমাজকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা সমাজ আজ হারিয়ে ফেলেছে। বড় বড় শহরে, শহরতলিতে ও গ্রামাঞ্চলে এই সমাজ-বিরোধীদের দাপটে সাধারণ মানুষের জীবন আজ বিপর্যস্ত এবং তাদের এই বিভীষিকার হাত থেকে বাঁচাতে অনেক সময়ে পুলিশ এবং প্রশাসনও অক্ষম বলে দেখা গেছে। যারা রাজনৈতিক বা কায়েমি স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন তারা কিন্তু এই অবস্থার প্রতিকার চাইতে পারে না কারণ রাজনৈতিক বা কায়েমি স্বার্থ সিদ্ধির সহায়তা লাভ করতে হলে এই সমাজবিরোধীদেরই তাদের ডাক দিতে হয়। অতএব সমাজ-বিরোধীদের প্রভাব যে দিনে দিনে বেড়ে উঠছে তার কারণ সমাজেরই একটা প্রভাবশালী অংশ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে সমাজ-বিরোধীদের এই দাপট ক্ষুণ্ণ হতে দিতে চায় না। সমাজের এই অংশের কাছে সমাজ-বিরোধীরা শুধু প্রয়োজনীয়ই নয় সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গও।

এই সমাজই তাহ'লে সমাজ-বিরোধীকে সৃষ্টি করছে এবং তাকে রক্ষণা-বেক্ষণ করছে। কাশ্মীরে, পাঞ্জাবে বা আসামে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের আমরা নিন্দা করি এবং কঠোর হাতে এই সন্ত্রাসবাদ ধ্বংস ক'রে দেবার ব্যবস্থা দাবি করি। পুলিশি ব্যবস্থায় বা মিলিটারির সাহায্যে আমরা কিছু সন্ত্রাস-বাদীকে ধ্বংস করতে চাই এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধ্বংস করিও। কিন্তু আমরা ভুলে যাই পুলিশ বা মিলিটারি যত সন্ত্রাসবাদীকেই ধ্বংস করুক যত সমাজ-বিরোধীকে শাস্তি দিক সমগ্র সমাজ যতক্ষণ না সন্ত্রাসবাদের পন্থাকে চরমভাবে পরিত্যাগ করছে ততক্ষণ একদল সন্ত্রাসবাদী বা সমাজ-বিরোধী

www.pathagar.com

নির্মূল হলে আবার নতুন দল গড়ে উঠবে এবং তাদের কর্মধারা আগের মতই চলবে।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু থেকেই সন্ত্রাসবাদকে অর্থাৎ ইংরেজ রাজকর্মচারী বা তাদের ভারতীয় সাহায্যকারীদের হত্যা করাকে একটা গৌরবময় মহিমায় মণ্ডিত করা হয়েছিল। এখন অবশ্য জ্যোতি বসুর মত নেতারা এবং অমলেশ ত্রিপাঠি বা অমলেন্দু দের মত নামকরা ঐতিহাসিকরা এই সন্ত্রাসবাদের পথকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বলে অভিহিত করছেন বা এই সন্ত্রাসবাদীদের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী বলে আখ্যা দিয়েছেন। একথা অনস্বীকার্য যে নিজেদের কার্যক্রমের অনুসরণে এঁদের মধ্যে অনেকেই পুলিশের হাতে নিদারুণভাবে নিপীড়িত হয়েছিলেন। কিন্তু এটাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রভূমিতে একটা সুগভীর ফ্যাসিবাদের পত্তন করে গিয়েছিলেন যা একটি মুক্তসমাজের বিকাশলাভের পথে চরম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এঁদের আদর্শ ছিলঃ "আমার মতটাই তোমাকে মানিতে হইবে না হইলে তোমার মাথা ভাঙিব।" ১৯২৬-এ কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি হিসাবে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বলেছিলেনঃ "যে উদ্দেশ্যেই হউক না কেন ক্রমাগত চুরি, ডাকাইতি ও নরহত্যা করিতে করিতে এই সকল কর্মীদের মধ্যে মনুষ্যোচিত বৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে তিরোহিত হইতে বাধ্য এবং এরা স্বাভাবিক সুস্থ সমাজজীবনের অযোগ্য হইয়া পড়ে।" রবীন্দ্রনাথ যেমন চার-অধ্যায় উপন্যাস লিখে সন্ত্রাসবাদের সমালোচনা করায় বাঙলার রাজনৈতিক মহলে খুব অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তেমনই বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তাঁর কৃষ্ণনগরের অভিভাষণের জন্য আজও পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক মহলে অপ্রিয় হয়ে আছেন। অবশ্য অন্যান্য নেতারা যেমন চিত্তরঞ্জন দাশ বা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বা তিলক কিম্বা বিপিন পালও আশঙ্কা প্রকাশ করে গেছেন যে এই ব্যক্তিগত নরহত্যার রাজনীতি একদিন সমাজ-জীবনকে বিষময় করে তুলবে। কিন্তু তাঁরা কেউই প্রকাশ্যে এই পন্থা রোধ করবার চেষ্টা করেননি কারণ তাঁরা জানতেন যে তা করলে দেশের রাজনৈতিক জগতে তাঁরা চিরদিনের জন্য জনপ্রিয়তা হারাবেন।

কিন্তু দেশের তরুণদের মনে এই সকল রাজকর্মচারী হত্যাকারীরা এক দুর্ধর্ষ বীর হিসাবে চিত্রিত হয়েছিল এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই প্রকার নরহত্যা যে যথেষ্ট গৌরবজনক সেই ভাবটি তাদের মনে গেঁথে গিয়েছিল। অর্থাৎ রাজনৈতিক মতপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হলে পরপীড়নে কোনো দোষ নেই এই বিশ্বাস দেশের তরুণদের মনে দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। এইভাবে দেশবাসীর মনে গণতন্ত্রের সমাধির গোড়াপত্তন করা হলো। সে সময় দেশে সন্ত্রাসবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিপজ্জনক পরিণতি

www.pathagar.com

প্রকট হয়ে উঠেছিল সেটা হচ্ছে সাধারণভাবে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অবিমিশ্র মুসলমান-বিরোধিতা। মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর লেখা "কমিউনিস্ট পার্টি ও আমার জীবন" বইতে উল্লেখ করেছেন যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের আদি প্রতিষ্ঠান অনুশীলন সমিতির মূল প্রচারপত্রে লেখা ছিলঃ "মুসলমানদের দাবিয়ে রাখতে হবে।" আগেই বলেছি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অনেকেই অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, কেউ কেউ প্রাণও দিয়েছেন; কিন্তু সমগ্রভাবে বলতে গেলে এঁরা অন্ধ মুসলমান-বিরোধিতার পথ দিয়ে সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতার উগ্র বিষ ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন।

সন্ত্রাসবাদকে যাঁরা রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সমাজজীবনে ফ্যাসিবাদকেই শুধু প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি তাঁরা হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য এক হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার বুনিয়াদ রচনা করে গেছেন। বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের সময়ে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার পার্থক্য গভীরতর এবং ব্যাপকতর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মৌলানা মহম্মদ আলি প্রভৃতি মুসলিম নেতাদের বিচক্ষণতায় খিলাফৎ আন্দোলনের সময়ে হিন্দু-মুসলমান মিলে যৌথ আন্দোলন করতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দ্বারা প্রচলিত মুসলিম-বিরোধিতা ও হিন্দু-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ফল্গুধারার মত দেশের প্রধান সম্প্রদায়ের মনে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন যত এগিয়ে আসতে লাগলো ততই এ বিষয়ে একটা গভীর অবিশ্বাস, একটা গুরুতর আশংকা উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মনে দানা বেঁধে উঠতে লাগলো। এই অবিশ্বাস এত গভীর এবং ব্যাপক হয়ে উঠলো যে দিনে দিনে ভারতময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়লো যাতে উভয় সম্প্রদায়ের বহু নিরীহ নিরপরাধ মানুষ নিহত হ'ল এবং সেই রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে থামাতে গিয়ে দেশ বিভাগ না করে আর কোনো উপায় রইল না।

হিন্দু-মুসলমানের ভিতর এই যে পারস্পরিক গভীর অবিশ্বাস সেটা শত শত বছর ধরে আমাদের সমাজে ফল্গুধারার মত চালু হয়ে আছে এইটাই ভারত-বিভাগের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ালো। বাঙলায় মুসলমান সমাজের প্রগতি ও উন্নতির সোপান হিসাবে লর্ড কার্জন যখন ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনা করেছিলেন তখন হিন্দু নেতারা তাতে বাধা দিয়ে মুসলমানদের স্বেচ্ছামত উন্নতির পথটি বন্ধ করবার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং ইংরেজ সরকার হিন্দু নেতাদের সেই দাবি মেনে নিয়ে পরে কার্জনের পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালেও অবস্থাটা সেইরকমই দাঁড়িয়েছিল। ১৯৪৬-এর ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিকে কার্যত স্বাধীন করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে

www.pathagar.com

বিদেশ, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ মন্ত্রক এবং এই বিষয়গুলির ব্যাপারে আর্থিক দায়িত্ব ছাড়া প্রদেশগুলিকে অন্য সব ব্যাপারে স্বাধীন সরকার হিসাবে কাজ করে যাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এই ব্যবস্থায় হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলিও প্রায় স্বাধীন হয়ে উঠতো। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারকে এত ক্ষমতাহীন করে রাখার ব্যবস্থা সমর্থন করতে পারলেন না। তাঁরা প্রদেশগুলির প্রায়-স্বাধীন হওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। কিন্তু মুসলমানরা আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার বহুদিন থেকে দাবি করছিলো। তারা দেখলো এর ফলে চিরদিনের জন্যে কেন্দ্রের হিন্দু রাজত্বের অধীন হয়ে যেতে হবে। সেই অধীনতার অবস্থা মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলি মেনে নিতে রাজী হলো না। তারা তখন মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলি নিয়ে এক স্বাধীন রাজ্য পাকিস্তানের দাবি নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠলো।

ভারত-বিভাগ সহজেই এড়ানো যেতো যদি কংগ্রেস নেতারা মুসলিম-প্রধান প্রদেশগুলিতে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা চালু রাখতে রাজী হতেন এবং হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত করতে চাইতেন। কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের ভিতর অবিশ্বাস এতদূর গভীর হয়ে উঠেছিল যে শেষকালে ভারত-বিভাগ ছাড়া আর কোনো পথ রইল না। মুসলমান যেমন হিন্দু-প্রধান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকতে রাজী হয়নি তেমনি বাঙালি হিন্দুরা ও পাঞ্জাবের শিখেরা মুসলমান-প্রধান সরকারের অধীনে থাকতে অস্বীকার করলো। ফলে, বাঙলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করে এই সমস্যার সমাধান করতে হলো। এখানে মনে রাখা দরকার যে মুসলমানরা কেউই বাঙলা বিভাগ করতে চায়নি এবং হিন্দুরা প্রত্যেকেই বাঙলা বিভাগ চেয়েছিল। পাঞ্জাবে তো প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হয়েছিল।

কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়াটা বেশির ভাগ হিন্দু কংগ্রেস নেতা সুনজরে দেখেননি। ঠিক স্বাধীনতার মুখেই মুসলমান-প্রধান কাশ্মীর রাজ্যের হিন্দু রাজা কতকগুলি শর্তে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিলেন। এরই প্রতি-বাদে পাকিস্তানের সাহায্য নিয়ে বহু মুসলিম উপজাতীয় হানাদার সেনা কাশ্মীর আক্রমণ করলো। তখন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল। তাঁর নির্দেশ মতে ভারতীয় সৈন্যদের পাঠানো হোলো আক্রমণকারী হানাদারদের বিতাড়িত করবার জন্য। নেহরু তখন প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁরও এতে সায় ছিল। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যরা যখন কাশ্মীরকে হানাদারমুক্ত করবার পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে তখন বড়লাট মাউণ্ট-ব্যাটেনের প্রভাবে নেহরু সমস্ত অবস্থার বিবরণ জানিয়ে কাশ্মীরে ইউ, এন, ও-র হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেন। বল্লভভাই প্যাটেল পরে বন্ধুবান্ধবের কাছে

www.pathagar.com

অভিযোগ করেছিলেন যে ব্যাপারটা সম্বন্ধে তিনি আগাগোড়াই অন্ধকারে ছিলেন কারণ, নেহরু নাকি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করেই ইউ-এন-ও-র হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছিলেন। ইউ-এন-ওর প্রস্তাব অনুযায়ী যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হলো। যতটুকু হানাদারদের অধীন সেটুকু তাদেরই রইল এবং হানাদারমুক্ত অঞ্চল ভারতের সঙ্গে যুক্ত রইল। শর্ত ছিল সারা কাশ্মীর রাজ্যে গণভোট করে পরে জেনে নিতে হবে ভারত না পাকিস্তান কার সঙ্গে কাশ্মীরিরা থাকবে।

কিন্তু এর মধ্যে ভারত-বিভাগের সময়ে রাষ্ট্রীয় তহবিলও ভাগ হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানের প্রাপ্য যে পঞ্চান্ন কোটি টাকা বল্লভভাই প্যাটেল সেই টাকা পাকিস্তানকে দিতে অস্বীকার করলেন যতক্ষণ না পকিস্তান কাশ্মীর থেকে হানাদার সৈন্যদের সরিয়ে নিচ্ছে। বল্লভভাই কারও কথা শুনতে রাজী ছিলেন না। শেষকালে পাকিস্তানের প্রাপ্য টাকা যাতে পাকিস্তান পেতে পারে সেইজন্য গান্ধীজী আমরণ অনশন শুরু করলেন। ঐ সময়ে দিল্লী এবং উত্তর ভারতের বহু স্থান থেকে মুসলিম অধিবাসীদের বিতাড়নের জন্য একটা সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল। ১৯৪৭-এর ৪ঠা অক্টোবর দিল্লীতে তাঁর প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী জানালেন যে মুসলমানদের ৪৭টি মসজিদ ভেঙে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে দিল্লী শহরের ও তার আশপাশের কিছু অঞ্চলে। (দি ষ্টেটস্‌ম্যান ৫ই অক্টোবর ১৯৪৭ দেখুন) এই সব ঘটনাও গান্ধীজীকে এত বিচলিত করেছিল যে তিনি আমরণ অনশনই শ্রেয় বলে মনে করলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টি হিন্দুদের মনে এক অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। যে ভারত মাতাকে হিন্দুরা দেবী দুর্গার সমান বলে পূজা করে "মোচলমানরা" সেই ভারত-মাতাকেই দ্বিখণ্ডিত করলো বলে তারা ক্ষুব্ধই ছিল। তার উপরে পাকিস্তানের জন্য এবং মুসলমানদের রক্ষার জন্য গান্ধীর আমরণ অনশন সাধারণভাবে হিন্দুদের মনে গান্ধীকে অপ্রিয় করে তুললো। এই অনশনের ফলে এবং নেহরুর চাপে বল্লভভাই পাকিস্তানের প্রাপ্য ৫৫ কোটি টাকা দিয়ে দিতে রাজী হলেন বটে কিন্তু তিনি অনশনক্লিষ্ট গান্ধীকে বলে এসেছিলেনঃ "আপনি হিন্দুদের মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছেন। আপনার সঙ্গে আমার আর কিছু করার রইল না।" (ইণ্ডিয়া উইন্‌স্‌ ফ্রিডম, মৌলানা আজাদ; ইংরেজির অনুবাদ)। হিন্দু সাধারণের কাছে গান্ধীজী এতদূর অপ্রিয় হয়ে উঠলেন যে তাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেল এবং ১৯৪৮-এর ৩০শে জানুয়ারি তাঁকে হত্যা করলো নাথুরাম গডসে। বহুলোক নাথুরামের সমর্থক ছিল। এখন তো মহারাষ্ট্রে দাবি উঠেছে যে নাথুরামকে মরণোত্তর "ভারত-রত্ন" উপাধি দেওয়া হোক।

www.pathagar.com

বল্লভভাই প্যাটেল অবশ্য দেশীয় করদ রাজ্যগুলিকে একে একে ভারত সরকারের শাসনাধীন করে তুলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে সুসংগঠিত করে গেছেন। হায়দরাবাদ এ ব্যাপারে একটু আপত্তি তোলায় তিনি সৈন্য পাঠিয়ে হায়দরাবাদের নিজামকে ভারত সরকারের আধিপত্য স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন। হায়দরাবাদ কিন্তু হিন্দু প্রধান ছিল। তার পক্ষে ভারতের আধিপত্য স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু জুনাগঢ়, মংরোল ও মানভাদার এই তিনটি ক্ষুদ্র করদ রাজ্য ছিল মুসলিম প্রধান। এগুলিকেও সৈন্য পাঠিয়ে ভারত সরকারের অধীন করা হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে পাকিস্তানের সঙ্গে এদের ভূমিগত কোনো যোগাযোগের পথ না থাকায় ভারতে যোগদান করা ছাড়া এদেরও গত্যন্তর ছিল না।

ভারত-ভাগে সহায়তা করার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে হিন্দুদের যে একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল পাকিস্তান ইস্লামিক রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হওয়ায় এবং পাকিস্তান থেকে বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সংখ্যা-লঘু হিন্দুরা চলে আসতে থাকায়, সেই ক্ষোভ দিনে দিনে গভীরতর হয়েছে। এই চাপা ক্ষোভকে মূলধন করে এখন কোনো কোনো রাজনৈতিক দল প্রকাশ্য মুসলিম-বিদ্বেষে ইন্ধন জোগাচ্ছে। পাকিস্তানে এবং ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে একদিন বিপাকে পড়তে পারে তারই সম্ভাবনা বিবেচনা করে দূরদর্শী নেতা মহম্মদ আলি জিন্না বহুদিন আগে চেয়েছিলেন পারস্পরিক লোক বিনিময় করে পাকিস্তানকে একটা পূর্ণাঙ্গ মুসলিম রাষ্ট্রে এবং ভারতকে একটি পূর্ণাঙ্গ হিন্দু রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। তখন জিন্নার কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। কিন্তু এখন ভারতের এক বিশাল সংখ্যক মুসলমানকে যদি হিন্দু বিদ্বেষের শিকার হয়ে পড়ে থাকতে হয় তার ফলাফল খুব উদ্বেগজনক হতে বাধ্য। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল যে এই মুসলিম-বিদ্বেষকে মূলধন করে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে তাতে ভারতের ভবিষ্যত নিঃসন্দেহে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি সমস্যার কথা বলবো যা ভারতের রাজনৈতিক জটিলতাকে গভীরতর করে তুলেছে যার ফলাফল দেশের পক্ষে মারাত্মক হতে বাধ্য। এমন-কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু মারাত্মক ফল এর মধ্যেই ফলতে আরম্ভ করেছে।

হিন্দু সমাজের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা ছিল হিন্দু সমাজের জাতি বিভাগ। যুগ যুগ ধরে জাতি-বিভাগের অভিশাপ হিন্দু সমাজের অগ্রগতির পথকে খর্ব করে রেখেছিল। আদি যুগে হয়ত জাতি-বিভাগের অন্য উদ্দেশ্য ছিল—গুণ ও কর্মের বিভাগকে জাতি-বিভাগের ভিত্তি বলে এক সময়ে ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে জাতি-বিভাগের অভিশাপ জগদ্দল

www.pathagar.com

পাথরের মত সমগ্র সমাজের ঘাড়ে চেপে বসলো এবং এই জাতপ্রথার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে শোষিত হতে লাগলো কৃষক-শ্রমিক খেটে-খাওয়া মানুষ এবং এই নিরবচ্ছিন্ন শোষণের দ্বারা সমাজের সকলপ্রকার সুখ-সুবিধা আনন্দ-উৎসব ভোগ করতে লাগলো উচ্চ বর্ণের কিছু মুষ্টিমেয় মানুষ। জাতিপ্রথার দৌলতে সকল শ্রেণীর খেটে-খাওয়া মানুষ কালে কালে অস্পৃশ্যতার গ্লানি বহন করে বেড়াতে বাধ্য হলো। এর কুফল এই দাঁড়ালো যে সমাজ পরিষ্কার-ভাবে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। একদল শোষণকারী, অন্যদল শোষিত। সমাজের নেতৃস্থানীয় হয়ে রইলেন শোষণকারীর দল, জ্ঞান-বিদ্যা-ঐশ্বর্য সবই তাদের করায়ত্ত হয়ে রইল আর অগণিত শোষিতের দল নিজেদের রক্ত ঝরিয়ে কায়িক শ্রম দিয়ে শোষণকারীর জ্ঞান-বিদ্যা-ঐশ্বর্যকে বাড়িয়ে দিতে বাধ্য রইল।

আমাদের সমাজের এই যে শোষিতের দল যুগ যুগ ধরে শোষণকারীর বোঝা বয়ে আসছে তারা আজও পর্যন্ত শোষিতই থেকে গেল। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে যখন ইংরেজি শিক্ষা সংস্কৃতির হাওয়া এসে লাগলো এদেশে তখন এদেশের শোষণকারীরাই সেই সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে নিজেদের সুখ-সুবিধা জ্ঞান-বিদ্যা-ঐশ্বর্যকে বাড়িয়ে নিলো এবং প্রয়োজন-বোধে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে শিক্ষায়, দীক্ষায়, সামাজিক সুখ-সুবিধায় সমর্থন করলো নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্যে। আর শোষিতর দল রয়ে গেল আগেকার মতই শোষিত।

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে দেশের উচ্চবর্ণসম্ভূত শিক্ষিত সমাজ সকল প্রকার আন্দোলন থেকে এই শোষিত-প্রবঞ্চিতের বিরাট দলকে সযত্নে পরিহার করে দূরে সরিয়ে রাখলো। যুগ যুগ ধরে সমাজ পরিচালনার ক্ষমতা যারা করায়ত্ত করে রেখেছিল উচ্চ-বর্ণের সেই শিক্ষিত সমাজ স্বাধীনতা সংগ্রামকেও নিজেদের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে রইলো। কারণ, রাজনৈতিক ক্ষমতা যদি আসে সেটা যেন তাদের হাতেই আসে দেশের নিচের তলার মানুষ, খেটে-খাওয়া কৃষক-শ্রমিক যেন সেই ক্ষমতার কিয়দংশও না লাভ করতে পারে। যুগ যুগ ধরে দেশে এইটাই হয়ে এসেছে। বিংশ শতাব্দীতে এই প্রথার পরিবর্তন হবে একথা তাদের কাছে চিন্তার অতীত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একথা মনে রাখতে হবে ইংরেজ সরকার প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের পরিধি একটু বাড়াবার চেষ্টা করেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই। কিন্তু তখন আমাদের বহু বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা এর বিরোধিতা করে বলেছিলেন অশিক্ষিতদের হাতে ভোটাধিকার ন্যস্ত হলে তার ফল দেশের রাজনৈতিক জীবনে মারাত্মক হয়ে উঠবে। জাতীয়তাবাদী নেতারা যে রাজ-

www.pathagar.com

নৈতিক অধিকারের দাবি নিয়ে লড়াই করেছিলেন সেটা একেবারেই নিছক শিক্ষিত সমাজের স্বার্থরক্ষার অধিকার। দেশের নিচের তলার খেটে-খাওয়া মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য কোনো রাজনৈতিক অধিকার এঁরা দাবি করেননি কারণ, তা তাঁরা চাইতেন না। ভারতবর্ষের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আগাগোড়া শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে এবং এমন-কি বণিক সম্প্রদায় কখনও গোপনে কখনও প্রকাশ্যে সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করেছে এদের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। জমিদার-প্রজার স্বার্থসংঘাতে সন্ত্রাসবাদীরা চিরদিন জমিদারের পাশেই দাঁড়িয়েছে। অশিক্ষিত সমাজের উপর যাতে শিক্ষিত সমাজের আধিপত্য পাকাপাকিভাবে কায়েম করা যায় সেই আশাতে দেশের শিক্ষিত সমাজ চিরদিন গোপনে গোপনে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী-দের সমর্থন করেছে এবং প্রয়োজনে গোপনে তাদের সাহায্য করেছে যদিও নিজেদের গা বাঁচাবার জন্য এদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের নিন্দাই শোনা যেত। সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে দেশের সাধারণ নিচের তলার মানুষের কোথাও কখনও একটা মজবুত যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে নি। সন্ত্রাসবাদী নেতা ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়ে কিছু মারণাস্ত্র যোগাড় করবার চেষ্টা করেছিলেন বলে ইতিহাসে তাদের খুব গৌরবজনক স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপকে এখন সশস্ত্র বিপ্লব বলে জাহির করবার শত চেষ্টা করলেও দেশের কোনো জায়গায় কখনও সশস্ত্র বিপ্লবের কোনো আবহাওয়া সৃষ্টি করা যায়নি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রচেষ্টা বা বুড়ি বালামের তীরে বাঘা যতীনের যুদ্ধ যথেষ্ট বীরোচিত এবং উদ্দীপনাময় হওয়া সত্ত্বেও দেশের সাধারণ মানুষের মনে বিশেষ রেখাপাত করতে পারেনি কারণ এই সব বিপ্লবীদের সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের কোনো আত্মিক সম্পর্ক সেসময় গড়ে ওঠেনি।

গান্ধী যখন ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে উদয় হলেন তিনি প্রথমেই এই অসঙ্গতির কথা ধরতে পারলেন এবং গ্রামের কৃষক-শ্রমিককে রাজনৈতিক দিক থেকে সজাগ করে তোলার উদ্দেশ্যে চরকা এবং গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমে তাদের সক্রিয় করে তোলবার জন্যে তাঁর গঠনমূলক কর্মের কার্যক্রম গ্রহণ করলেন। তিনি বারবার বললেনঃ "জনসাধারণ জাগরিত না হলে স্বরাজ লাভ করা অসম্ভব এবং তাছাড়া যদি স্বরাজ লাভ সম্ভব হয় তাহলে সে স্বরাজের কোনো মূল্য নেই।" কিন্তু তিনিও তাঁর অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১-এর) কেবল শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেন। উকিল-ব্যারিস্টার, আইনসভার সদস্য এবং গভর্নমেণ্ট স্কুল-কলেজের ছাত্র—এঁরাই অসহযোগ করে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরে আসবেন। আর গ্রামের চাষী-শ্রমিক সাধারণ লোক শুধু দৈনন্দিন নিয়মিত চরকা কাটবে

www.pathagar.com

তাহ'লেই ১৯২১-এর ৩১শে ডিসেম্বর স্বরাজ আসতে বাধ্য। অর্থাৎ শতকরা দু' ভাগের (তখনকার হিসাবে) অসহযোগে শতকরা আটানব্বই ভাগের স্বরাজ আসবে যেখানে এই শতকরা আটানব্বই ভাগ শুধু চরকাই কেটে যাবে।

বাংলায় বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আদর্শের এই অসংগতির কথা বুঝতে পেরে গ্রামের লোককে রাজনৈতিক সংগ্রামে সক্রিয় করে তোলার জন্য প্রস্তাব করলেন যে বঙ্গীয় গ্রাম্য-স্বায়ত্ত শাসন আইনের বিরোধিতা করে এই আইনে চালু করা চৌকিদারি ট্যাক্স গ্রামে গ্রামে দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। বরিশাল বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীতে তাঁর প্রস্তাব প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে পাশও হয়ে গেল। কিন্তু দু'এক মাসের মধ্যেই কলকাতার কংগ্রেস নেতারা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন ডেকে সিদ্ধান্ত নিল যে বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করা চলবে না। সেই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাশ। কার্যনির্বাহক সমিতি কখনও সাধারণ অধিবেশনের প্রস্তাব বাতিল করতে পারে না। কিন্তু চিত্ত-রঞ্জন দাশ সেইটাই করলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে তাঁর লেখা 'সত্যাগ্রহজ ইন বেঙ্গল ১৯২১-৪০' বইতে আমি প্রশ্ন করেছিলাম এই বে-আইনি কাজটি প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনিবাহক সমিতি করেছিলেন কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষমতাশালী জমিদার-পুঁজিপতিদের নির্দেশে, যাঁরা চাইতেন না যে গ্রামের প্রজাসাধারণকে সংঘবদ্ধ করে কর-বন্ধ আন্দোলন করলে একদিন তারা জমিদারের প্রাপ্য খাজনা দিতেও অস্বীকার করতে পারে এবং সেসময়ের কংগ্রেস নেতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জমিদার-পুঁজিপতিদের ক্রীতদাস ছিলেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এ ব্যাপারে আমাকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন—নিজের পিতা ছাড়া অন্য সকলে ধনকুবেরের ক্রীতদাস এটা ভাবাবেগের ব্যাপার হতে পারে কিন্তু যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত নয়। তবুও বুদ্ধদেব বাবু এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি যে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করা প্রস্তাব কার্যনির্বাহক সমিতি বাতিল করেছিল কেন?

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এর বিরোধিতা করায় বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বাধ্য হয়ে শুধু মেদিনীপুর জেলায় নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্বে এই আন্দোলন পরিচালনা করে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তাতে বিদেশী লেখক জে. জি. ব্রুমফিল্ড তাঁর বইতে এ মন্তব্য করেছেনঃ "এর আগে বৃটিশ আধিপত্যের এত প্রকাশ্যভাবে ও সফলতার সঙ্গে কেউ বিরোধিতা করেনি।" হিউ টিস্কার লিখেছেনঃ "স্বরাজী সংগ্রামের উন্মাদনায় মেদিনীপুরে ২২৭টি ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল।" কিন্তু দেশীয় সংবাদপত্র বা ইতিহাসপুস্তকে এই বিরাট আন্দোলনের কোথাও কোনো উল্লেখ নেই।

www.pathagar.com

এর পিছনে যে মানসিকতা কাজ করছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মেদিনীপুরের চাষাদের এই গৌরবময় আন্দোলন ইতিহাসে স্থান পাক সেটা দেশের শিক্ষিত সমাজ বরদাস্ত করতে পারে না। শিক্ষিত সমাজের বাইরে কোনো আন্দোলন বা প্রগতিমূলক কিছু ঘটছে এটা লিপিবদ্ধ থাক তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ কিছুতেই হতে দেয়নি।

আমাদের দেশে এটাও এখন একটা বিরাট সমস্যা যে, আমাদের শিক্ষিত সমাজ শিক্ষায় অনগ্রসর বিরাট জনমণ্ডলীকে তাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে যেতে দেবে, না বাধা দেবে?

মণ্ডল কমিশনের ব্যাপারে আমরা দেখেছি দেশের শিক্ষিত সমাজ কী উন্মাদের মত আচরণ করে এই পিছিয়ে-পড়া অগণিত জনমণ্ডলীর উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। দুঃখের বিষয়, এই পিছিয়ে-পড়া অগণিত জনমণ্ডলীকে সংগঠিত করবার কেউ নেই। তারা কি শিক্ষিত সমাজের কাছে উচ্চ বর্ণের লোকেদের হাতে চিরদিন মার খাবে?

[আমার এই লেখাগুলি যখন প্রথমে প্রবন্ধ হিসাবে 'কম্পাস' পত্রিকায় বের হয় তখন কেউ কেউ আমাকে জানিয়েছিলেন যে আমার লেখা অনেক ঘটনা সম্বন্ধে ইতিহাসে কোনো উল্লেখ নেই। আমি যখন যেখানে যে ঘটনার উল্লেখ করেছি তখনই সে-সম্বন্ধে প্রামাণ্য নজিরের উল্লেখ করেছি। কোনো ঘটনা আমার নিজের কল্পনা-প্রসূত বা স্মৃতি-উদ্ভূত নয়। যে-সকল ঘটনার কোনো ছাপানো এবং প্রকাশ্য নজির নেই সে-রকম বহু ঘটনা আমি নিজে সত্য বলে জানলেও তা কোথাও প্রকাশ করিনি।]

[তাই বলতে চাই, ইতিহাসে যা-লেখা হয় তার সবই সত্যি নয় এবং যা-ইতিহাসে পাওয়া যায় না তাই মিথ্যা হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু আমার উল্লিখিত কোনো ঘটনার ঐতিহাসিক বা ইতিহাসনিষ্ঠ প্রমাণ আমি দাখিল করিনি এমন নয়। আমার উল্লিখিত সকল ঘটনাই আমি প্রকাশিত এবং স্বীকৃত প্রমাণ দেখিয়ে দাঁড় করিয়েছি। আমার দেখানো প্রামাণিক নজিরগুলি কেউ যদি মিথ্যা ব'লে প্রমাণ করতে পারেন আমি সানন্দে আমার লেখা সংশোধন ক'রে দেব।]

www.pathagar.com

www.pathagar.com